

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

আমার প্রিয়তম কবি অমিয় চক্রবর্তী শ্রদ্ধাস্পদেষু

এবং

আমার স্নেহাস্পদ স্বপন মজুমদার সুহৃত্তমেষু

ভাষা শেখার তিন পর্ব এবং প্রসঙ্গত

প্রথম প্রকাশিত লেখার প্রতি লেখকমাত্রেরই একটু মমতা থাকে, লেখাটি যদি প্রথম রচিত হয় তবে আরও-একটু বেশি। অবশ্য মাস কয়েক পূর্বে আমার একটি ইংরেজি প্রবন্ধ "Philosophy and the Foundations of Science" *Calcutta Review*-এ প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কোনো সাড়াই জাগায়নি কারুর মনে ; কেউ লিখিতভাবে বা মুখে প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করেননি। তবে "বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি" শীর্ষক প্রথম প্রকাশিত বাঙলা প্রবন্ধটির সঙ্গে আমার সাধনা এবং সিদ্ধি, সাময়িক বিফলতা এবং প্রত্যাশার অতীত সাফল্যের একটি কৌতুকপ্রদ ব্যাপার জড়িত আছে।

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ আমি লিখেছিলাম যে প্রথমে উর্দুতে এবং পরে ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে মূল বাঙলা ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' পড়বার দুর্দম আগ্রহই আমাকে বাঙলা শিখতে বাধ্য করে। কথাটা আংশিক সত্য। মাস ছয়েক খুব অল্প পরিশ্রমের ফলেই আমি 'গীতাঞ্জলি'র সরল বাঙলা বুঝতে সক্ষম হই ; আর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' তো ছিলোই হাতের কাছে। বাঙলা ভাষা শিক্ষা আমার তখন বেশিদূর এগোয়নি নানা কারণে, বোধহয় সবচেয়ে জোরদার কারণ ছিলো উর্দু কবিতার প্রতি আমার নব-উদ্বুদ্ধ উৎসাহ। ক্লাস নাইন ও টেন-এ আমি যে-স্বল্পখ্যাত মিশনরী স্কুলে (সেণ্ট এ্যাণ্টনীজ স্কুল) পড়তাম সেখানে উর্দু ও ফারসী ভাষার শিক্ষক ছিলেন একজন গভীর কাব্য-রসিক বিহারী ভদ্রলোক ; নাম মনজুর আহমেদ। তদুপরি তিনি আশ্চর্য সুন্দর দরদপূর্ণ কণ্ঠে উর্দু ও ফারসী কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন সেখানে ঐ-সময়ে উর্দু এবং এডিশনাল ফারসী ক্লাসে আমি একাই ছাত্র ছিলাম। তিনি বললেন : তোমাকে prescribed text পড়াবার কোনো প্রয়োজন দেখছি না ; তুমি নিজেই সে-সব ভালো ক'রে প'ড়ে নিতে পারবে। আমি বরঞ্চ তোমাকে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ উর্দু ও ফারসী কবির কবিতা পড়াতে চাই। আমি পরম উৎসাহে আমার সম্মতি জানালাম। ফলে ঐ দুটি বছর আমি গালিব, মীর, দর্দ এবং মোমিন, উমর খৈয়াম এবং হাফিজ-এর কাব্যরসে নিমজ্জিত হ'য়ে গিয়েছিলাম। বাঙলা কাব্যচর্চা 'গীতাঞ্জলি' পাঠের পর আর বেশিদূর এগোয়নি।

বাঙলা শেখার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হ'লো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেরণায় ও পরিস্থিতিতে। ম্যাট্রিকুলেশানের পর আই. এস সি. পড়তে শুরু করলাম সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সহপাঠীদের থেকে একটু দূরে-দূরেই থাকতাম, তবু কয়েক মাসের মধ্যে তিন-চারজনের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হ'য়ে গেলো। এদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সব কথা আমার স্মৃতিপটে লেখা আছে অপরিমোচনীয় অক্ষরে। দক্ষিণাই আমার জীবনের প্রথম রোম্যান্স এবং অন্যতম ট্র্যাজিডি। একেবারে অকস্মাৎ দু-চার মিনিট হৃদযন্ত্রণা ভুগে সে মারা গেলো বছর পাঁচেক আগে।

না ঠিক প্রথম নয়, দ্বিতীয় রোম্যান্স। প্রথম রোম্যান্স আমার বড়ো বৌদির সঙ্গে প্রেম-ছোঁয়া গভীর বন্ধুত্ব। তিনি যখন নববধূরূপে আমাদের বাড়িতে এলেন তখন আমার বয়স নয়, তাঁর বয়স পনেরো। তিনি আমাকে ডিকেন্সের সবক'টি উপন্যাস, শার্লোট ব্রন্টির 'জেন আয়ার', জর্জ এলিয়টের 'মিল অন দি ফ্লস্', 'এ্যাডাম বীড' এবং কয়েকটি উর্দু ছোটোগল্প ও কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছিলেন। স্থানে-স্থানে বুঝিয়ে দিতেন। মাঝে-মাঝে আমরা চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীর গঠন সম্বন্ধে অত্যন্ত মৌলিক মতামত বিনিময় করতাম কারণ এই দুই অর্বাচীন সাহিত্যামোদীর মধ্যে কারুরই সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ে বিন্দুমাত্র কেতাবী বিদ্যা ছিলো না। পরে কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে আমি তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে যে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না-করলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্বার আমার সামনে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হবে না। নিষ্ঠুর মানে যাঁর কাছে আগে সপ্তাহে দু-তিনবার যেতাম, নয়-দশ ক্লাসে পড়বার সময়ে সপ্তাহে একটি সন্ধ্যা কাটাতাম, কলেজে উঠে বছরে মাত্র দুই ঈদের দিন সকালে ঘণ্টাখানেকের বেশি তাঁর সঙ্গে কাটাতাম না, শত অনুযোগ-অনুনয় সত্ত্বেও। এখন মনে হচ্ছে এটা তারুণ্যের বাড়াবাড়ি, তখন একে চরিত্রের দৃঢ়তা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম।

যখন ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট পড়ার পালা চলছিলো তখন বৌদি বছরের বেশিরভাগ কাটাতেন আমাদের বাড়িতেই। কিন্তু বিবাহের দু-তিন বছরের মধ্যেই আমার দাদা উন্মাদরোগগ্রস্ত হলেন। তারপর থেকে বৌদির বাপের বাড়ি থাকার মেয়াদ বেড়ে গেলো। আমাদের বাড়িতে আসতেন মাঝে-মাঝে। এলেও দু-চার দিনের বেশি থাকতেন না। শিক্ষার এই স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে গুরুশিষ্য সম্পর্কেরও বড়োরকমের পরিবর্তন ঘটলো।

গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন শিক্ষিকা, আমি ছিলাম উৎসাহী ছাত্র। নয়-দশ ক্লাসে পড়বার সময় আমার নবলব্ধ উর্দু কাব্যবিদ্যায় অধিকারী হ'য়ে আমি হ'য়ে উঠলাম শিক্ষক, তিনি হলেন আনন্দপূর্ণ শিষ্যা। উন্মাদ স্বামীর স্ত্রী হওয়া যে কতোখানি যন্ত্রণার ব্যাপার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে তাঁর বাড়িতে আমি যখনই গিয়েছি তিনি হাসিমুখেই আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন, হাসিমুখেই কাব্যচর্চা এবং অন্যান্য গল্পগুজব করেছেন। মুহূর্তের জন্যও মালিন্য বা বিষাদের ছায়া পড়তে দেননি তাঁর মুখের উপর। অনিদ্র গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তিনি হয়তো কেঁদেছেন, কিন্তু সেটা আমার পক্ষে অনুমানের বিষয়।

কলেজে গিয়ে দক্ষিণা এবং আরও দু-চারজন সহপাঠী বন্ধু পেয়ে আমার বাঙলা শেখার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হ'লো। তখন বৌদির সঙ্গে আমার সব সম্পর্কই একরকম বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলো। অল্পবয়সের মনের পরিণতিকে আমার এই দুই অসাধারণ বন্ধু – বৌদি আর দক্ষিণা – গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। যদি কখনও স্মৃতিচারণ করি, এঁদের কথা সবিস্তার লিখবো।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। লক্ষ করলাম যে নতুন সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা সহজ মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে না, চলছে এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে, বার-বার বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি ইংরেজি ব'লে যাই সহজেই, তারা কিন্তু সহজে ইংরেজিতে উত্তর দিতে পারছে না। কাজেই তারা বাঙলাই বলতো, তবে ইংরেজি মিশিয়ে। কলেজের ছেলেরা যতোখানি ইংরেজি মেশায় তার চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে – আমার কাছে তাদের বক্তব্যটি বোধগম্য করবার জন্য। এই অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে প'ড়ে আমি স্থির করলাম যে আমাকে কথোপকথনের উপযুক্ত বাংলা শিখতে হবে।

বাড়ির অনতিদূরে ছিলো তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী। দু-টাকা মাসিক চাঁদা দিয়ে সেখানকার সভ্য হলাম। দশ-বারো দিন অন্তরে সেখানে গিয়ে শরৎচন্দ্র, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রভৃতির উপন্যাস বা গল্পসংকলন নিয়ে আসতাম। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' ও 'গোরা' কিনে ফেললাম। ভাষা শিক্ষার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি উপকার পেয়েছি 'গোরা' উপন্যাস থেকে। পিয়ার্সনের ভালো অনুবাদ ছিলো আমার কাছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে প'ড়ে আমার রবীন্দ্রনাথের ভাষা বুঝতে কোথাও খুব অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে আমি নিজস্ব কায়দায় বইখানি পড়লাম, অর্থাৎ চারবার পড়লাম। প্রথম পাঠের বেলায় ভাষা থাকে

স্বচ্ছ কাঁচের মতন, সেটা ভেদ ক'রে আমাদের দৃষ্টি চ'লে যায় বক্তব্যবিষয়ের দিকে। দ্বিতীয় পাঠের বেলায় কাঁচটিকে ঈষৎ অস্বচ্ছ ক'রে আমি যে-সব শব্দের সঠিক অর্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলাম না, অভিধান ঘেঁটে এবং অনুবাদের সাহায্য নিয়ে সেই অর্থটি ইংরেজিতে লিখে রাখলাম; বাক্যরচনারীতি লক্ষ করলাম এবং সন্ধি সমাস প্রভৃতি বিশ্লেষণ ক'রে পড়লাম। তৃতীয় পাঠের বেলায় মনকে সম্পূর্ণ ভাষার দিকে নিবিষ্ট করা সম্ভব হ'লো; চতুর্থ পাঠের বেলা আরও বেশি। সব ভাষাশিক্ষার্থীকেই আমি এই পরামর্শ দিই। তাঁরা ষোলোখানা বই একবার প'ড়ে যতোখানি ভাষা আয়ত্ত করতে পারবেন, এক-খানা বই চারবার পড়লে তার চেয়ে অনেক বেশি পাবেন।

আমার বাঙলা শিক্ষায় আবার ছেদ পড়লো প্রেসিডেন্সী কলেজে Physics Honours পড়তে গিয়ে। অনার্স কোর্সের চাপ ছিলো একদিকে, অন্যদিকে যে নতুন বন্ধুদলে প্রবেশলাভ করলাম তাদের মধ্যে তখন continental fiction-এর চর্চা ছিলো বেশি। কাজেই আমারও সাহিত্যপাঠের বিষয় হ'য়ে উঠলো ফরাসী নরউইজিয়ান এবং রাশিয়ান বহুবিখ্যাত গল্পসংকলন ও উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ। হুমায়ুন কবির আমাকে Johan Bojer-এর *The Great Hunger* বইখানি উপহার দিয়েছিলো, উপহারলিপিটি সুন্দর একটি চতুষ্পদীতে লিখে। ঐ-বয়সে বইখানি খুবই মর্মস্পর্শী ও অনুপ্রেরণাদায়ক মনে হয়েছিলো। হুমায়ুনও অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগের শিকার হ'লো। এমন প্রাণবন্ত সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত মানুষ আমি দেখিনি। কোথায় গেলো সে উচ্ছল প্রাণ!

সদ্য-প্রকাশিত 'পূরবী' থেকে দুই-একটি কবিতা আবৃত্তি করতাম অন্যান্য পড়া শুরু করার আগে। বাড়ির পাশে মুসলিম ইনষ্টিটিউটের পাঠাগারে গিয়ে 'প্রবাসী' থেকে দু-একটি প্রবন্ধ পড়তাম। বাঙলা ভাষা চর্চা ঐ-পর্যন্ত।

আমি বরাবরই জানতাম যে দর্শনই হবে আমার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয়। ইতিমধ্যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বিষয়ে রাসেল জীন্‌স প্রভৃতির সহজবোধ্য ও রোমাঞ্চকর ব্যাখ্যা প'ড়ে দুর্দান্ত স্পৃহা জেগেছিলো ঐ-বিষয়টি সাধ্যমতো ভালো ক'রে বোঝার। সেই স্পৃহাই আমাকে টেনে নিয়ে গেলো M. Sc. পর্যন্ত। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত এডিংটনের *Mathematical Theory of Relativity* অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সাহায্যে সযত্নে পড়লাম। দুটো পেপার পরীক্ষা দেবার পরই আমাশায় প্রবলভাবে আক্রান্ত হ'য়ে পরীক্ষা শেষ না-ক'রেই দর্শন বিভাগে প্রবেশ করলাম এবং পাশ

ক'রেই একটি গবেষণাবৃত্তি পেলাম; বিষয় নির্বাচন করলাম 'Content of Error in Perception and Thought'। বিষয়টি আমার খুবই মনোগ্রাহী ছিলো। কিন্তু আমার প্রথম অধ্যক্ষ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ তাতে কোনোই উৎসাহ দিতে পারতেন না; খানিকটা লেখা প'ড়ে এবং একটি নিবন্ধ Philosophy Seminar-এ শুনে মন্তব্য করেছিলেন: "Ayyub, why do you go in for so much logic chopping and hair splitting analysis?" দ্বিতীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার মনের মতন গুরু এবং নিঃসন্দেহে এ-দেশে নবযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মৌল চিন্তার ক্ষেত্রে অতুলনীয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের Professors' Room-এ ব'সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্ভব ছিলো না, হলটা ছিলো অধ্যাপকদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা। মাসে দু-মাসে তাঁর বাড়িতে যেতাম শ্রীরামপুরে, স্টেশন থেকে দু-মাইল পথ হেঁটে। যখন যেতাম আমি ধন্য হ'য়ে ফিরতাম।

তিনি খুব সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য গবেষণার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না; তবে তাতে ক'রে তাঁর দার্শনিক প্রতিভা একটুও ম্লান হ'য়ে যায়নি। আমি নিজে এই সামান্য বাধাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারতাম যদি দৈনিক দশ-বারো ঘণ্টা লাইব্রেরীতে ব'সে পড়াশোনা করতে সক্ষম হতাম। কিন্তু কলকাতায় সে-রকম লাইব্রেরী ছিলো না যেখানে সব প্রয়োজনীয় বই এবং জর্নাল পাবো। তাছাড়া তখন থেকেই আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গুর, স্মরণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। এইসব বাধা ডিঙিয়ে পাশ্চাত্যের দার্শনিক মহলে সাড়া জাগাবার মতন নিবন্ধ লিখতে পারবো সে-ভরসা আমার ছিলো না।

আরো কম পরিশ্রম ক'রে এ-দেশের দার্শনিক মহলে সাড়া জাগাতে পারতাম হয়তো। কিন্তু এ-দেশে সে-রকম দার্শনিক মহল কোথায়? দুই-একজন প্রকৃত দার্শনিক হয়তো ছিলেন দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু আমি তাঁদের সন্ধান পাইনি তখন।

এই কলকাতা শহরেই একজনের সন্ধান পেয়ে আমি গভীর আনন্দ ও উৎসাহ পেয়েছিলাম। তাঁর নাম কালিদাস ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে বারকয়েক তিন-চার ঘণ্টা স্থির হ'য়ে ব'সে দার্শনিক আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। তাতে আমি লাভবান হয়েছি, আমার চিন্তা অল্পবিস্তর এগিয়ে গেছে; আজ সে-কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। কিন্তু দু-জনকে নিয়ে তো দার্শনিকমণ্ডল গ'ড়ে তোলা যায় না।

আরও একজন ছিলেন অবশ্য, আমার চেয়ে বছর দুয়েকের সিনিয়র অতিশয় দীপ্তিমান ছাত্র—সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। শুধু কাছাকাছি নয়, তিনি ছিলেন আমার বন্ধুস্থানীয়ও। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা মার্কস্‌বাদের সুমহান সমুচ্চ সরোবরে ঘুরপাক খাচ্ছিলো; ব্রহ্মপুত্র বা গঙ্গা-যমুনার মতন প্রবহমান হবার কোনো অববাহিকা খুঁজে পায়নি।

মার্কস্‌বাদকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক সত্য। অন্তত বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য তো বটেই, এবং নববিজ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল। নবযুগের এমন বিরাট সত্যধর্মকে মার্কস্ এঙ্গেল্‌স্ লেনিন-এর চিন্তা-ভাবনায় আটকে রাখার মানে কি মধ্যযুগের প্রদোষান্ধকারে ফিরে যাওয়া নয়? ঐ তিন মহামানবের প্রতিভাদীপ্ত মার্কস্‌বাদ মানবজাতির অগ্রগতির ইতিহাসে একটি বিরাট পদক্ষেপ, কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপ নয়। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান তো কোথাও থেমে নেই। গ্যালিলিও থেকে নিউটন, নিউটন থেকে ম্যাক্স্‌ওয়েল, ম্যাক্স্‌ওয়েল থেকে প্লাঙ্ক, প্লাঙ্ক থেকে আইনস্টাইন, আইনস্টাইন থেকে বোর, বোর থেকে শ্রোয়েডিংগার, শ্রোয়েডিংগার থেকে হাইসেন্‌বার্গ তো নিরন্তর অগ্রগতির ইতিহাস, যেমন বিস্ময়কর, তেমনি সুন্দর।

মার্কস্‌বাদ চিত্ত থেকে চিত্তান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে প্রত্যক্ষ সত্য এবং বলিষ্ঠ যুক্তির জোরেই। অবশ্য যাঁরা বর্তমান সমাজে ধনঞ্জয় ও ধনকুবের, এবং যাঁরা তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতার গদীতে আসীন, এদের সবাইকে সরাতে হবে প্রহারেণ এ-কথা মানি। কিন্তু সত্যের যাচাই তো তরবারির জোরে সম্ভব নয়। জ্ঞানতন্ত্রবাদ নব-নব রূপ পরিগ্রহ ক'রে সামনে আসবে। তার সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্য নব-নব রূপের সন্ধান দ্বান্দ্বিক বস্তুতন্ত্রবাদকেও করতেই হবে; নইলে 'ডায়লেক্‌টিক্' কথাটা অর্থহীন হ'য়ে যায়। এই মোকাবেলার ফলেই আমাদের মতবিশ্বাস সত্য থেকে সত্যতর, বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর হ'য়ে উঠবে। সত্যতম বা পরমসত্য ব'লে কিছু নেই। ছিলো শাস্ত্রভিত্তিক যুক্তিরিক্ত ধর্মবিশ্বাসের যুগে। সে-যুগ আমরা পেরিয়ে আসিনি কি?

এতো কথা বলতে হ'লো এইটুকু বলার জন্য যে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মতন আমার প্রায় সমবয়সী এমন মেধাবী এবং বিদ্যাধর দার্শনিককে আমি পেয়েও পেলাম না। পেলাম না যেহেতু তিনি নিজেকে মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্ লেনিনের বাণীমন্দিরে নজরবন্দী ক'রে রেখেছিলেন; বাইরের খোলা আলো-

বাতাসে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনাকে মেলে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই একান্ত শাস্ত্র-নির্ভর দার্শনিক চিন্তা তাঁকে একাত্ম ক'রেছিলো—অন্তত আমার চোখে—মধ্যযুগীয় প্রতিভাশালী হিন্দু এবং ক্যাথলিক দার্শনিকদের সঙ্গে। ফলে তিনি আমার সমবয়সী হ'য়েও সমকালীন হলেন না।

পরে, অনেক বছর পরে, সম্ভবত ১৯৫০ সালে দয়াকৃষ্ণের সন্ধান পেলাম; আরও পরে আরও দু-চারজনের। কিন্তু এখানে আমি বলছি ১৯৩৩-৩৪ সালের কথা। তখন এ দেশে কোনো দার্শনিকমণ্ডল লক্ষ্যগোচর হয়নি। এমন প্রামাণিক দার্শনিক জর্নাল ছিলো না যেখানে কোনো নিবন্ধ প্রকাশিত হ'লে সরূপ-বিরূপ আলোচনা ও বিচার, উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে পারে। কয়েকজন শক্তিমান প্রবীণ দার্শনিক অবশ্য প্রাচীন হিন্দু-দর্শনের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনে নিযুক্ত ছিলেন। দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসে এ-কাজটা মূল্যবান, কিন্তু একে ঠিক জীবন্ত প্রাণবন্ত দর্শন বলা যায় না। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এ-দেশে সাম্প্রতিক দার্শনিক চিন্তা মুমূর্ষু, অন্তত জরাজীর্ণ।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মহিমা-কীর্তনে দোষের কিছু নেই; কীর্তনযোগ্য সে-মহিমা। কিন্তু বর্তমান পুরুষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনের দর্শন সাধনার আদি এবং অন্ত যদি হয় পূর্বপুরুষের মহৎ সৃষ্টির উদ্ঘাটন এবং প্রচার তবে সেটা বড়ো করুণ ব্যাপারে হবে—কোনো পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ বিগতরূপার আপন পঁচিশ বছর বয়সের প্রশংসনীয় রূপলাবণ্যের কথা প্রসঙ্গত ও অপ্রসঙ্গত বলা এবং সেই বয়সের ফিকে-হ'য়ে আসা ফোটোখানা এ্যালবাম থেকে খুঁজে বার ক'রে সবাইকে দেখানোর মতনই নিষ্করুণ।

যতোদূর জানি আমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকাররাও মোটের উপর রক্ষণশীল, প্রগতিপ্রিয় নন; প্রথাসম্মতি ও ঘরানাশুদ্ধতা রক্ষার উপর যতোটা জোর দিচ্ছেন, মৌলিকতার উপর ততোটা নয়। আলাউদ্দীন খাঁর সৃষ্টিশীল সঙ্গীত-রচনার কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে সে-সৃষ্টিশীলতার ধারা কি স্রোতোবেগ অনেকটা হারিয়ে ফেলেনি? এটা প্রশ্ন মাত্র: এ-বিষয়ে আমি একেবারেই অজ্ঞ, কোনো মন্তব্য করার অধিকার আমার নেই। আধুনিক গান অবশ্য একটি নতুন জিনিষ; কিন্তু ঐ স্যাঁৎসেঁতে ন্যাকামিকে ললিতকলার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত একটা বিরাট ব্যতিক্রম। সবক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত ব্যতিক্রম ব'লে স্বীকার করতেই হয়—সঙ্গীতে যেমন, চিত্রকলাতেও তেমনি।

চিত্রকলা সংস্কৃতিবান মজলিসে ও আড্ডায় আলোচনার বিষয় হ'য়ে উঠলো ঐ-সময়ে (১৯৩৩-৩৪ সালে) যামিনী রায়ের অভিনব চিত্রসৃষ্টিকে অবলম্বন ক'রে। আলোচ্য বিষয় ক'রে তুললেন মূলত শাহেদ সুহ্রাবর্দী এবং সুধীন্দ্র-নাথ দত্ত। আরও বিশ-পঁচিশ বছর আগে অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-নন্দলাল অনুরূপ সাড়া জাগিয়েছিলেন। কিন্তু তিরিশের দশকে তাঁদের কীর্তি ম্লান হ'য়ে এসেছিলো, এবং বেশ-কয়েকজন চিত্র-বিচারক তাঁদের প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান ও নিরুৎসাহ ছিলেন। তবে যে-কারণে আমি মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত হলাম সে-কারণটি চিত্রকলার ক্ষেত্রেও বলবৎ। অতএব।

পঞ্চাশের দশকে নাট্যাভিনয়ও সংস্কৃতিবান মহলে আলোচনার বিষয় হ'য়ে উঠেছিলো প্রধানত বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের কৃতিত্বের ফলে। আরও দুই দশক পূর্বে শিশির ভাদুড়ি কতকটা সেইরকম সাড়া জাগিয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকে সত্যজিৎ রায়ের অনন্যসাধারণ ও বিশ্বজয়ী প্রতিভা সিনেমাকে তুলে নিয়ে এলো আমোদ-প্রমোদের উপাদান থেকে উচ্চতম সুকুমার কলার স্তরে।

এখানে কিন্তু প্রশ্ন ওঠে – নাট্যাভিনয় এবং ফিল্ম-রচনা কি স্বাশ্রয়ী মূল্যরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ? সত্যজিৎ রায় যতো বড়ো চিত্র পরিচালক হোন্-না কেন, তিনি কি 'পথের পাঁচালী'র মতন বিস্ময়কর কলাসৃষ্টি করতে পারতেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ভিত্তির উপর নিজের সৃষ্টিকে আশ্রিত না-ক'রে ? 'চারুলতা', 'অপরাজিত', 'তিন কন্যা' এবং 'জলসাঘর' সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যেখানে তাঁর কাহিনীর ভিত্তি মজবুত নয় সেখানে তাঁর প্রতিভাও একটু ম্লানরূপে দেখা দিয়েছে, যথা 'মহানগর', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা' কিংবা 'দশচক্র' কি তিনি রঙ্গমঞ্চে এমন সার্থকরূপে দাঁড় করাতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ এবং ইবসেনের সাহায্য না-নিয়ে ? অবশ্য চলচ্চিত্র-পরিচালক কিংবা নাট্যপরিচালক উঁচুদরের কাহিনীকারও হ'তে পারেন ; কিন্তু প্রতিভার এমনতরো যুগ্মতা অত্যন্ত দুর্লভ।

ঘুরে-ফিরে আসতে হ'লো সাহিত্যেই। স্থির করলাম সাহিত্যই হবে আমার প্রধান কর্মক্ষেত্র ; অর্থাৎ লেখার প্রধান বিষয়। এই সিদ্ধান্ত আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিলো। অবশ্য আমি গল্প কি কবিতা লিখতে পারি না, জন্মসূত্রে সেই দৈবশক্তি পাইনি, সাধনাসূত্রেও সেই যোগ্যতা অর্জন করিনি।

বস্তুতপক্ষে আমি সে-রকম কোনো সাধনাই করিনি। তবে সাহিত্যের যে নান্দনিক প্রতিমান মনের সামনে রেখে আমরা সৃজনী সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, রসোত্তীর্ণতা বা রসভঙ্গতা বিচার করি, সে-বিষয়ে কিছু বলবার যোগ্যতা আমার আছে কিছুটা হয়তো স্বভাবগত, অনেকটাই বহু বৎসরব্যাপী অধ্যয়ন ও মননের ফলে অর্জিত। ভরসা করি এই প্রসঙ্গে আমি যদি কিছু লিখি তবে কেউ আমার প্রতি স্বাধিকারপ্রমত্ততার দোষ আরোপ করবেন না এবং নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করবেন না।

আমার মনে প্রশ্ন উঠলো কোন্ সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে লিখবো এবং কোন্ ভাষায় লিখবো। ইংরেজি সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে ইংরেজি ভাষায় লিখে আন্তর্জাতিক মহলে খুব-একটা সাড়া জাগাতে পারবো সে-আশা আমি ত্যাগ করলাম পূর্বোল্লিখিত কারণেই। যদি উর্দু ভাষার কেন্দ্রস্থল এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ দিল্লী বা আলীগড়ে জন্মাতাম, অন্তত বড়ো হ'য়ে সেইখানে শিক্ষালাভ করতাম তাহ'লে উর্দু ভাষায় উর্দু সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে লিখবার কথা আমাকে ভাবতে হ'তো। কিন্তু কলকাতার মতন উর্দু ভাষার প্রান্তীয় নগরে আজন্ম বসবাস ক'রে সে-ভাবনা একেবারে অবাস্তব।

সাড়া জাগাবার কথা কয়েকবার বলেছি এবং তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছি। একটু খুলে বলা দরকার। বিগত যুগের ইংরেজ কবি বলেছিলেন "Fame, the last infirmity of noble minds."। আমার মন 'noble mind'-এর অভিধাভুক্ত নয়, তবু এমন অহঙ্কার করতে পারি না যে যে-খ্যাতিটুকু আমার ভাগ্যে জুটেছে তার প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই। আছে, তবে খুব বেশি পরিমাণে নেই। যদি একশজন কিংবা পঞ্চাশজন রসিক পাঠক-পাঠিকার মনে সেই প্রতিক্রিয়া জাগাতে পেরে থাকি যাকে আমি সাড়া জাগানো বলছি তবে তার মূল্য আমার কাছে খুবই বেশি। 'সাড়া জাগানো' কথাটা কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করবো। 'পান্থজনের সখা' বইখানি প'ড়ে আমার এক বন্ধুস্থানীয়া ভদ্রমহিলা (প্রকৃতপক্ষে বন্ধু-পত্নী কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, "আপনি রবীন্দ্রনাথকে নতুন ক'রে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন আমাদের, সে-জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।" কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার সুর বেজেছিলো। মনে হ'লো আমার কয়েকটি দশকের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। বছরখানেক আগে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পক্ষ থেকে কয়েক-জন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও অধ্যাপককে প্রশ্ন করা হয়েছিলো — বিগত বৎসরে

প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে কোন্ বইখানি তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছে। এর উত্তরে অল্প-কয়েকটি কথায় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 'পান্থজনের সখা' সম্পর্কে যে-ভাবটি প্রকাশ করেছিলেন সেটি প'ড়ে আমি এমনি সার্থক বোধ করেছিলাম; 'কম্পাস'-এ প্রকাশিত প্রশান্ত দাশগুপ্তের সমালোচনা প'ড়েও। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এর সমালোচনা, এমন-কি কয়েকজন ভিন্ন মতাবলম্বী লেখকের প্রতিবাদী সমালোচনা প'ড়েও আমি ধন্য বোধ করেছিলাম। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'গ্রন্থ-পরিক্রমা'য় প্রকাশিত সুকুমারী ভট্টাচার্যের, 'দেশ'-এ প্রকাশিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের, এবং সর্বোপরি 'কলকাতা' পত্রিকায় প্রকাশিত অরুণকুমার সরকারের সমালোচনা। কয়েকটি উৎসাহপূর্ণ চিঠিও পেলাম প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও সমালোচকের কাছ থেকে। আমার মনে হ'লো কয়েকজন সুধী পাঠক-পাঠিকাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটক একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে, এবং রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জগৎ ও জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করতে আমি সহায়তা করেছি। হয়তো আমার চোখ দিয়েও। কিন্তু আমার চোখ তো আমি অনেকটাই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। অবশ্য শুধু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নয়; আরও অনেক দার্শনিক ও কবির কাছ থেকে। অনেক মহোচ্চবর্ণ-ধনিকের কাছে আমি অধমর্ণ। কেবল বর্ণযোজনাটুকু আমার।

এই 'আমি' বা 'আমার' শব্দটির অভিধা ক্রমশই সম্প্রসারিত হচ্ছে মানবিকতার বিকাশের ফলে; সব ব্যক্তিক মন মিলে মহামানবিক মন গ'ড়ে উঠছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা ইতিমধ্যেই সম্ভব হয়েছে — আইন্স্টাইনের বিজ্ঞান, শ্রোয়েডিংগারের বিজ্ঞান, হাইসেন্বার্গের বিজ্ঞান ব'লে কিছু নেই; সবাই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও সহযোগী হ'য়ে সেই বিজ্ঞান রচনা করছেন যাকে মহামানবিক বিজ্ঞান বলা যায়। শ্রেয়োনীতির ক্ষেত্রেও আমরা 'tribal morality'-র স্তর থেকে উঠে এসেছি সর্বজনীন বা human morality-র পরিধিতে অন্তত আদর্শগতভাবে। শিল্প-সাহিত্যের বেলাতেই মৌলিকতার দাবি এখনও সোচ্চার। এখানেও মৌলিকতা একান্ত ব্যক্তিক থাকবে না খুব বেশিদিন। আমি চেয়ে আছি সেই দিনের দিকে যে-দিন আমরা উপলব্ধি করবো যে সব ক'জন মহাকবি মিলে একটি সর্বমানবিক মহাকাব্য রচনা করছেন। সে-দিন হয়তো এখনও বহু দূরে রয়েছে। তবে ইতিমধ্যে য়েট্স্ একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, তাঁর অনুরোধ যে তাঁর সবক'টি খণ্ড-কবিতাকে

যোজনা ক'রে একটি মহাকাব্যরূপে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন পাঠকেরা। তার জন্য সব জায়গায় সন-তারিখ অনুযায়ী সাজানো যাবে না হয়তো ; কিন্তু সেটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নয়।

রবীন্দ্র-কাব্যের বিচারে ও ব্যাখ্যায় আমি এই চেষ্টাই করেছি। তারিখের দাবি অগ্রাহ্য করিনি, কিন্তু তাকে একমাত্র বা সবচেয়ে বড়ো দাবি ব'লে মানিনি। রবীন্দ্রনাথ বিবিধ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বহির্ভূত মাধ্যমে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন। গীতাঞ্জলি পর্বে যে-কথা তিনি রূপক নাট্যে অসঙ্কোচে বলতে পেরেছেন, লিরিকে সে-ভাব ব্যক্ত করতে তার পরে আরও দশ-বিশ বছর সময় লেগেছে।

পক্ষান্তরে, আমি লক্ষ করলাম যে এই দেশে, অন্ততপক্ষে বাংলা ভাষার দেশে, সংস্কৃতি-উদ্যানের সবচেয়ে জীবন্ত ফলন্ত বৃক্ষ হচ্ছে সাহিত্য এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা। তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উচ্চাভিলাষ জাগলো আমার মনে। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আমাকে তৃতীয়বার বাংলা ভাষা শিখতে হ'লো – যে-ভাষা আমার সাহিত্য-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার উপযুক্ত বাহন হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'কালান্তর' এবং 'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহার আমি বার চারেক পড়লাম।

ঐ-সময়ে দৈবাৎ ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-এর কয়েকটি সংখ্যা পুরোনো বইয়ের দোকানে দেখতে পেলাম এবং প্রতি সংখ্যা চার আনা দামে কিনে আনলাম। মনোযোগ সহকারে পাঠ করলাম। বিশেষরূপে আমাকে আকৃষ্ট করলো সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের ধ্বনি-ঝংকৃত সন্ধিসমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দ-সমৃদ্ধ ভাষা। দুর্বলতাও চোখে পড়লো। কোনো-কোনো জায়গায় ভাষা তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে দিচ্ছে বা চালিত করছে ; কবিতায় সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু গদ্যের পক্ষে সেটা স্বধর্মচ্যুতি।

আমার প্রথম প্রবন্ধের ভাষায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষার সচেতন প্রভাব লক্ষণীয় ; সে-প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও আশা করি কেউ-কেউ লক্ষ করবেন। প্রবন্ধে কি বলতে চাই তার একটা ছক তৈরি ক'রে আমি লিখতে আরম্ভ করলাম – বক্তব্যের শৃঙ্খলা যাতে সাধ্যমতো যুক্তি-নির্ভর হয়, ভাষা-নির্ভর নয়। শুনেছিলাম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সকালবেলা বাড়িতে একা ব'সে পড়াশুনো করেন। তাঁর হাতে প্রবন্ধটি দিয়ে আসার জন্য গেলাম তাঁর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের পুতুলওয়ালা বাড়িতে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে-দিন তিনি সকালেই বেরিয়ে

গিয়েছিলেন। অগত্যা তাঁর ভৃত্যের হাতেই দিয়ে এলাম। মাস দেড়েক পরে শ্রাবণ সংখ্যাটি প্রকাশিত হ'লো। স্টলে দাঁড়িয়ে মলাটের উপর ছাপানো লেখকের নামের সূচি প'ড়ে গেলাম নিচে থেকে উপরের দিকে। আমার নামটি না-দেখে স্বভাবতই একটু হতাশ বোধ করলাম। আমি আশা করেছিলাম যে সুধীন্দ্রনাথ অন্তত আমাকে পত্রযোগে জানাবেন লেখাটি মনঃপূত হ'লো কিনা এবং নামঞ্জুর হ'লে কোথায় তার ত্রুটি। কিন্তু কোনো চিঠি পাইনি। এখন আমার মনে হয় খুব সম্ভব লেখার শেষে আমার ঠিকানাটি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এই অবস্থায় তাঁর কাছে যেতে সঙ্কোচ বোধ হ'লো। ভাবলাম আরও তিন মাস অপেক্ষা করি পরবর্তী সংখ্যার জন্য। যথাসময়ে কার্তিক সংখ্যা বার হ'লো। আবার নামের তালিকা প'ড়ে গেলাম নিচের দিক থেকে। হতাশ হবার অবস্থা যখন প্রায় এলো তখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম আমার নামটি সকলের উপরেই রয়েছে, আমার লেখাটি ("বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি") 'লীডিং আর্টিকল'-এর সম্মান পেয়েছে। এর পরে একদিন হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর শুক্রবারিক সান্ধ্যবৈঠকে গেলাম। সুধীন্দ্রনাথ বললেন, আপনার লেখাটি আগের সংখ্যাতেই দিতে পারতাম কিন্তু তাহ'লে নিচের দিকে পড়তো, চার ফর্মার প্রিন্টিং অর্ডার চ'লে গিয়েছিলো। "Your article was so excellent that I wanted to make it the leading article. I hope you didn't mind the delay." (আমার সঙ্গে তাঁর তখন এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কথাবার্তা ইংরেজি ভাষাতেই চলতো।)

উত্তরে আমি কী বলেছিলাম সঠিক মনে নেই। সম্ভবত বলেছিলাম: "I feel over-whelmed by the success of my first venture." – "Oh, then you are going to be still more over-whelmed. Pramatha Choudhuri spoke very highly of your article and asked his friend Atul Gupta to read it ; he also appreciated it. আমি নিজে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প'ড়ে শোনালাম। শুনে তিনি খুব খুশি হলেন, বললেন একে দিয়ে আরও লেখাও। So now you must write regularly for *Parichay*. If you give me something within three weeks, I can put it in the next issue." আমি বললাম: "অতো দ্রুতগতিতে আমার মনও এগোয় না, কলমও চলে না। তার পরের সংখ্যার জন্য চেষ্টা করতে পারি।"

"সুন্দর ও বাস্তব" সেইভাবে লেখা। দুটি কারণে আমার কাছে স্মরণীয় —প্রথমটি গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয়টি সামান্য। গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হচ্ছে যে এই প্রবন্ধে আমার রবীন্দ্র-চর্চার সূত্রপাত — বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের আলোচনা দিয়ে। তুচ্ছ কারণটি এই যে এই প্রবন্ধে আমি 'চিত্রকল্প' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করি 'imagery'-র প্রতিশব্দরূপে। এই সামান্য কথাটা উল্লেখ করবার মতন কিছু নয়, তবে একটি তথ্যের ভুল ঘটেছিলো বুদ্ধদেব বসু-র বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের পরিভাষার তালিকায়। তিনি লিখেছিলেন, এটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অবদান।* অথচ তখন সুধীন্দ্রনাথ শব্দটি পছন্দ করেননি। বলেছিলেন, 'কল্পচিত্র' শব্দটি এখানে সঠিক শব্দ। আমি বললাম, 'কল্পচিত্র' বা 'কল্পচ্ছবি' আমি image-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করতে চাই। 'imagery' তো ঠিক তা নয়, তাই অন্য শব্দটির প্রয়োজন বোধ করলাম। সাহস করতাম না যদি-না রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই এর নজীর পেতাম। দেখলাম তিনি ইংরেজি 'pattern'-এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'রূপকল্প'। যা-ই হোক্ সুধীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ সত্ত্বেও শব্দটি আমার প্রবন্ধে রইলো। পরবর্তী সমালোচনা-সাহিত্যে এটি খুবই প্রচলিত।

পুরোনো সমস্ত লেখাই বর্তমান গ্রন্থে অসংশোধিত আকারেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতোকাল পরে আমার বর্তমান মন ও ভাষা নিয়ে প্রাচীন রচনার সংশোধন মানেই পুনর্লিখন। ব্যতিক্রম "আধুনিক সাহিত্যের সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধটি। 'কবিতা'য় এই লেখাটি যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো এখানে তা অনেকটা পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই পরিবর্তন বা সংশোধন প্রবন্ধ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই করা। তাই এখানে রেখে দিয়েছি।

অবশ্য নাম-প্রবন্ধটি ("পথের শেষ কোথায়") এবং "নয়নে কেন আঁখি" যেভাবে 'দেশ'-এ (১৩৮৩) প্রকাশিত হয়েছিলো এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করবার সময় তা অনেকখানি সংশোধন করেছি। বাদ গেছে কিছু অংশ, যোগ হয়েছে তারচেয়ে আরো অনেক বেশি।

'আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকাটি বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আমার মনে বেশ-কিছুটা প্রতিরোধ ছিলো। তবু করলাম দু-চারজন সহৃদয় বন্ধুর, বিশেষত স্বপনের অনুরোধে। শুনেছি পুণ্যবানরা উপরোধে ঢেঁকী

* "সমালোচনার পরিভাষা", 'কবিতা', ১৪।১, ১৩৫৫ আশ্বিন, পৃ ৫৩

গেলেন ; আমি তো মাত্র একখানা অনুপাদেয়, নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ গিললাম। তাঁদের যুক্তি ছিলো যে আধুনিক কবিতার প্রথম প্রামাণিক সংকলনরূপে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বইখানির একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে ; এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার ভূমিকারও।

আমার আপত্তি প্রথমত, ভূমিকার তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে তিনটি প্রতিভূ কাব্যতত্ত্বের আলোচনা। অনুরূপ আলোচনা আরও বিশদভাবে এবং ঐ-বিষয়ে অধিকতর অধীত বিদ্যার সাহায্য নিয়ে আমি করেছি 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে "গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা" শীর্ষক অধ্যায়ে। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত ভূমিকার শেষের দিকে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বাঙালী আধুনিক কবি সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছি তা ওপর-ওপর এবং দায়সারা গোছের লেখা। এখন প'ড়ে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি, খানিকটা লজ্জিতও। তাঁদের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয়নি। বছর দুই পরে, *Longman's Miscellany* 1943 সংখ্যায় ("Tendencies in modern Bengali Poetry") কিঞ্চিৎ ত্রুটি-সংশোধনের চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা অতিশয় কিঞ্চিৎ-ই।

অতঃপর আমি আরও-কয়েকটি বিষয়ে অল্প-বিস্তর পড়াশোনা ক'রে এবং মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে অবশেষে পৌঁছে গেলাম রবীন্দ্রনাথে। "সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে।"

পৌঁছিয়ে দিলেন প্রধানত বুদ্ধদেব বসু-ই। তাঁর বোদলেয়রের কবিতার সুন্দর অনুবাদ এবং ঐ-অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকাটি অনুজ কবিদের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিলো। রীতিমতো একটি বোদলেয়র cult গ'ড়ে উঠেছিলো পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কবিদের মধ্যে। দেখে আমি দুঃখিত বোধ করলাম। বোদলেয়রকে অসাধারণ শক্তিমান কবি মনে করলেও তাঁর মৌল জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধ আমার কাছে একান্ত একপেশে বা একদেশদর্শী ঠেকে। উপরন্তু বুদ্ধদেবের ইংরেজি গ্রন্থ *Rabindranath Tagore: portrait of a poet* এবং বাংলা গ্রন্থ 'কবি রবীন্দ্রনাথ' নানা দিক থেকে খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু দুটোই শেষ হ'য়ে যায় 'গীতাঞ্জলি' পর্বের আলোচনায়। প'ড়ে আমি তাঁকে বললাম—সম্ভবত একখানা বইয়ের পরিধির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যধারার যথোপযুক্ত আলোচনা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক ঠেকেছিলো, কিন্তু গ্রন্থের শেষে আপনি তো বললেই পারতেন যে

পরবর্তী কোনো এক বা একাধিক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' এবং উত্তর-'বলাকা' কাব্যের আলোচনা করবেন। আমার কথায় উত্তরে বুদ্ধদেব যা বললেন তা শুনে আমি বিস্মিত ও ব্যথিত হলাম। বুদ্ধদেব বললেন, 'গীতাঞ্জলি'র পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত কী-বা লিখেছেন। অনেকটা অংশ প্রথম পর্বের পুনরুক্তি, এবং তার চেয়েও বেশি অংশ বক্তব্যপ্রধান উপদেশমূলক কবিতা যা প্রকৃতপক্ষে ঠিক কবিতাই নয়, ছন্দে লেখা হ'লেও গদ্যধর্মী। তৎ-পূর্বে তিনি কোথাও-কোথাও ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন, শেষ বয়সে সে-মত প্রত্যাহার করলেন সম্ভবত বোদলেয়রের প্রেমে প'ড়ে।

আমি রবীন্দ্র-প্রেমিক তেরো বছর বয়স থেকেই — উর্দু অনুবাদে তাঁর 'গীতাঞ্জলি' প'ড়ে। এ-প্রেম আরও অনেক গভীর হ'লো যখন ১৯৩৭ সালে একটি ভালো গ্রামোফোন কেনার সঙ্গতি হ'লো আমার, এবং তার সঙ্গে অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড - কণক দাস, অমিতা সেন, রাজেশ্বরী বাসুদেব, কণিকা মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি।

অন্যদিকে সদ্য-প্রকাশিত 'পূরবী' আমায় মুগ্ধ করেছিলো। কিন্তু এখন ঐ-কবিতাগুলি আমার মনে আর ততোটা উচ্ছ্বাস জাগায় না। কয়েক বছর পরে প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হ'লো 'পরিশেষ' এবং 'পুনশ্চ'। প'ড়ে আমি অভিভূত হলাম। এ-অভিভব টিঁকে রইলো 'শেষ লেখা' পর্যন্ত ; টিঁকে আছে আজ পর্যন্ত।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত প্রভৃতি নবীন কবিদের লেখার মধ্যে শেষ পর্বের রবীন্দ্র-কাব্যের সোচ্চার অবমূল্যায়ন এবং অননুশীলন আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জরূপে উপস্থিত হ'লো। প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র-সমালোচকরাও রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্যকে অবহেলা করেছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষ বোধকরি বিরল (একমাত্র ?) ব্যতিক্রম। এই ব্যাপারে দেখছি প্রবীণ এবং নবীনরা একটি যুক্তফ্রন্ট রচনা করেছেন। যেন আমার মনের গভীর তল থেকে একটা দাবি দুর্বার হ'য়ে উঠলো — রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখতেই হবে। কিছু হ'য়ে উঠলো অনেক-কিছু।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার যা বলার তা বলেছি দু'খানি মাঝারি আকারের গ্রন্থে ('আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'পান্থজনের সখা'তে)। *Poetry and Truth* এবং 'গালিবের গজল থেকে' — এই দুটি গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন। বর্তমান গ্রন্থেও তা-ই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমার বলা শেষ হ'য়ে গেলেও শেষ হয় না আধুনিক কবিতা বিষয়ে। আধুনিকতা প্রসঙ্গে আমি 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে যা বলেছি তা অনেকখানি বিমূর্ত থেকে গেছে আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে আমার স্বল্প ভাষণে। অবশ্য আমি বোদলেয়র, ম্যালার্মে, ভালেরী প্রসঙ্গে কিছু ব'লে আমার আলোচনাটিকে খানিকটা মূর্ত করবার চেষ্টা করেছি। তবু তাঁরা তো দূর দেশের মানুষ, দূর ভাষার কবি। কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাঙালী কবিদের বিষয়ে (অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, প্রভৃতি) আলোচনা না-করলে আমার নিজের চোখে আমি বিমূর্ততার দোষারোপ থেকে মুক্ত হ'তে পারি না।

তাই ঐ-সময় থেকেই আমার মনে পরিকল্পনা এবং সঙ্কল্প দানা বেঁধেছিলো যে অন্তত তিনজন শীর্ষস্থানীয় কবি সম্বন্ধে (অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে) বিশদ ক'রে কিছু লিখবো। দুই দিক থেকে আমি এদের কবিতার গভীরতলে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ করেছি। প্রথমত, ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্বের সূত্র ধ'রে আলাপ-আলোচনার মধ্যে এঁদের কবিতার মর্মস্থলে পৌছবার পথ খুঁজে পেয়েছি। কোনো-কোনো দিক থেকে এঁদের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এঁদের মনের নিপুণতা এবং চারিত্র্যের বলিষ্ঠতা। মোটের উপর এঁরা আমার কাছে শুধু প্রিয় নন, শ্রদ্ধেয়ও বটে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ কাব্যানুরাগী পাঠকের মতন এঁদের কবিতার কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত ও কিঞ্চিত অবগুণ্ঠিত ব্যঞ্জনা বুঝতে চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি এঁদের ব্যাসকূটগুলি উন্মোচন করতে, দূর দেশকাল থেকে আহরণ করা নানা উপাদানের সন্ধান করেছি – যাকে বলে রীতিমতো অধ্যয়ন।

শীর্ষস্থানীয় আধুনিক বাঙালী কবিদের সম্বন্ধে বিশদ ক'রে কিছু লিখবার জন্যে আমার মন যখন প্রস্তুত, এমন-কি অস্থির, তখন বিধি হইল বাম, শরীর হ'লো ব্যাধি-মন্দির। মন্দিরের রক্তচক্ষু দেবতা ঘোষণা করলেন : সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমি ছাড়বো না বিনা যুদ্ধে। ফলত ঐ-সময়ে আমার শরীরের সঙ্গে মনের পরিচয় হ'লো খড়ো-খড়ো। যদি বর্তমান বছরে (১৩৮৩-৮৪) প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ, বিশেষত বর্তমান প্রবন্ধটি, কয়েকজন সহৃদয় পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য বিবেচিত হ'য়ে থাকে তবে সেই কতিপয় বর্গ-ইঞ্চি পরিমাণ

ভূমি আমি কেড়ে নিতে পেরেছি আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রুর দখল থেকে। "ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ, ন চ বিন্তাসমো বন্ধুঃ।" কিন্তু যুদ্ধ ক'রে-ক'রে আজ আমি বড়ো ক্লান্ত, জর্জরিত। এই জীবনান্ত বেলায় শুনতে পাচ্ছি কেবল মাটির ডাক, মাটির বুকেই উপশান্ত হোক্ আমার সব অনারোগ্য যন্ত্রণা। ডাক্তারেরা তো ব'লেই দিয়েছেন—আমার রোগ শুধু স্থায়ী নয়, প্রগতিশীল ('Progressive !')

শুধু কেবল কবিতা নয়, কবিতার বাইরের দুটি বিষয়েও আমার কিছু বলার ছিলো—অস্তিত্ববাদ (existentialism) এবং মার্কস্‌বাদ। দুটিই একাধারে দার্শনিক মত এবং ধর্ম-ভাবনা; দুটিরই বিস্তারের ক্ষেত্রে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সৌন্দর্যতত্ত্ব (বিশেষত সাহিত্যনীতি) এবং শ্রেয়োনীতি বা চারিত্র্যনীতি। দুই মতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে প্রচলিত ধর্মমতকে এবং পাকেপ্রকারে তাদের সমর্থক বিবিধ প্রকারের idealist দর্শনকে খণ্ডিত ক'রে। তাদের সাদৃশ্য যেমন স্পষ্ট নেতিবাচক দিক দিয়ে, তেমনি ইতিবাচক দিকে তাদের বৈপরীত্যও সোচ্চার। অস্তিত্ববাদে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সবার উপরে গণ্য এবং সর্বত্রই ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছার জয়জয়কার। সবার উপরে ব্যক্তি সত্য, তাহার উপরে নাই। মার্কস্‌বাদে ব্যক্তির অস্তিত্ব অবলুপ্তপ্রায়। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁরা ব্যক্তিকে নিমজ্জিত করেছেন শ্রেণী বা class-এর মধ্যে। ব্যক্তি ব'লে কিছু নেই, আছে দুটি শ্রেণী—শোষক এবং শোষিত। গতর-খাটিয়ে শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ করেছেন শ্রেণীপাশ মুক্ত (declassé) কতিপয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত মগজ-খাটিয়ে বা বুদ্ধিকর্মী; শোষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে তাদের প্রসাদ-লালিত বেশিরভাগ বুদ্ধিকর্মীকে। এই বুদ্ধিকর্মীরা হয়তো ভাবেন যে তাঁরা বিশুদ্ধ জ্ঞানের বা বিশুদ্ধ শিল্পের চর্চা করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-চর্চার ফলশ্রুতি শোষকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থেরই সমর্থন ও সংরক্ষণ। সোজাসুজি ভাড়াটিয়া লেখকের অস্তিত্ব অস্বীকার করছি না। নামজাদাদের মধ্যেও তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাবে; তাঁদের বাজার-দর একটু চড়া।

অস্তিত্ববাদ বিষয়ে আমি কিছুকাল লেখাপড়া করেছি, কিছুদূর ভাবনা-চিন্তা করেছি। ইংরেজিতে কিছু লিখেও রেখেছি কিন্তু সেটি এখনও অপ্রকাশিত। তাকে ভিত্তি ক'রে বাংলায় বিশদভাবে আলোচনা করলে বাংলা ভাষার একটি লক্ষণীয় অভাব খানিকটা পূরণ করতে পারতাম হয়তো। এই কাজটা

সম্ভব হ'তো বছর তিনেক আগে পর্যন্ত আমার যতোটুকু শারীরিক সুস্থতা ছিলো সেটি বজায় থাকলে বা ফিরে পেলে। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়।

মার্কস্‌বাদ বিষয়ে আমার কিছু লেখা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের সঙ্গে এ-লেখাগুলিও অদূর ভবিষ্যতে বই আকারে বেরোবে খুব সম্ভবত। কিন্তু মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে আমার আরও অনেক রচনা ও ভাবনা রয়েছে যা টাইপের অক্ষরে এবং মানসিক লিপির আকারেই থেকে যাবে। বাংলাতেও খানতিনেক প্রবন্ধ চল্লিশের দশকে মার্কস্‌বাদী 'পরিচয়'-এ বেরিয়েছিলো। সেগুলি কিন্তু তাড়াহুড়ো ক'রে লেখা এবং রাজনীতিক বিবাদ-বিতর্কের সঙ্গে জড়িত। তার মধ্যে "সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য" এবং "বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য" এখানে উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে অনেকটা সংশোধিত ক'রে এবং আলোচনাটিকে আরও বিস্তারিত ক'রে লিখবার ইচ্ছা আমার দুর্বল শরীর-যুক্ত মনে এখনও প্রবল।* জানি না সেটুকুও সম্ভব হবে কিনা।

Marx's Thesis on Feuerbach-কে মার্কসীয় দর্শনের একাদশটি মূল সূত্র মনে করা যেতে পারে। শেষ সূত্রটি বোধকরি সবচেয়ে সুবিদিত: "Philosophers have only interpreted the world in various ways; the point however is to change it."। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু অনিবার্য প্রশ্ন ওঠে—যাঁরা জগতের নতুন ব্যাখ্যা রচনা করলেন এবং যাঁরা সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেন তাঁদের মনের কি কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তার ফলে? নিশ্চয়ই মার্কস্‌বাদীরা বলতে চান না যে মন জগতের বাইরে সপ্তম আকাশের উর্ধ্বে খ্রীষ্টীয় ভগবানের (God the Father-এর) পাশে বিরাজমান। কাজেকাজেই নতুন দার্শনিক ব্যাখ্যার ফলে এঁদের মনের যে-পরিবর্তন ঘটেছে তা তো জগতেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসে দেখা গেছে জগতের নতুন দার্শনিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে এবং কখনো-কখনো পথনির্দেশ করে জগতের নতুন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত করতে। সে নতুন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কালক্রমে নতুন প্রযুক্তি-

বিদ্যা বা টেক্‌নলজির মধ্যে ফলিত হয়। এবং এই নতুন টেক্‌নলজির দ্বারা অত্যন্ত স্থূল অর্থে জগতের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হ'য়ে ওঠে।

জঁ। পোল সার্ত্র্‌ বলছেন, "I cannot make liberty my aim unless I make that of others equally my aim"* অর্থাৎ আমার liberty চাওয়া এবং অন্যের liberty না-চাওয়ার মধ্যে একটা বিরোধ (contradiction) রয়েছে ; এ-বিরোধ স্পষ্টতই যৌক্তিক বিরোধ (logical contradiction) নয়। খুব সম্ভব চারিত্র্যনীতিক বিরোধের (moral contradiction-এর) কথা ভেবেছেন সার্ত্র্‌। মনে রাখা দরকার যে সার্ত্র্‌ liberty কথাটা প্রাচীন হিন্দু দর্শনের 'মোক্ষ' অর্থে ব্যবহার করছেন না। তাঁর কাছে liberty মানে আমার কামনা-বাসনা পূর্ণ করবার স্বাধীনতা, এবং আমি যা বলতে বা গড়তে চাই তার যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা – এককথায় 'শ্রীবৃদ্ধি'। যারা একান্তই স্বার্থপর এবং দুর্নীতিপরায়ণ তারা কোনোকালে নিজের, নিজের দল, সম্প্রদায়, রাষ্ট্রজাতি বা গোষ্ঠীর (race-এর) শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য moral contradiction-এর মতন সূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাননি, ঘামাবেনও না। নর্ডিক জাতির মধ্যে যাদের সবচেয়ে প্রাগ্রসর বলা যেতে পারে অনেকদিক থেকে, তারা নিজেদের সর্বৈব শ্রীবৃদ্ধির জন্য নৃশংসভাবে ষাট লক্ষ ইহুদীর প্রাণনাশ করেছিলো। সার্ত্রের একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অস্তিত্ববাদের সঙ্গে মানবিকতাবাদের (humanism-এর) মিল অতো সহজসাধ্য নয় ; বেশি সহজ করতে গেলে সে-মিল হ'য়ে যায় গোঁজামিল।

এইসব প্রশ্ন যখন আমার মনে অত্যন্ত জাগরূক তখন দেখি এই প্রশ্নগুলিকে আমার পাঠকদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলার এবং উত্তরের সন্ধানে আমার সহযাত্রী হবার উৎসাহ সঞ্চারিত করার মতন শারীরিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি।

এ-সব কথা আমি অনেকদিন আগে থেকে ভাবছি এবং যাঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য তাঁদের ভাবনা-চিন্তা অনুধাবন করেছি প্রয়োজনীয় বইপত্র প'ড়ে। অনেকদিন আগেই সাধ্যমতো ভালো ক'রে লিখে ফেলা উচিত ছিলো আমার। এখন লিখতে গিয়ে দেখি লগ্ন গেছে পেরিয়ে ; সাজতে-গুজতে দোল গেছে ফুরিয়ে।

* *Existentialism & Humanism*, Philip Mairet tr. (London : Methuen, 1955), p. 52.

কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে আমার মন খুবই রাজী; কিন্তু সে-মন শ্রদ্ধেয় নয়। শ্রদ্ধেয় সেই মন যে সঙ্গে-সঙ্গে কী পেলাম তার হিসাবও মেলায় *– কতো মূল্যবান বন্ধুত্ব, একাধিক অমূল্য প্রেম, কোনোটা ক্ষণভঙ্গুর, কোনোটা ভাঙে দশ-বিশ বছরে। সবই চ'লে যায়, তবু যায় না, রেখে যায় এমন-কিছু যা* সোনার পাত্রে ধ'রে রাখার যোগ্য। কতো অমৃতভরা মুহূর্ত এসেছিলো এ-দীর্ঘ জীবনে, আজ তা কেবল দূরস্মৃত কাহিনী, কিন্তু কোনো প্রসিদ্ধ কাহিনী-কারের কাল্পনিক রচনা থেকে কম সুন্দর নয় সেই বাস্তবিক কাহিনীগুলি। যৌবনকে চঞ্চল ক'রে রাখে ভবিষ্যতের রঙিন বিরাট কল্পনাগুচ্ছ; বার্ধক্যকে শান্ত করে অতীতদিনের ছোটো-ছোটো ভীষণ মধুর স্মৃতি; "ভীষণ মধুর" কথাটি এখানে দ্ব্যর্থসূচকভাবে ব্যবহার করেছি। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে এই যে, স্মৃতি সব ক্ষেত্রেই সুখের স্মৃতি হবে এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম দুটি শ্রেষ্ঠ গানের সাহায্যে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে চেষ্টা করবো।

প্রথম গানটি হচ্ছে: "গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা"। এই গানের ছন্দ মিল ধ্বনিমাধুর্য বাক্‌চারুতা সব বাদ দিয়ে যে তথ্যগত ঘটনার উপর এর ভিত্তি সেটাই এখানে আমার আলোচ্য। গীতি-রচয়িতার পক্ষে ঘটনাটি কাল্পনিক বা কল্পনা-রঞ্জিত হ'তেও পারে, কিন্তু আমরা অনায়াসে ভাবতে পারি এমন লোকের কথা যার জীবনে অনুরূপ ঘটনা বাস্তবিকই ঘটেছিলো। অনেক বছর পরে তার স্মৃতির রঙ ও রূপ কেমনতরো হবে? উপরিতলে অবশ্য এটা বেদনার স্মৃতি। দূর দেশে যাত্রার পূর্বে গোধূলি লগ্নে প্রেমিক গিয়েছিলো প্রিয়ার কাছে তার এ-যাবৎ ঈষৎ অবগুণ্ঠিত প্রেম প্রবাস যাত্রার পূর্বে উদ্‌ঘাটিত করতে, এবং প্রতিদানে তার কাছ থেকেও কিছু আবেগপূর্ণ কথা শুনতে। প্রিয়া কিন্তু তাকে বিদায় দিলো অত্যন্ত সহজভাবে; প্রেমিকের সব কথা যেন তার কানেই যায়নি। অথচ প্রেমিক লক্ষ করলো যে প্রিয়া চোখ তোলেনি এবং তার না-তোলা মুখের উপর নিবিড় মেঘের ছায়া এতো ঘন ছিলো যে, প্রেমিকের মনে সন্দেহ র'য়ে গেলো প্রিয়ার অন্তরের নীরব বেদনা হয়তো ব্যক্ত হয়েছিলো তার চোখে। কিন্তু বিরূপ প্রকৃতি সে-সন্দেহ ভঞ্জনের অবকাশ দিলো না। এই সন্দেহ-কণ্টকিত ব্যথা নিয়েই তাকে বিদায় নিতে হ'লো। কয়েকটি মুহূর্তের জন্য মেঘ স'রে যেতে পারতো, কিন্তু সরেনি। সরলে তার বাকি জীবন অন্যরকম হ'তো। সেই জন্মান্তকারী মুহূর্তগুলি জন্মের মতন হারিয়ে গেলো। তবু সব হারায়নি। যে-সন্দেহ নিয়ে সে চ'লে গেলো সেই সন্দেহের

বেদনার তলায়-তলায় কি সুখ লুকানো ছিলো না? প্রবাসে সে বার-বার ভাবছে প্রিয়ার চোখে নীরব বেদনা ছিলো, কিন্তু সে দেখতে পায়নি।

দ্বিতীয় গানটিরও ("মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চ'লে, সেদিন ভরা সাঁঝে") লগ্ন একই—গোধূলি কিংবা ভরা সাঁঝ। এবার কিন্তু বিদায় নিতে এসেছে প্রিয়া। থীম-ও একই অনুভূতি—সন্দেহ বা দ্বিধা। প্রেমিকের মনের প্রতিক্রিয়াও প্রথম পর্যায়ে একইপ্রকার বেদনা। এই গানে প্রকৃতি কিন্তু অনুকূল—বকপাঁতি যেন ডানায় বহন ক'রে নিয়ে চলেছে প্রেমিকের মনোবেদনা প্রিয়ার কাছে দূর ভূবনে পৌছে দেবার জন্য। সন্দেহের একটি পিঠ গানের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে; "তুমি সে কি হেসে গেলে আঁখিকোণে।" অন্য পিঠটি অনুক্ত হ'লেও অব্যক্ত নয়,—বিদায়কালের নিবিড় অনুভূতি। "যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি / কী কথা ছিল যে মনে।" তোমার মনের গভীর বেদনা "সে কি রয়ে গেল গো সিক্ত যূথীর গন্ধবেদনে।" সন্দেহ দো-ধারি তলোয়ার—সুখের দিকেও কাটে, দুঃখের দিকেও কাটে।

কিছুই যদি না-থাকে, "তবু তো আছে আঁধার কোণে ধ্যানের ধনগুলি।" এই "ধ্যানের ধনগুলি"কে, এই স্মৃতিরত্নগুলিকে, কেউ কেড়ে নিতে পারে না। পারে না কি? অস্মার বা স্মৃতিবিলোপ (amnesia) ব'লে একটা রোগ আছে যা মানসিক কারণে ঘটলে ফ্রয়েড-নির্দেশিত মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতিতে চিকিৎসা সম্ভব, আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল। কিন্তু সাধারণত রোগটা ঘটে মস্তিষ্কের কোনো-কোনো অংশের বিকারের ফলে। তখন তো সবই চ'লে যায়, কিছুই বাকি থাকে না।

আমরা কি শেষ পর্যন্ত শরীরের দাস? একটা স্তর পর্যন্ত তো বটেই। শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্র, মোটের উপর ঠিকমতন কাজ না-করলে আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

(যদি শরীরের কোনো অংশে যন্ত্রণা খুব প্রবল হয় এবং তার আরোগ্যের লেশমাত্র সম্ভাবনা না-থাকে, মরফিন-জাতীয় কোনো ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে রোগীকে অর্ধচেতন ক'রে রাখা ছাড়া উপায়ান্তর না-থাকে চিকিৎসকের, অথবা যখন আগামীকাল আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনদের ন্যূনতম মাত্রায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হবে কিনা, সে-বিষয়ে ভরসামাত্র না-থাকে—তখন আধ্যাত্মিক সাধনা বা বিকাশের কথা বলা বাতুলতা মাত্র। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ জীবনের শেষ দুটি বৎসর এবং কবি নজরুল ইসলাম শেষ দুটি দশক

যেভাবে কাটিয়েছিলেন, সে-সময়ে কি এই সমস্ত ব্যক্তিদের মন পশুপক্ষীর মনেরও অধম হ'য়ে যায়নি ?

আমার বিশ্বাস, যখন অনারোগ্য শারীরিক অসুস্থতার যন্ত্রণা কিংবা অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার ভার একটা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আমরা সত্যিই শরীরের এবং ব্যাপকতরভাবে বলতে গেলে জড়প্রকৃতির দাস। তখন আমরা এতোই কাঙাল যে "ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই" বলার মতন আধ্যাত্মিক সম্বলটুকুও আমাদের থাকে না। মার্কস্‌বাদ তথা সর্বপ্রকার জড়বাদের এই অন্তর্নিহিত সত্যটা আমি স্বীকার করি।

আমার মূল রোগ Parkinsonism সম্বন্ধে ফিজিওথেরাপীতে বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, ওঁর রোগটা বড়ো "beautiful"! "কী অর্থে beautiful ?" "দেখবেন ওঁর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একে-একে অকেজো হ'য়ে যাবে, কিন্তু মস্তিষ্কটা শেষ পর্যন্ত বেশ active থাকবে।" বলবার কথা জমছে মনে, অথচ প্রকাশ করবার শারীরিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি—সে যে কী বিষম জ্বালা, কেমন ক'রে তা বোঝাবো! রবীন্দ্রনাথের মতন সাত্ত্বিক কবির চারিত্র্যশক্তি বা মনোবল আমার নেই যে বলবো :

এই করেছ ভালো নিঠুর হে, এই করেছ ভালো,
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।

বরঞ্চ আমি গালিবের মতন মাটির মানুষের কবির ভাষায় বলতে পারি :

চ'লে যাচ্ছি জীবনের শত অপূর্ণ বাসনার ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে ;
আমি এক নির্বাপিত প্রদীপ, মহ্‌ফিলে রাখার যোগ্য নই আর।

রবীন্দ্রনাথ আমার মনকে প্রসারিত করেছেন, হৃদয়কে সূক্ষ্ম রসগ্রাহী ও সংবেদনময় করেছেন, কিন্তু চরিত্রশুদ্ধি ঘটাতে পারেননি। ভবিষ্যতে কি পারবেন ?

হায় রে, আমি ঘর বেঁধেছি এতই দূরে
না জানি তাঁর আসতে হবে কত ঘুরে।

কিন্তু আর তো সময় নেই ; এ-পারের কৃষি হ'লো সারা

পুনশ্চ :

আগেই বলেছি, এই মুখবন্ধটি অত্যন্ত অসুস্থ শরীরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে লেখানো, দৈনিক আট-দশ লাইন ক'রে ডিক্‌টেট করা, তাও সপ্তাহে দু-তিন দিন বাদ দিয়ে-দিয়ে। কাজেই ডেট-লাইন রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিলো না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে পয়লা বৈশাখের মধ্যে যেমন যতটা তৈরি হয়েছিলো তাই প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম।

প্রুফ শুনতে গিয়ে লক্ষ করলাম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতি র'য়ে গেছে। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর চেয়ে আমার অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন হুমায়ুন কবির—সেকেণ্ড ইয়ার থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। আমাদের বন্ধুত্বের ভাবগত ভিত্তি ছিলো সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং শাস্ত্র-মানা আনুষ্ঠানিক ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রতি প্রবল ও সোচ্চার বিতৃষ্ণা। অক্সফোর্ডে গিয়ে হুমায়ুন ইংরেজি সাহিত্য ছেড়ে প্রধানত দর্শনেরই চর্চা করলো এবং কীর্তিমান হ'য়ে ফিরে এলো। কিন্তু ঠিক জানি না কেন, তার সঙ্গে আমার কোনোদিন বেশিক্ষণ দার্শনিক আলোচনা হয়নি। তার একটি কারণ বোধহয় এই যে, ফিরে এসেই সে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চ'লে গেলো অধ্যাপনার কাজ নিয়ে, রাধাকৃষ্ণণই ডেকে নিলেন তাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যোগ দিলো দর্শণের অধ্যাপকরূপে সম্ভবত ১৯৩৪ সালে। কিন্তু তার অল্পকাল পরেই সে রাজনীতিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো, বোধহয় অনেকটা আবুল কালাম আজাদ ও ফজলুল হকের চুম্বকী ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। কিন্তু তার *Art, Monad and Society* বইখানি যখন প্রকাশিত হ'লো (খুব সম্ভবত চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে) তখন তাকে উঁচুদরের দার্শনিক ব'লে স্বীকার করতেই হ'লো—বলা বাহুল্য, এ-দেশের দার্শনিক পটভূমিকায়। হুমায়ুনের ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বহুবিধ শক্তির সমাবেশ দেশে ও বিদেশে অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছিলো।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও কলেজ জীবন থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সে-বন্ধন অটুট আছে—ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কিন্তু তিরিশ দশকে আমার অভিপ্রায় ছিলো মার্কসবাদী দর্শন ও শ্রেয়োনীতির একটি ছোটোখাটো critique রচনা করা, অর্থাৎ ভালো-মন্দ দুই দিক বিচার ক'রে দেখা। অপরপক্ষে হীরেন ছিলো নিবেদিতপ্রাণ সাম্যবাদী, পার্টির একজন শ্রদ্ধেয় সদস্য। অবশ্য ফাশী-বিরোধী লেখক-সংঘে আমরা দু-জনে মিলিত হয়েছিলাম, কারণ আমার বিশ্বাস ছিলো এবং আছে যে ফাশীবাদের উদ্দেশ্য ও উপায় দুই-ই জঘন্য; কিন্তু সাম্য-

যাদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধেয়, আমার আপত্তি উপায় সম্বন্ধেই – বিশেষত যখন দেখা গেলো যে সে-উপায়ের মধ্যে যে-জবরদস্তি আছে তা দু-চার বছরের ব্যাপার নয়, দু-চার দশকেরও নয়। এই বিষয়ে শ্রদ্ধাভাজন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আমার *Radical Humanist*-এর পাতায় লিখিত বিতর্ক হয়েছিলো 'The Choice' শিরোনাম দিয়ে ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে।

চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি আমি পরিচিত হলাম মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখার সঙ্গে ; ১৯৪৭ সালে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের গৌরব লাভ করলাম। এই বিরাট ব্যক্তির গভীর ছায়া পড়েছে আমার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা-ভাবনায়। তাঁর একটি বাণী আমার মনে সাড়া জাগালো : "A philosophical revolution must precede political and social revolution in this country." ; কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক জড়বাদী দার্শনিক বিপ্লবকে আমার দার্শনিক মন গ্রহণ করতে পারেনি। আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকান্তবাদের দ্বারা সংগঠিত। তাই তো কালিদাস ভট্টাচার্যের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *Alternative standpoints in Philosophy* আমার সাগ্রহ প্রশংসা লাভ করেছিলো ; তাই তো রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-ভাবনার ও -উপলব্ধির অনেকান্তিকতা এবং বিভিন্ন অন্তের মধ্যে টানাপোড়েন তাঁর কাব্যকে অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য দান করে আমার চোখে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীদের মধ্যে দু-জন উজ্জ্বল রত্নের বন্ধুত্ব লাভ করলাম চল্লিশের দশকেই – অম্লান দত্ত ও শিবনারায়ণ রায়। আর-একজন আশ্চর্য গুণবান ব্যক্তির লেখার সঙ্গে পরিচিত হলাম ঐ-সময়ে। তাঁর নাম সচ্চিদানন্দ মূর্তি, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অথচ তাঁর মনটা খুবই আধুনিক, যুক্তিবাদী এবং কতকটা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সান্নিধ্যের ফলে জড়বাদ-ঘেঁষা।

ইতিপূর্বে এক জায়গায় আমি লিখেছি যে পঞ্চাশের দশকে দয়াকৃষ্ণ, প্রতিমা দাশগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন স্বাধীনচিত্ত সত্যসন্ধানী দার্শনিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো। সেটি সংশোধন ক'রে এখানে বলছি যে চল্লিশের দশকেই আমি কয়েকটি উঁচুদরের দার্শনিক মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি যে-সময়কার কথা বিশেষরূপে বলতে চাই – ১৯৩৩/৩৪ সালের – তখন কালিদাস ভট্টাচার্য ব্যতীত আর-কোনো প্রাণবন্ত নবীন দার্শনিকের সন্ধান আমি পাইনি। আমার দুই নিকট বন্ধুকে এই পথের পথিক রূপে পেয়েও পেলাম না – অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

এবার ঋণ-স্বীকারের পালা। গৌরীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার অর্থ নেই, কারণ তার শেষ নেই। আরো দু-চারজন বন্ধু আমাকে নানানভাবে অল্প-বিস্তর সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য আরতি সেন এবং রুচিরা শ্যাম। স্বপন মজুমদারের সযত্ন পরিশ্রমী উৎসাহ না-থাকলে আমার কোনো বই সম্ভবত ঠিকমতো প্রকাশিত হ'তো না ; এ-বই তো হ'তোই না।

বছর দুই আগে কোনো জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের বিশেষ সংখ্যায় 'কেমন ক'রে লেখক হলাম' জানিয়েছিলেন কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক পাতার পর পাতায়। আমি কয়েকটি ছত্রে জানাতে পারি। তিরিশ দশকের 'পরিচয়' এবং ষাট ও সত্তর দশকের 'দেশ' আমাকে লেখক ক'রে তুললো। আমার লেখক-জীবনের শেষপ্রান্ত থেকে এই দুই অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সুহৃদ্ সম্পাদকদ্বয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রী সাগরময় ঘোষকে সহৃদয় কৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি

প্রতীচীর ইতিহাসে মধ্যযুগ ছিলো নিষ্ঠার যুগ। বুদ্ধি তখন হয় অনাদরে পরিত্যক্ত, নয় বাইবেলের নিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠ দৈববাণীর কৃত্রিম সমর্থন ও ভাষ্যরচনের দাসত্বে নিয়োজিত। অন্তরে-বাহিরে তখন স্থবিরতা। এমন সময়ে ইউরোপের জীর্ণ দেহে আবার প্রাণসঞ্চার হ'লো, বহু শতাব্দীর নিদ্রিত মনের অবসাদ কেটে গেলো, বুদ্ধি শৃঙ্খল ভেঙে উর্ধ্বগ হ'লো অনন্ত আকাশপানে। মুক্তবুদ্ধির নির্ভীক অনুপ্রাণনায় ও সপ্তদশ শতকের অপূর্ব জ্যোতিষ্মান প্রতিভা-নক্ষত্রনিচয়ের শুভ সঙ্গমে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রারম্ভ। বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের এই অভিযান অপ্রতিহত বেগে চললো শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হ'য়ে, দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপ্রান্তর অতিক্রম ক'রে, অপ্রত্যাশিত সাফল্যের উত্তুঙ্গ বৈজয়ন্তী বহন ক'রে। অবশেষে উনিশ শতকের শেষার্ধে বৈজ্ঞানিকদের দুর্ধর্ষ আস্ফালনে ধর্মপ্রচারকের দল আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলো, দার্শনিকমণ্ডলীর তন্দ্রালস নয়নেরও চমক ভাঙলো। এই আস্ফালনের আতিশয্য আজ আমাদের কাছে অসঙ্গত ঠেকলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। পদার্থবিজ্ঞান তখন গণিতের কাঠামো পেয়ে এক অদৃষ্টপূর্ব শ্রী ধারণ করেছিলো, বিশেষত ম্যাক্সওয়েল-প্রণীত গোটা চারেক ইকুয়েশন আলোক ও বিদ্যুতের বিপুল ক্ষেত্রদ্বয়কে আপন বশে এনে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিলো,—স্বাভাবিক তখন সেই অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যখন সমস্ত পদার্থবিজ্ঞান অল্পসংখ্যক কয়েকটি প্রত্যয় (concept) ও নীতির দ্বারা সংগ্রথিত ও সংগঠিত হ'য়ে জ্যামিতির মতন এক অখণ্ড ঐক্যরূপে প্রতীয়মান হবে, এবং প্রমাণ ক'রে দেবে যে বিশুদ্ধতম তত্ত্বজ্ঞান ও ফলিতবিজ্ঞান নৈয়ায়িক পৌর্বা-

পর্যের অতি নিবিড় সংযোগে আবদ্ধ। জীববিদ্যা যদিচ তখনও জড় থেকে জীবের উৎপত্তি প্রতিপাদনে সক্ষম হয়নি, তবু নগণ্য কীটাণু থেকে শ্রেষ্ঠগঠন মনুষ্যদেহ পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্নসূত্রের সন্ধান এবং সম্পূর্ণ না-হ'লেও আংশিক প্রমাণ পেয়েছিলো বৈকি। আদমের স্বর্গ-চ্যুতির উপাখ্যানকে তখন আদিম ও অজ্ঞ পূর্বপুরুষদের আত্মশ্লাঘা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'লো, এবং বানরের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন ক'রে মানুষ একাধারে বিবর্তনের গৌরব ও আভিজাত্য হারানোর লাঞ্ছনা অনুভব করলো। মানসবিজ্ঞানের বয়স তখন বেশি নয়, কিন্তু বাল্যসুলভ কুণ্ঠার কোনোই লক্ষণ দেখা গেলো না মনোরাজ্যের অন্ধকার অলিগলিতে তার নিঃসঙ্কোচ পরিভ্রমণে। মানুষের মন হেন অনধিগম্য অপার রহস্যের কক্ষেও ওয়েবর, ফেক্‌নর প্রভৃতি তাঁদের মাপজোকের জারিজুরি নিয়ে হাজির। সন্দেহ রইলো না যে একদিন-না-একদিন এই চিরচঞ্চল চিরপলাতক অসূর্যম্পশ্যটিকে পরীক্ষাবৃত্ত বিজ্ঞানের সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে ভাবীকথনের বশে আনা যাবেই যাবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এই সার্বত্রিক সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু সংগঠনের ফলে উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক মনীষীরা মনে করলেন, এবং যথার্থই মনে করলেন, যে বিজ্ঞান গগনস্পর্শী ও দিগন্তব্যাপী, যে বুদ্ধি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন ও প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনের জন্যে বুদ্ধিই তার ব্রহ্মাস্ত্র।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞান, এ অভ্রভেদী দাবীকে অনেকখানি খাটো করতে বাধ্য হয়েছে। এই শতকের প্রারম্ভেই শক্তিকণা-প্রত্যয়ের পরিগ্রহণ ও আপেক্ষিকতাবাদের প্রবর্তনে ভূতবিদ্যার সারা রাজ্য জুড়ে এমন-একটি যুগান্তকারী অন্তর্বিপ্লব মাথা তুলে উঠেছে যে আজ ব্রহ্মাণ্ড-বিজয়ের মহাপ্রাণ অভীপ্সায় জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া বিজ্ঞান-ধুরন্ধরদের গত্যন্তর নেই। বৈজ্ঞানিক নিয়মের যে অমোঘ জাল ফেলে উনিশ শতক বিশ্বজগৎকে

বাঁধতে চেয়েছিলো, আজ দেখা গেলো সে-জালের আধখানার কোনো অস্তিত্বই নেই, আর বাকী আধখানার গ্রন্থি গেছে খুলে। ফীল্ড্ ফীজিক্স-এর (field-physics) আইনগুলির নিত্যতা ও সার্বত্রিকতা অবিসংবাদিত, কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই যে সেগুলি পুনর্বাদী (tautological), এক ফুট যে বারো ইঞ্চির সমান এ-নিয়মটা সর্বত্র ও সর্বদা অব্যতিক্রান্ত, কিন্তু এতে আমাদের আভিধানিক মর্জি ছাড়া বিশ্বের কোনো গভীরতর রহস্যের উদ্ঘাটন হয় না এবং আপেক্ষিকতাবাদের মূল নিয়মগুলি অনেকটা এই গোছের। পূর্বে আমরা বহির্জগতের নীতি ভেবে যার আবিষ্কারে গর্ববোধ করছিলাম, আজ দেখি সে শুধু আমাদের শব্দ-প্রয়োগের রীতি! পক্ষান্তরে quantum physics-এর নিয়মগুলি প্রকৃতির নিজস্ব রূপ ধরতে পেরেছে ব'লে বোধ হয়, কিন্তু তারা সার্বিক (universal) নয়, সামষ্টিক (statistical) মাত্র। ব্যক্তির ক্ষেত্রে তারা কেবল সম্ভাব্যতা নির্দেশ করতে পারে, নিশ্চিতের সন্ধান দিতে অক্ষম। গড়পড়তা হিসাবেই তাদের কাটতি। পদার্থবিজ্ঞানের অভাবনীয় সাম্প্রতিক উন্নতি আর-একদিক থেকে আপন পদলাঘবের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অতি উৎকৃষ্ট ও অশেষ শক্তিশালী গাণিতিক টেক্নিক্ আজ তার আয়ত্তে, কিন্তু এই টেক্নিকের আওতায় তাকে সাঙ্কেতিকের এমন-এক রঙীন চশমা পরতে হয়েছে যে বৈজ্ঞানিকরা মানতে বাধ্য হলেন বিশ্বপ্রকৃতির অনেকখানি সে-চশমার কাচ ভেদ ক'রে এসে পৌঁছুতে পারে না, ধরা দেয় কেবল গোটাকতক pointer reading। এই pointer reading-গুলিকে সাজিয়েগুজিয়ে এর চারিদিকে একটি সুসমঞ্জস তত্ত্বশৃঙ্খলা রচনা ক'রে বহির্জগতের যে-অসম্পূর্ণ ছবি তাঁরা আঁকতে পারেন তা-ই তাঁদের শক্তির পরাকাষ্ঠা। সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের এই শালীনতার সুযোগ পেয়ে অধ্যাপক এডিংটন অপরোক্ষানুভূতির দাবী এনে খাড়া করেছেন। স্বপক্ষ-সমর্থন যখন সম্ভব হয় না তখন

বিপক্ষ-বিনাশের দিকে সহজেই মন যায়, ন্যায়শাস্ত্র কিন্তু এ-সহজাত প্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষণে অপারগ। বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মারফতে জগতের মাত্র একটা দিক অবধারণে সক্ষম, এ-হেন অকাট্য প্রমাণ-বলেই কি মানতে হবে যে অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা আমরা সমগ্র বিশ্বের পরিপূর্ণ পরিচয় পাবো ? বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের শেষকথা বলতে পারেন না ব'লেই কি যোগী তা পারবেন ? হয়তো পারবেন, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে বৈজ্ঞানিকের অযোগ্যতাতেই যোগীর যোগ্যতা প্রমাণ হয় না। অপরোক্ষানুভূতির তরফে ওকালতি করতে গিয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের বর্তমান সঙ্কটের কথা তোলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক, বৈজ্ঞানিকদের সন্নত স্বীকারোক্তির দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ নিরর্থক। উনিশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চূড়ান্ত আত্মম্ভরিতায় এক বুদ্ধি ছাড়া মানুষের আর-সমস্ত বৃত্তিকে অস্বীকার করেছিলো ব'লেই যে বিশ শতাব্দীর উল্টোরথের দিনে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আস্থা হারিয়ে যৌগিক পদ্ধতিকে বিনা বাক্যে মেনে নেবো এই আদিখ্যেতারই বা কী মানে হয় ?

এডিংটন, প্লাঙ্ক্ ও অন্যান্য বিজ্ঞান-পন্থী তত্ত্বজ্ঞানীরা বুদ্ধির পরিসরকে সংক্ষিপ্ত ক'রে তার দাবীকে সংযত ক'রেই ক্ষান্ত হয়েছেন ; তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার দুঃসাহস দার্শনিকদের মধ্যেই দেখা যায়। বের্গসঁ, ব্র্যাডলি, শঙ্কর প্রভৃতির কাছে অনুভূতিই ব্রহ্মবিদ্যার পথ, নান্য পন্থা। বুদ্ধি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য মোটামুটি তথ্য সংগ্রহ ক'রে কাজ চালিয়ে নিতে পারে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শনের বেলা তার লম্ফঝম্ফ শুধু অক্ষমের আস্ফালন।

বের্গসঁ যদিও দার্শনিকরূপেই সর্বসাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ, প্রকৃত-পক্ষে তাঁর দর্শনচর্চা সাহিত্যসাধনার ছদ্মবেশমাত্র। তাঁর চিন্তা-শক্তির সূক্ষ্মতা ও তথ্যসঞ্চয়ের সমৃদ্ধি অস্বীকার করবার জো নেই, তবুও মনে হয় যেন তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রখর প্রদীপ্তিকেও ছাপিয়ে গেছে সমুজ্জ্বল

কাব্যপ্রতিভা ও উদ্দীপনাপূর্ণ রচনাভঙ্গী। তাই বের্গসঁর লেখা বই হাতে নিলে বিচারবুদ্ধি আড়ষ্ট হ'য়ে যায়, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে সংকোচ বোধ হয়, মনে হয় যেন এখানে সে-সমস্ত অবান্তর, এমন-কি অশ্লীল। তাই যখন পড়ি বিশ্বজগৎ এক অখণ্ড অনাদ্যন্ত প্রাণধারার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, তারই উদ্দাম উতরোল গতির প্রতিহত প্রত্যাবর্তনে বস্তুপিণ্ডের সৃষ্টি, জড়প্রকৃতি প্রাণের উর্ধ্বগামী আতশ-বাজীর দাহ শেষে ফিরে-আসা ভস্মরাশি মাত্র, তখন এমনতরো আষাঢ়ে কল্পনাসমাবেশ সম্বন্ধে হেতু-জিজ্ঞাসা মনের কোণে জেগে ওঠে বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শ আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে মুহূর্তেক বিলম্ব করে না।

জীবজগতের প্রভূত তথ্য ঘেঁটে বের্গসঁ দেখিয়েছেন যে এক অখণ্ড প্রাণপ্রবাহ ত্রিধাবিভক্ত হ'য়ে জড়প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্যে তিনটি বিভিন্ন প্রকরণ উদ্ভাবন করেছে,—উদ্ভিদের অচেতন সংবেদনশীলতা, কীটপতঙ্গের উপজ্ঞা (instinct) ও স্তন্যপায়ী জন্তুর বুদ্ধি। বুদ্ধিও যখন প্রতিকূল পরিবেষ্টনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জীবের দেহরক্ষা ও বংশরক্ষার উপায়মাত্র, সেকালে তার ঘাড়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অতিজান্তব বিলাসিতা চাপানো অসঙ্গত ও অন্যায়। এই অন্যায়ের জন্যেই দর্শনে-বিজ্ঞানে যুগের পর যুগ এতো সমস্যা এতো বিভ্রাট পুঞ্জীকৃত হচ্ছে। বুদ্ধির প্রকৃত ধর্ম জৈবিক ক্রিয়াসম্পাদন, প্রকৃতির রহস্য-উদ্‌ঘাটন তার অধিকার-বহির্ভূত। সেজন্যে একমাত্র সমুপযুক্ত বৃত্তি, বের্গসঁর মতে, ইন্‌টুইশন বা অপরোক্ষানুভূতি। অপরোক্ষানুভূতির সংজ্ঞা একস্থলে দেওয়া হয়েছে "নিঃস্বার্থ ও আত্মচেতন উপজ্ঞা"। এ-সংজ্ঞা অনুসারে তো কীটপতঙ্গের মধ্যেই অপরোক্ষানুভূতির অভিব্যক্তি অধিকতর সম্ভব ও স্বাভাবিক, কারণ তারাই হ'লো উপজ্ঞা-বিশিষ্ট জীব। বের্গসঁ কিন্তু বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানুষকেই এই বৃত্তির অধিকারী ঠাউরেছেন।

ভালো কথা, তবে কিনা বিবর্তনতত্ত্ব অনুসারে কেবল বুদ্ধি নয়, মানুষের (তথা জীবমাত্রের) সবক'টা বৃত্তিই প্রকৃতির নির্বাচনের ফলে উদ্‌ভূত। বুদ্ধি যদি জীবিকা-নির্বাহার্থে উৎপন্ন ব'লে তত্ত্বজ্ঞানে অক্ষম হয় তাহ'লে অপরোক্ষানুভূতিরও তো সেই দশা, তার বেলায় ব্রহ্মবিদ্যা সম্ভব হ'লো কেমন ক'রে? আরও বিচিত্র এই যে বের্গসঁ যে-বিবর্তনবাদের শরণাপন্ন হ'য়ে বুদ্ধিকে গাল পাড়ছেন, বলছেন যে সে উদ্বর্তনের যন্ত্রমাত্র, সে-বিবর্তনবাদও তো সেই বুদ্ধিরই আবিষ্কার,—নিরাসক্ত, নিঃস্বার্থ অনুসন্ধিৎসা-প্রসূত তত্ত্ব, তড়িঘড়ি কাজ চালাবার প্রত্যয়মাত্র নয়। বুদ্ধি যদি তত্ত্বজ্ঞানের আসরে অপাংক্তেয়ই হয় তবে তো বিবর্তনবাদকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করতে হয়, এবং পূর্বোক্ত আপত্তিটা তাহ'লে দাঁড়ায় কিসের জোরে?

বের্গসঁর দ্বিতীয় আপত্তি তাঁর ক্ষণিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে জগৎ-প্রপঞ্চের আপাত-স্থিরতায় নিহিত রয়েছে নিরন্তর নিরবচ্ছেদ পরিবর্তন-ধারা। বুদ্ধি কিন্তু জড়প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহারার্থে গঠিত ব'লে জড়তা-প্রাপ্ত, গতি-বিরহিত, প্রবহমাণ সত্তার পরিচয়-গ্রহণে অপারগ। বৌদ্ধিক জ্ঞানের ভিত্তিই হচ্ছে পুনরাবৃত্তি, অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সন্ধান; অনন্ত নতুনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিধিবদ্ধ পদ্ধতি কোনো কূলকিনারা পায় না। বিজ্ঞান খোঁজে সুপরিচিতকে, পূর্বঘটিতকে, বাদ দেয় যেটা তার বদ্ধ ধারণার বশ্যতা কবুল করতে চায় না। চলমানকে অচল ক'রে বোঝাই বিজ্ঞানের রীতি। কালের প্রত্যয় পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যয়সমূহের মধ্যে অতিশয় গুরুতর, কিন্তু বের্গসঁর বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক কাল সত্যিকার গতিচঞ্চল কালের জ্যামিতিক ছায়ামাত্র। প্রকৃত কালের সর্বপ্রধান বিশেষণ তার একতরফা গতি, ভূত থেকে ভবিষ্যতের দিকে বৈজ্ঞানিকরা কালের এই বৈশিষ্ট্যকে নির্মমভাবে ছেঁটে দিয়েছেন। তাঁদের কালগত বিন্যাস (order) দেশগত বিন্যাসেরই অবিকল প্রতিচ্ছবি, কাজেই

সম্পূর্ণভাবে স্থিতিমূলক ও পরাবর্তনসহ (reversible)। ডাইনে-বাঁয়ের তফাৎ যেমন বিষয়জাত নয়, দর্শক সাপেক্ষ, ভূত-ভবিষ্যতের প্রভেদও তেমনি দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান-পরিকল্পিত কাল এক অনন্ত-প্রসারিত বর্তমান, দর্শকের আপতিক উপস্থিতি যার মধ্যে একটি রেখা দ্বারা ভূত-ভবিষ্যতের বিভাগ স্থাপনা করে। বহির্জগতের ঘটনাপরম্পরায় এমন-কোনো অব্যর্থ চিহ্ন বৈজ্ঞানিকের জানা নেই যাতে ক'রে ঘটিত থেকে ঘটিতব্যকে অভ্রান্তভাবে পৃথক্ করা যেতে পারে।

বিশ্বের সার্বত্রিক অনিত্যতার জ্ঞান যে অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ, এমন দাবী স্বয়ং বের্গসঁও করেননি। অন্তর্দর্শনজাত আত্মজ্ঞানের মধ্যে আমরা স্থিতি বা পুনরাবৃত্তির চিহ্নমাত্র পাই না, এই কথাই তিনি বারংবার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মানুষের মন সর্বক্ষণ প্রবহমাণ ব'লেই যে টেবিল-চেয়ার ইঁট-পাথরও প্রতিমুহূর্তে নতুন থেকে নতুনতর হবে, এমন কী কথা আছে? প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানেও এর সমর্থন পাওয়া যায় না। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সাদা-সাদা মেঘের টুক্‌রো ছুটে চলেছে, তাদের আকৃতিও অবিরাম বদলাচ্ছে, কিন্তু পটভূমিকায় যে ঘননীল আকাশ সে তো নির্বিকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার তো কোনো পরিবর্তন নেই। বের্গসঁ বলবেন, পরিবর্তন সর্বত্রই বিদ্যমান, তবে কোথাও তা আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে ধরা দেয়, কোথাও ঘটে অলক্ষিতে। অলক্ষিতে যে ঘটে তার একমাত্র সাক্ষী সেই অবজ্ঞেয় অগ্রাহ্য বিজ্ঞান। ভূতবিদ্যার বিশ্বাস যে, সামগ্রিকভাবে কোনো বস্তুর পরিবর্তন লক্ষিত হোক্ আর না-ই হোক্, সে যে-কোটি-কোটি ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন-সমাবেশে সংগঠিত সেগুলি সর্বদাই স্পন্দনরত। বৈজ্ঞানিকমতে কিন্তু পরিবর্তনই সর্বেসর্বা নয়, ধ্রুবতার অস্তিত্বও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের স্থান ও গতিমাত্রা সর্বক্ষণ বদলায় কিন্তু তাদের বৈদ্যুতিক চার্জ ও ম্যাস থাকে অক্ষুণ্ণ।

বের্গসঁ অবশ্য কোথাও স্থিতির ক্ষীণতম ছায়াটুকু মানতে রাজী নন। তবে ইলেক্‌ট্রনের ম্যাস সম্বন্ধে কোনো বিশিষ্ট যৌগিক উপলব্ধির অবর্তমানে কেন যে তার নিত্য পরিবর্তনশীলতাকে ধ্রুব ব'লে মেনে নিতে হবে তা বোঝা কঠিন। বিজ্ঞান গতিও মানে, স্থিতিও অস্বীকার করে না এবং দুয়েরই অনুধাবনযোগ্য পদ্ধতি উদ্‌ভাবন করেছে। ক্যালকুলাস্ তো বিশেষভাবে পরিবর্তনেরই ধর্ম নিরূপণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, তার অস্তিত্বের প্রতি দৃক্‌পাত না-ক'রে বের্গসঁ যে সমস্ত বিজ্ঞানকে জ্যামিতির ছায়ামাত্র ঠাউরেছেন, একে নিদারুণ অবিচার ছাড়া আর কী বলা যায়? পদার্থবিজ্ঞানের কালপ্রত্যয়ের অবাস্তবতা সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য নির্ভুল নয়। সত্য বটে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন ডিফরেন্‌শ্যল্ ইকুয়েশন্ দিয়ে কোনো বস্তুর পরিবর্তন বিবৃত করা হয়, তখন তাতে তার ভূত অবস্থা থেকে ভাবী অবস্থা নির্ধারণ করাও তেমনি সহজসাধ্য, অর্থাৎ কাল সেখানে পুরোপুরি পরিবর্তনীয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে এমন-একটি প্রত্যয় রয়েছে যার সাহায্যে ভূত ও ভবিষ্যৎ অমোঘভাবে চিহ্নিত করা যায়। সে-প্রত্যয়টি হ'লো entropy। Entropy-র বিশদ ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে entropy-র তারতম্য শৃঙ্খলার হ্রাসবৃদ্ধি ব্যক্ত করে। Thermodynamics-এর প্রখ্যাত নিয়ম অনুসারে যে-কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার শেষ পরিণাম entropy-র বৃদ্ধি। এই নিয়মের উপর নির্ভর ক'রে বলা যেতে পারে যে, কোনো বস্তুর ভিন্নকালীন দুটো অবস্থার মধ্যে যেটা মোটের উপর অধিকতর বিশৃঙ্খল সেটা পরবর্তী, এবং অন্যটা পূর্ববর্তী। উক্ত বিশৃঙ্খলা ততোটা বাহ্যিক বা আকৃতিগত নয় যতোটা বস্তুর গঠনকারী অণুপরমাণুর স্থানিক ও গতিমাত্রিক বণ্টন দ্বারা নির্মিত।

বের্গসঁর তৃতীয় অভিযোগের লক্ষ্য বৌদ্ধিক জ্ঞানের বাহ্যতা।

বুদ্ধি যতোই তন্নতন্নরূপে পর্যবেক্ষণ করুক জ্ঞেয় বিষয়কে, যতোই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিভিন্ন রূপ নির্ণয় করুক, তবু সে তার মর্মস্থলে প্রবেশ করতে অক্ষম, তার অন্তরতম সত্তার সাক্ষাৎলাভে অপারগ। পক্ষান্তরে, অপরোক্ষানুভূতি অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে যায় বিষয়ের মর্মমাঝে, সমস্ত অন্তরাল অবলুপ্ত ক'রে দেয়, তখন আর ভেদ থাকে না বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর। এই হচ্ছে জ্ঞানের চরম পরিণতি, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র ব্যবধান-বিরহিত সম্মিলন, দ্বৈত-বিলুপ্ত সাযুজ্য। এমনতরো বাক্যচ্ছটার মধ্যে বের্গসঁর আসল বক্তব্যটা বোঝা কঠিন হ'য়ে উঠেছে। গরুর সঙ্গে গাছের সঙ্গে ঐক্যানুভূতিতে বিলীন হ'য়ে যাওয়ার যে কী অর্থ তা অন্তত আমার স্বল্প-পরিসর ধারণার অতীত। শঙ্কর অবশ্য এমন কথা বললেও বলতে পারেন, কেননা তাঁর মতে সব-কিছুর পরমসত্তা হচ্ছে আত্মা। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ঐক্যানুভূতির অর্থ হবে তার নামরূপ-মূলক মিথ্যা জ্ঞানের মায়াবরণ অপসারিত ক'রে তার মধ্যে আপন আত্মাকেই উপলব্ধি করা। বের্গসঁ বিষয়তান্ত্রিক (objectivist), তাঁর পক্ষে কেমন ক'রে ভাবা সম্ভব হ'লো যে অপরোক্ষানুভূতির দ্রাবণে "আমি" "না-আমি"তে বিলীন হ'য়ে যাবে ?

ব্র্যাডলির মতে বৌদ্ধিক পদ্ধতির মূলেই এমন অনিবার্য গলদ রয়েছে যার অভিসম্পাতে সমস্ত বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞান দিক্‌ভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। বৌদ্ধিক জ্ঞান সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার সন্নিপাতে সংগঠিত ; এবং সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধ-ব্যতীত সম্ভব নয়। আমাদের চিন্তামাত্রই অগ্রসর হয় সম্বন্ধের সূত্র ধ'রে। সে-সূত্র দিয়ে বুদ্ধি দুই বা ততোধিক বিষয়কে সংহত করে একটি সমগ্রতায়, অথবা একটি সমগ্রকে বিভিন্ন অঙ্গে পরিণত ক'রেও তাদের প্রাক্তন সংযোগ রক্ষা করে। ব্রাডলি বুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক তর্কের দ্বারা প্রমাণ ক'রে যে সম্বন্ধ-প্রত্যয় আগাগোড়া

অবোধ্য ও স্বতোবিরুদ্ধ। "মুখের উপরে ঘোমটা রয়েছে"—এই তথ্যজ্ঞানের কথাই ধরা যাক। তথ্যটাকে বিশ্লেষণ করা গেলো "মুখ" ও "ঘোমটা" এই অঙ্গদ্বয়ে, এবং তাদের সংযোগ-সূত্র হ'লো "উপরত্ব" সম্বন্ধ, "রয়েছে" ক্রিয়াপদ যার অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করছে। সম্বন্ধ বিশ্লেষণের ফলে আমরা পেলাম মোটের উপর তিনখানা অঙ্গ—মুখ, ঘোমটা আর উপরত্ব। এদের মধ্যে সংযোগ-সূত্র কী? উপরত্ব দ্বারা মুখ ও ঘোমটাকে পরস্পর-যুক্ত করতে হ'লে প্রথমে উপরত্বের সঙ্গে মুখের এবং ঘোমটার যোগসাধন আবশ্যক। উক্ত তথ্যের সঙ্গে এই তিনখানা অঙ্গের সমীকরণ করা যায় না, কারণ এরা হ'লো বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত খণ্ড-সমগ্রতা। অথচ সম্বন্ধ-নিষ্ঠ বুদ্ধি যখনই তাকে বুঝতে চায় তখনই এই বিচ্ছিন্ন অঙ্গসমূহে তাকে বিশ্লেষণ করতে সে বাধ্য। এমন বিভ্রাটে প'ড়ে বুদ্ধি বিশ্লিষ্ট অঙ্গগুলির বিচ্ছিন্নতা ঘোচাবার জন্যে তাদের সংযুক্ত ক'রে দুটি নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করে। অর্থাৎ উপরত্বের একদিকে মুখের সঙ্গে এবং অপরদিকে ঘোমটার সঙ্গে দুটো অতিরিক্ত সম্বন্ধ ক ও খ আরোপিত হয়। গলদ কিন্তু এখনো মিটতে চায় না যেহেতু পূর্বে মুখ, ঘোমটা ও উপরত্ব নিয়ে ঐক্য-রচনার যে-সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিলো, এখন মুখ, উপরত্ব ও ক, এবং ঘোমটা, উপরত্ব ও খ নিয়ে অবিকল সেই সমস্যা আবির্ভূত হয়। এর নিষ্পত্তি করতে গিয়ে মুখ ও ক-এর মাঝখানে আরেকটা সম্বন্ধ ঘ বসিয়ে কোনো লাভ নেই, সমস্যাটা নাছোড়বান্দা হ'য়ে মাথা তুলেই থাকবে। সম্বন্ধের এই গরমিল নির্দেশ ক'রে ব্রাডলি দেখিয়েছেন যে বুদ্ধির জ্ঞানার্জনকারী আর যতোগুলি প্রত্যয় আছে (যথা দেশ, কাল, কার্যকারণ ইত্যাদি) তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে সম্বন্ধ-প্রত্যয় নিহিত রয়েছে। কাজেকাজেই সম্বন্ধের আদিরোগ তাদের মধ্যেও সংক্রামিত। বুদ্ধির সবক'টা মৌল প্রত্যয় যদি এমনতরো বিপর্যস্ত ও অবোধ্য হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে সত্তাবোধের আশা তার পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

ব্র্যাডলির এই প্রলয়ঙ্কর ন্যায়ের মূলে দেখা যায় শব্দ ও শব্দার্থের গোলযোগ। সমস্ত বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি সম্বন্ধকেও সম্বন্ধীর মতো স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী পদারোপণে। মুখ, ঘোমটা ও উপরত্ব এই তিনটে স্বতন্ত্র শব্দ রয়েছে ব'লেই যে তিনখানা প্রত্যয়কেও বিচ্ছিন্ন হ'তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। প্রকৃতপক্ষে উপরত্ব শব্দটাই বিচ্ছিন্ন, উপরত্ব প্রত্যয় আগাগোড়াই সম্বন্ধীদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, সম্বন্ধের ধর্মই তা-ই, শূন্যে দোদুল্যমান হ'য়ে সে থাকতে পারে না। কাজেই তাকে মুখ ও ঘোমটার সঙ্গে আবার নতুন ক'রে যোগ করবার জন্যে দুটো অতিরিক্ত সম্বন্ধ উদ্‌ভাবনের কোনো প্রয়োজন নেই। চিন্তার সঙ্গে ভাষার আনুরূপ্য অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু ভাষা চিন্তার বাহকমাত্র, তার হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। বাক্য যেখানে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন শব্দসমষ্টিতে বিভক্ত, সেখানে বাক্যার্থও পরস্পরযোগশূন্য খণ্ডসমূহের কৃত্রিম সন্নিপাতে গঠিত, এমন অনুমানের কোনো ভিত্তি নেই।

ইন্‌ট্যুইশন-পন্থীরা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকে একদেশদর্শী, আংশিক ও অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে থাকেন। পক্ষান্তরে, তাঁদের বিশ্বাস, অপরোক্ষানুভূতি সম্যক্ ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ, অনুভূত বিষয়ের কোনো পক্ষই তার সর্বগ্রাহী দৃষ্টি এড়ায় না, বৌদ্ধিক জ্ঞান তার অন্তর্ভুক্ত অঙ্গমাত্র। অপরোক্ষানুভূতির মহিমা কীর্তনে যাঁরা পঞ্চমুখ, বাক্যের বহর ছেড়ে পরীক্ষার আসরে নামতে তাঁদের এতো কুণ্ঠা কেন? যদি কতকগুলো অজ্ঞাত দ্রব্যের সংমিশ্রিত গুঁড়ো দেখামাত্র অনুভবজাত সম্যক্-দর্শনের ফলে তাঁরা ব'লে দিতে পারেন এদের বুনসেন-শিখায় বিকীর্ণ বনচ্ছটার প্রত্যেকটি রেখার সঠিক তরঙ্গান্তর-পরিমাপ কী-কী তা হ'লে তাঁদের উত্তুঙ্গ দাবী সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন অন্তত বৈজ্ঞানিক-মহলে অবশ্যম্ভাবী। অধ্যাপক রাধা-কৃষ্ণণ যোগজ প্রত্যক্ষের সঙ্গে কাব্যানুভূতির তুলনা করেছেন এবং কাব্যানুভূতির মধ্যেও সম্যক্-জ্ঞানের উপস্থিতি কল্পনা করেছেন। কবি

যখন কোনো বিষয়ের অভিঘাতে তন্ময় হ'য়ে যায় তখন সে শুধু তার বাহ্য রূপ নয়, তার অন্তরতম পরিপূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই পরিপূর্ণ সত্তার মধ্যে তার বিজ্ঞান-লভ্য সত্তাও নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত, নচেৎ তাকে পরিপূর্ণ বলার কোনো অর্থ হয় না। আমি কবি নই, কিন্তু শারদ-সন্ধ্যার ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে ইন্দ্রধনুর আবির্ভাবে যে কালেভদ্রে কাব্যানুভূতির উদয় হয়নি, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবুও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে অনুভূতির উদ্বেলতায় সেই ধনুগঠনকারী জলবিন্দুর ব্যাস-দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে স্থূলতম ধারণাও আমার ভোঁতা মনে কোনোকালে জাগেনি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রকৃত কবির কাছেই উপরি-উক্ত সম্যক্-জ্ঞান আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। প্রত্যাশা করতে পারি তিনি যখন ভূমার সঙ্গে অভেদাত্মা হ'য়ে অনুভব করেছিলেন :

নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইসারা তারি লাগিত মোর প্রাণে
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা।

তখন সে কম্পন-মর্ম্মরধ্বনির তরঙ্গান্তর-পরিমাপও নির্ভুলভাবে তাঁর দিব্য-জ্ঞানপটে প্রতিভাত হয়েছিলো।

অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য যে একান্ত ব্যক্তিগত, তার অসীম ঐশ্বর্যের ভার বহন করা যে ক্ষীণবল মানুষী ভাষার সাধ্যাতীত,—এ-ধরনের কথা অতীন্দ্রিয়বাদীরা চিরকাল ব'লে এসেছেন। অথচ কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্যে, মরমী সাহিত্যের পরিমাণ অন্য-কোনো সাহিত্যের তুলনায় হেয় নয়। আসলে কথা বলতে তাঁরাও কিছু কসুর করেন না, তবে গরমিল যখন অনিবার্য, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের অসঙ্গতি যখন সুপ্রত্যক্ষ, অর্থ যখন বিলুপ্তপ্রায়,—তখনই তাঁরা বচনাতীতের বর্ম ধারণ করেন আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায়। শত্রুপক্ষ

অন্তত এমন সন্দেহ না-ক'রে পারে না। অনির্বচনীয়তার মন্ত্রবলে ইতরজনের মুখ বন্ধ করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু বচনাতীত সত্য আদৌ সত্যের দাবী করতে পারে কিনা সে-কথাও ভেবে দেখা দরকার। সত্যের সংজ্ঞাবধারণ নিয়ে তত্ত্বদর্শনে বিস্তর ও জটিল তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিভাষা-বর্জিত আলোচনা যদি-বা সম্ভব হয়, এখানে তার স্থানাভাব। মোটামুটি যদি বলা যায় যে যে-বাক্যার্থ পূর্ব-সঞ্চিত জ্ঞান ও প্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য-রক্ষায় সমর্থ তা-ই সত্য হিসাবে গ্রহণীয়, তাহ'লে বেশিরভাগ লোকের আপত্তি হবে না বোধহয়। এ-সংজ্ঞার উপর কিন্তু অপরোক্ষানুভূতির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। যা অস্পষ্ট, ভাষায় অপ্রকাশ্য, সাধারণের অনধিগম্য, সর্বজনীন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সামঞ্জস্যের কথাই উঠতে পারে না। সত্যের প্রতিমাণ যদি সঙ্গতিই হয় তাহ'লে যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তাকে সম্পূর্ণ অলীক বলা ছাড়া উপায় নেই। তার পরিগ্রহণ একমাত্র অন্ধবিশ্বাসের জোরেই সম্ভব। এই আশঙ্কার তাড়নেই বোধহয় সম্প্রতি দু-জন ভারতবর্ষীয় অতীন্দ্রিয়বাদী, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ ও ডঃ ইক্‌বাল, অনির্বচনীয়তার অতিমর্ত্য মহিমা প্রত্যাখ্যান ক'রে অনুভূতির সঙ্গে বুদ্ধির সমন্বয়-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে তাঁরা বড়ো-একটা আমলে আনেননি, তার দৃষ্টিকে সাঙ্কেতিকতাবৃত ও বহুধাবিভক্ত ব'লে অবজ্ঞা করেছেন। দর্শন ও দর্শন-ঘেঁষা বিজ্ঞানের সঙ্গেই তাঁদের যতো বোঝাপড়ার আগ্রহ। রাধাকৃষ্ণণ ব্র্যাডলি-ঘেঁষা শঙ্কর-মতবাদকে দর্শনের চূড়ান্ত জ্ঞান করেন, এবং ইক্‌বাল বরমাল্য দান করেছেন হেগেলীয়ভাবে ব্যাখ্যাত বের্গসঁ-মতবাদকে। পক্ষপাতের এ-দ্বৈধ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বরূপ কালের সঙ্গে সভ্যতার গতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল তো বটেই, বিপদ এই যে কোনোকালেও তার সিদ্ধান্ত নির্দ্বন্দ্ব নয়, তার প্রতিষ্ঠাভূমিও সর্ববাদিসম্মত নয়। জ্ঞানমার্গের সঙ্গে

সমন্বয়সূত্র-যোগে যে আপন সত্যতা স্থাপনে ইচ্ছুক, বাদ-বিসংবাদের মধ্যে কালপ্রবাহের অনিত্যতার মধ্যে ঝাঁপ তাকে দিতেই হবে। অপরোক্ষানুভূতি কিন্তু দাবী করে ঐশিক অভ্রান্তি, সর্ব দেশ-কাল-নিরপেক্ষতা, স্বতঃসিদ্ধির নির্ব্যূঢ়তা। বুদ্ধি-লব্ধ সত্য তৎকালীন ও মাত্রাবিশিষ্ট, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনের উপর অনুভূতিলব্ধ সনাতন চরম সত্যের ভিত্তি-স্থাপনা হচ্ছে সৈকতভূমির বালুকারাশির উপর দুর্গ-রচনা।

১৩৪১

সুন্দর ও বাস্তব

সুন্দর কথাটা এখানে সেই উন্নীত অর্থে ব্যবহার করা হবে যে-অর্থে বেটোফেনের নবম সিম্‌ফনি সুন্দর, রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ-গামী বলাকা সুন্দর, আশ্বিনের বৃষ্টিরিক্ত মেঘের উপর সূর্যাস্তের অন্তিম বর্ণচ্ছটা সুন্দর। এই অর্থ করার পক্ষে সাহিত্যিক প্রচলন ও আভিধানিক গবেষণায় কতোখানি সমর্থন পাওয়া যাবে সে-প্রশ্ন আপাতত অনাবশ্যক। মণিমুক্তা-খচিত সুগঠিত অলঙ্কারের সৌন্দর্যে যখন চমক লাগে, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রক্লান্ত সন্ধ্যার গুমোট ভেঙে স্নিগ্ধ দখিন হাওয়া বইলে যখন বলি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে, ধ্যানচাঁদের স্টিক চালানোর নিখুঁত কৌশলে মুগ্ধ হ'য়ে যখন ব'লে উঠি কী সুন্দর,—তখন সুন্দরের সঙ্গে প্রীতিকর ও তুষ্টিকরের অযথা গোলপাকানো হয়। সুন্দর যে সে প্রীতিকর হ'তেও পারে, কিন্তু প্রীতিকরতা তার মর্মকথা নয়, অপরিহার্য অঙ্গও নয়। 'ম্যাক্‌বেথ'কে প্রীতিকর বলা শক্ত হবে, যদিও সৌন্দর্যের দাবী তার অবিসংবাদিত। অবশ্য সৌন্দর্য-উপলব্ধি মাত্রই আনন্দময়; সে-আনন্দের স্ফুরণ কিন্তু চিত্তের ঊর্ধ্বতম অন্তরীক্ষে, সন্দেশভক্ষণজাত প্রীতির সমপর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না।

তত্ত্বান্বেষী মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে, সৌন্দর্যের অবস্থিতি কোথায়, সে কি দৃশ্যবস্তুর ধর্ম, না দ্রষ্টার মনোগত প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রাচীনেরা যতো সহজে যতো নির্ভয়ে এই সমস্যার নিরাকরণে এগুতেন, দর্শনের বর্তমান জটিলতায়,—বাস্তব ও অবাস্তব, সত্য ও অসত্য, প্রত্যক্ষ ও কল্পনার সীমারেখা নিয়ে যখন বাদ-প্রতিবাদের অন্ত নেই,—আমরা স্বভাবতই তাতে বঞ্চিত। যাঁরা বলতেন সৌন্দর্য বস্তুগত, আমাদের দেখা-না-দেখার উপর নির্ভর করে না, তাঁদের প্রমাণের ভিত্তি ছিলো

সুন্দর বস্তুর কোনো একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব গুণের সঙ্গে তার সৌন্দর্যের সমীকরণ। প্রতিসাম্য অর্থাৎ symmetry গুণটাই বিশেষ-রূপে তাঁদের চোখে পড়েছিলো। ঐ-শব্দের একটা সুবিদিত সংজ্ঞা গণিতশাস্ত্রে দেওয়া হ'য়ে থাকে, সে-সংজ্ঞা অনুসারে অল্পবিস্তর প্রতিসাম্য শতদল পদ্মে কিংবা তাজমহলে পরিলক্ষিত হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু গহন অরণ্যকে, নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রির তারকা-খচিত ছায়াপথ-প্রজ্বলিত আকাশকে, অথবা মানবজীবনেরই মতো প্রকাশ-বৈচিত্র্যবান 'ফর্সাইট সাগা'কে প্রাতিসাম্যিক বলতে গেলে ঐ নিরীহ শব্দের উপর বড়ো বেশি অত্যাচার করা হয়। তাছাড়া সৌন্দর্য আর প্রতিসাম্য যদি সমার্থবাচক হয় তাহ'লে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি সযত্ন-অঙ্কিত নিখুঁত বৃত্তের মূল্য মোনালিসার ছবির চেয়ে বহু-গুণে বেশি। প্লটাইনস্ বস্তুর সারল্যের মধ্যে তার সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, বর্ক্ আয়তনের স্বল্পতায়।

পক্ষান্তরে যাঁরা সৌন্দর্যের অবস্থিতি দ্রষ্টার মনের মধ্যে নির্দেশ করতেন, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের সম্বল ছিলো একটি অব্যর্থ যুক্তি। সৌন্দর্য যদি বস্তুরই ধর্ম হয় তাহ'লে সুন্দরের বিচারে এমন অসীম বৈষম্য দেখা যায় কেন। যে-তাজমহলের শুভ্র সমুজ্জ্বল মূর্তি রবীন্দ্র-নাথের কবি-প্রতিভাকে উদ্‌ভাসিত ক'রে দিয়েছিলো অল্‌ডস হক্সলির বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তা স্থাপত্যশিল্পের অজস্র দোষে দুষ্ট। টেল্‌স্টয় শেক্স-পীয়রের বিপুল বিধাতৃতুল্য সৃষ্টির কোনোই মূল্য দিতে প্রস্তুত নন। চৈনিক বা রাজপুত দ্বিরায়তনিক চিত্রের সমাদর বিশেষজ্ঞের কাছে কম নয়, কিন্তু আমরা ক'জন তাতে রস পাই! বিচারের বৈপরীত্য প্রমাণ করছে যে, তাজমহল স্বয়ং সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়; রবীন্দ্রনাথের মনে ঐ-বস্তুর সাক্ষাতে যে-অনুভূতি জাগে সৌন্দর্য তার ধর্ম, এবং হক্সলির মনে যে-ভাবের উদ্রেক হয় তাকেই অসুন্দর বলা সমীচীন। তাজমহল একই কালে সুন্দর এবং অসুন্দর হ'তে পারে না, কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি যদি সুন্দর হয় এবং হক্সলির অনুভূতি অসুন্দর—তাতে কোনো নৈয়ায়িক বিসংবাদ নেই।

এ-যুক্তির প্রামাণ্যতায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা হয়তো ভেবে দেখেননি যে, এর সার্থকতা সৌন্দর্যগুণেই নিঃশেষ হ'য়ে যায় না, এর সাহায্যে বস্তুর সমস্ত গুণকে নির্বিশেষে মনোগত ব'লে প্রমাণ ক'রে দেওয়া যায়। ম্যালেরিয়াজ্বরাক্রান্ত রোগী যখন শীতে কাঁপছে তখন হয়তো আপনি পাশে ব'সে ঘেমে অস্থির হচ্ছেন। অতএব কক্ষস্থ বায়ুমণ্ডল শীতলও নয় উষ্ণও নয়, ও-দুটো বিশেষণ আপনাদের বিভিন্ন অনুভূতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে লক্ বস্তুর গুণসমূহকে দুই পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রথম পর্যায়ের গুণ হ'লো আকৃতি, অভেদ্যতা প্রভৃতি, বস্তুর নিজস্ব ও নিরপেক্ষ ধর্ম। দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণ হ'লো বর্ণ গন্ধ উষ্ণতা ইত্যাদি, এদের উৎপত্তি বিষয় ও বিষয়ীর সংঘাতে, অবস্থিতি প্রত্যক্ষকারীর চৈতন্যে। বস্তু অর্থাৎ দ্রব্য নামক এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত প্রথম পর্যায়ের গুণসমষ্টি, দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণের অনুভূতি প্রত্যক্ষীর মনে উদ্রেক করতে পারে মাত্র, তাদের সঙ্গে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠতর কোনো সম্বন্ধ নেই তার। পদার্থবিদ্যা তার অধুনাতন ভীতিপ্রদ গাণিতিক ঊর্ণাজালে জড়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত মোটামুটি এই মতেরই সমর্থন ক'রে এসেছে। এ-যুক্তিধারার অব্যর্থ নৈয়ায়িক পর্যবসান যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদে, বর্কলীকে সে-সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। একটি পয়সাকে সামনে থেকে দেখলে বৃত্তাকার দেখায়, পাশ থেকে বৃত্তাভাসিক, দূর থেকে বিন্দুবৎ। এর মধ্যে বৃত্তটাকে পয়সার নিজস্ব ধর্ম এবং অন্যগুলোকে মনোগত বলা অন্যায় পক্ষপাত। নৈয়ায়িক সঙ্গতির দাবি মানলে স্বীকার করতে হবে যে, আকৃতিও মনোগত, প্রত্যক্ষকারীর বেদনামাত্র। তেমনি অভেদ্যতাও আমাদের ত্বাচ ও গতিবেদনী (kinaesthetic) প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। যে-যুক্তিপ্রয়োগে লক্

দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণগুলিকে মনোগত প্রমাণ করেছিলেন, অবিকল সেই যুক্তিই প্রথম পর্যায়ের বেলাতেও কার্যকর। সুতরাং বস্তুর নিজস্ব কোনো গুণ আর অবশিষ্ট থাকে না, সমস্তই প্রত্যক্ষীর চৈতন্যভুক্ত হ'য়ে পড়ে; এবং এ-অবস্থায় নির্গুণ, কাজেকাজেই সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাস ধার্মিক-সুলভ গোঁড়ামি। এরপরে স্বপ্নে কল্পনায় প্রতিভাসে ও প্রত্যক্ষে তফাৎ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, এর সবগুলিই এখন সমানভাবে মনোগত। এই অপ্রত্যাশিত ও অসহ্য সিদ্ধান্তে দর্শন-শাস্ত্রে একটা সাড়া প'ড়ে গেলো, কাণ্ট্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত অনেক ছোটো-বড়ো দার্শনিককে এর খণ্ডনের চেষ্টায় প্রাণপাত করতে হয়েছে। উপরি-উক্ত মতগ্রহণে জ্ঞানতান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক উভয় দলই সমান পরাঙ্মুখ হ'লেও, জ্ঞানতান্ত্রিক সে-সমস্যার পাশ কাটিয়ে চলতেই অভ্যস্ত। গুণের প্রতীয়মাণ বৈষম্যের সঙ্গে তার জ্ঞান-নিরপেক্ষতার সামঞ্জস্য-বিধানে অধুনাতন বস্তুতান্ত্রিকদের গবেষণা সর্ববাদিস্বীকৃত না-হ'লেও প্রণিধানযোগ্য। তাঁরাও কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের গুণ অর্থাৎ সৌন্দর্য শ্রেয়তা ও সত্যের অবস্থিতি-নির্ণয় নিয়ে দিশেহারা হয়েছেন। সে যা-ই হোক্‌, এ-সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে যে-কথাটা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সেটা এই যে, কোনো ক্ষেত্রে দ্রষ্টার বিচারের বৈষম্য বিচার্য বিষয়ের মনোগত হবার অকাট্য প্রমাণ—এ-কথা মতবাদ নির্বিশেষে কোনো দার্শনিকই আজ মানতে প্রস্তুত নন।

সৌন্দর্যানুভূতির যে-লক্ষণটা সবচাইতে সুবিদিত ও অপ্রতর্কিত সে হচ্ছে তার তন্ময়তা। সুন্দরের ধ্যানে অপরাপর সকল বিষয়ের অবগতি হ'তে মন আকুঞ্চিত হ'য়ে নিবিড় একাগ্রতায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় তার মধ্যে, আমাদের চিত্তপটভূমিতে তারই চিত্র অপ্রতিহত একাধি-পত্যে বিরাজ করে, অন্য-সমস্ত তুলির আঁচড় মিলিয়ে যায় অচৈতন্যের ঘনান্ধকারে। একাধিপত্য কিন্তু বাস্তবতার পরিপন্থী; কারণ কাণ্টের দোহাই না-পেড়েও আজ আমরা নির্বিবাদে বলতে পারি যে, কোনো

বস্তুর বাস্তবতার মানেই হচ্ছে অপরাপর সকল বস্তুর সঙ্গে তাকে কতকগুলো নিত্য ও সার্বভৌম নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা। এই নিয়ম-সূত্রগ্রন্থনে যে-বস্তু বাধা দেয়, যার ব্যবহারে ব্যত্যয় ঘটে তাকেই আমরা বলি অলীক, অধ্যাস, অবাস্তব। যেমন রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম। সে-সর্প আপন জৈবধর্ম পালন করে না, কাছে গেলে ফণা উদ্যত ক'রে ছোব্‌লাতে আসে না, তাড়া করলে বঙ্কিম গতিতে পালায় না,—কাজেই তাকে আমরা বলি অবাস্তব। সুন্দর বস্তু আপনার অস্তিত্বের নিবিড়তায় সমগ্র চৈতন্যকে এমনভাবে আপ্লুত ক'রে দেয় যে, সেখানে আর কোনো-কিছুর অবকাশমাত্র থাকে না। সুতরাং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ-বন্ধনের কথাই ওঠে না। বাস্তব তাকে বলতে পারি না যেহেতু বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ-তন্তুজাল বুনে আমরা যে বাস্তবজগৎ রচনা করেছি সেখানে তার স্থান নেই। অবাস্তবও তাকে বলা চলে না, কারণ অবাস্তবতার মানেই নিয়মকে লঙ্ঘন করা, সম্বন্ধকে অস্বীকার করা; সম্বন্ধ যেখানে আরোপিত হয়নি অবাস্তবতা সেখানে অর্থহীন। অতএব সুন্দর-যে সে বাস্তব-অবাস্তব-বহির্ভূত, বাস্তবতা-অসম্পৃক্ত, দর্শনের পরিভাষায় সদসৎ-অবিলক্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক্ গোলাপ ফুলের কথা। সাধারণ দৃষ্টিতে যখন তাকে দেখি তখন সে পুষ্পপাত্রে সুবিন্যস্ত, গৃহসজ্জার অঙ্গ, চিত্ত-বিনোদনের উপাদান। অথবা সে উদ্যান-বৃক্ষে বৃন্ত-সংলগ্ন, সজীব; মাটি থেকে আহরণ করছে খাদ্য, সূর্যালোক থেকে সঞ্চয় করছে শক্তি। সেই পুষ্পটি যখন সৌন্দর্যধ্যানে প্রস্ফুটিত হয় তখন বাইরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ গেছে ঘুচে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তখন তাকে বাস্তব বলবো কোন অধিকারে? এমন মনে করলে অন্যায় হবে যে, গোলাপ ফুলের বর্ণ গন্ধ ওজন আকৃতি বাস্তব, শুধু তার সৌন্দর্য নামধারী অলৌকিক গুণটাই বাস্তবতা-অসম্পৃক্ত। ব্যবহারিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গোলাপের বাস্তবতা নিঃসন্দেহ, কিন্তু রূপদ্রষ্টার ধ্যানদৃষ্টিতে সমগ্র ফুলটাই বাস্তবসত্তার বৃন্তচ্যুত হ'য়ে খ'সে

পড়ে কল্পনার শূন্যমার্গে। সুন্দরের এই বন্ধন-মুক্তি ও অন্তরীক্ষ-প্রয়াণ সাধনা ব্যতীত সম্ভব নয়। আমাদের চিত্ত আপন সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নে সব-কিছুকে কোনো-না-কোনো উপায়ে বাস্তবের জালে ফেলতে সর্বদা তৎপর। সে-প্রবৃত্তিনিরোধ ও নিরালম্ব ধ্যানে সক্ষম-যে তাকেই বলা যায় রূপদক্ষ। আরো অধিক ক্ষমতা চাই শিল্পীর, যে এই তপস্যালভ্য দৃষ্টিকে অভিব্যক্ত করতে পারে এমন শব্দ-বিন্যাসে বা বর্ণ-সংস্থানে যার মারফতে রূপদক্ষতা-বঞ্চিত সাধারণ মানুষও সুন্দরের ত্রিদিব-সীমানাতে অনায়াসে উপনীত হয়।

সুন্দরকে নিরালম্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলার মানে এ নয় যে তার সঙ্গে জীবনের ইতিহাসের সভ্যতার ক্রমবিবর্তনধারার কোনো যোগাযোগ নেই। সৌন্দর্য, তা সে প্রাকৃতই হোক্ আর শিল্পপ্রসূতই হোক্, মানব-মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে বাধ্য, তাতে জীবনের চিত্রল ছায়া পড়বেই। এ-যুগের শিল্পীদের চিত্রকল্প (imagery) ও মানসপ্রতীক বিশ্লেষণ ক'রে ফ্রয়েড তাতে অবলুপ্ত মিসরী সভ্যতার আভাস পেয়েছেন—সে-কথার উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞানত অজ্ঞানত বর্তমান ও অতীত সমাজ-পরিবেষ্টনীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এ-সত্যের গুরুত্ব অতি বড়ো মূর্খও অস্বীকার করবে না, কিন্তু এ-কথা ভুললেও অন্যায় হবে যে, এই পরম সত্যটির অবগতি আমাদের শিল্প-সমালোচনী এবং ইতিহাস-সন্ধানী দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই আবদ্ধ। যখন আমরা একাগ্র স্তিমিত চিত্তে সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন, তখন জীবনের সমাজের বহিঃসংসারের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তখন সেই সুন্দরের ধ্যানলব্ধ মূর্তিতে অন্তর্লীন হ'য়ে তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত সত্তাগৌরবে গরীয়ান ক'রে তোলে। বাস্তব তথ্যের আছে বহিঃসঙ্গতির বিস্তৃত জাল, বাস্তব-সম্পর্কবিহীন সুন্দরের আছে অন্তঃসঙ্গতির বিপুল ঐশ্বর্য। এই অন্তঃসঙ্গতিকে এলেক্জ্যাণ্ডার সুন্দরের কেবল কল্পনামূর্তি নয়, তার যে

প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব ভিত্তি, তারও বৈশিষ্ট্য জ্ঞান করেন। কিন্তু রূপ-দ্রষ্টার সৌন্দর্য-স্বপ্নপ্রয়াণের যে-পাথুরে ভূমিতে যাত্রারম্ভ, তার কি কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে, কিংবা থাকবার প্রয়োজন আছে? সে হ'তে পারে ফুল, পাখি, নারিকেলকুঞ্জের ছায়া, আড়-চোখের বাঁকা চাউনি, নির্বোধ শিশুর অহৈতুক কান্না। এই অতি সাধারণ অকিঞ্চিৎকর বাস্তবের টুক্‌রোকে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থিত ক'রে, সমগ্র জীবনের সমস্ত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় তাকে সমৃদ্ধ ক'রে যে-তপস্যা-লভ্য ধ্যানগম্য মূর্তি গঠন করা হয়, তার মধ্যেই আমরা পাই ঐক্য, সঙ্গতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নিগ্ধ সমাবেশ।—প্রশ্ন উঠতে পারে, মৃণাল-বাহু সম্বন্ধে গানের কাব্যের চিত্রের ইয়ত্তা নেই, কিন্তু ড্রেন-পাইপ শিল্পী-মাত্রেরই অবজ্ঞাভাজন—এর হেতু কী? এর হেতু মৃণাল-বাহু ও ড্রেন-পাইপের কোনো বস্তুগত পার্থক্যে খুঁজলে চলবে না। এর জন্য দায়ী আমাদের সুকুমার কলাপদ্ধতির যুগযুগান্তর-ব্যাপী প্রথা। বংশানুক্রমে আমরা প্রীতিকরের মর্মরবেদীতে সুন্দরের উপাসনা ক'রে এসেছি। অপ্রীতিকরের মধ্যে রূপসাধনা বিংশ শতাব্দীর নবধর্ম। এ-ধর্মের ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠুক, এর প্রভাব শোণিতে প্রবেশ করুক, এর মন্ত্র ধ্বনিত হোক্ দেশে-দেশান্তরে,—তখন যাচাই করবার সময় আসবে ড্রেন-পাইপ আর ডাঁটাচচ্চড়ি কাব্যের বর্ণাশ্রমে সত্যিই অস্পৃশ্য কিনা।

এতোক্ষণ সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য ও অনন্যযোগিতার কথাই বলা হ'লো। কিন্তু তার স্বাতিক্রমণের (self-transcendence) যে একটা দিক আছে সে-কথাও আলোচনার যোগ্য। সত্য বটে, তার কল্পনা-দৃষ্টির অখণ্ডতায় বহির্জগতের যাবতীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তুসমারোহ অবলুপ্ত; কিন্তু দ্রষ্টা স্বয়ং তখন অবলুপ্তও নয়, সুন্দরের ব্যক্তিস্বরূপে বিলীনও নয়। বরং সেই মুহূর্তেই সে আপনার গভীরতম সত্তার নাগাল পায়। বলা যেতে পারে যে, সুন্দরের অভিজ্ঞতায় বিষয় ও বিষয়ীর সমস্ত বিভেদ সমস্ত ব্যবধান ঘুচে যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের

সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন ঘটে, সেই সম্মিলনের ফলে এমন এক অভিনব অখণ্ড সত্তা জন্মলাভ করে যার মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের খণ্ডিত অস্তিত্বের পরম পর্যবসান। এলেক্‌জ্যাণ্ডার মনে করেন যে, সৌন্দর্যের অবস্থিতি বস্তুতেও নয় মনেও নয়, তাদের এই সম্মিলিত সত্তাই সুন্দর উপাধির প্রকৃত অধিকারী। ক্রোচের সৌন্দর্যতত্ত্বের মর্মকথা, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির অভিন্নতাতেও এই সম্মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। অভিব্যক্তির অর্থ তাঁর লেখায় যে খুব পরিস্ফুট হয়েছে তা বলা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে অভিব্যক্তির মানে অন্যের কাছে প্রকাশ নয়। তাঁর মতে অন্তঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, ও-দুটো সম্পূর্ণ অসমজাতিক ক্রিয়া—প্রথমটা তত্ত্বগত এবং দ্বিতীয়টা ব্যবহারগত। অন্তঃপ্রকাশের সঙ্গেই অভিব্যক্তির তাদাত্ম্য, বহিঃপ্রকাশকে তো তিনি সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচ্য প্রসঙ্গই মনে করেন না। অভিব্যক্তির অর্থ-বিভ্রাট ঘটেছে অন্যদিক দিয়ে। একস্থলে তিনি লিখেছেন যে যারা নিজেকে সমাদর-বঞ্চিত গুণী মনে করে, ভাবে যে তাদেরও শেক্সপীয়রের মতো উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপ্তি আছে কেবল টেক্‌নিকের অভাবে তা অব্যক্ত ও অনাদৃত, তারা আত্মপ্রবঞ্চক, তারা জানে না যে তাদের উপলব্ধিই অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠেনি। অপ্রকাশিত উপলব্ধি আকাশকুসুমের মতন অলীক, চতুষ্কোণ বৃত্তের মতন স্বতোবিরুদ্ধ। এই প্রকাশের মূল্য অন্যের কাছে কী সে-কথা অবান্তর, এর বাহন যে-শব্দবর্ণসংকলন তারও সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর হবার কোনো দরকার নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কাল্পনিকই হ'য়ে থাকে। তবে কিছু-একটা ফুটে ওঠা চাই, নইলে উপলব্ধির দাবি বৃথা। এখানে তো মনে হয় প্রকাশ করার অর্থ সুস্পষ্ট করা, সুনির্দিষ্ট করা। আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, সুন্দরের মধ্যে অভিব্যক্ত হচ্ছে রূপদ্রষ্টার অনুভূতি, তার অন্তরাত্মা। সেই উপলব্ধিই সার্থক উপলব্ধি, প্রকাশজ্যোতিষ্মান উপলব্ধি, যাতে সম্ভব হয়েছে বিষয় ও বিষয়ীর সাযুজ্য, আত্মা ও অনাত্মের সেতুবন্ধন। মন যখন ব্যবধান

লঙ্ঘন ক'রে নিজেকে প্রকাশ করে বস্তুর মধ্যে, তখন তার অনাত্মীয় নিছক প্রাকৃতিক রূপকে মানসিকতার আস্তরণে আবৃত ক'রে তার সঙ্গে মিলনের পথ সহজ ক'রে নেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সাহিত্য-সাধনই সাহিত্যের তাৎপর্য। সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে বস্তু যেমন মনোগত হ'য়ে ওঠে, মনও তেমনি বস্তুগত হয়, তন্ময় হয়, এ-কথাটা অতি সুবিদিত ও সনাতন ব'লেই বোধহয় কবি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্রোচের কাছে উপলব্ধি ও অন্তঃপ্রকাশ অভিন্ন। এই অন্তঃপ্রকাশের মধ্যে টেক্‌নিক অবর্তমান, সাধারণ মানুষও এতে বঞ্চিত নয়; তবে প্রকাশের গভীরতা ও ব্যাপকতার তারতম্য অবশ্য অনিবার্য। এ-ক্ষমতা না-থাকলে শুধু যে রসসৃষ্টি অসম্ভব তা-ই নয়, রসসম্ভোগও অসাধ্য। টেক্‌নিকের আবশ্যকতা বহিঃপ্রকাশের বেলা। তার সাহায্যে শিল্পী আপন উপলব্ধিকে এমন-সব সাধারণের প্রত্যক্ষ-গোচর বাস্তব সামগ্রীতে পরিণত করে যা দর্শক বা শ্রোতার মনে অনুরূপ উপলব্ধি জাগাতে সক্ষম। এই বাস্তব শিল্প-সামগ্রীকে সুন্দর বলতে ক্রোচে একান্তই অনিচ্ছুক; তাঁর বিবেচনায় সৌন্দর্যের দাবি একমাত্র সেই ধ্যানমূর্তির, শিল্পীর অন্তরাত্মা যার সঙ্গে সম্মিলিত, এবং যাকে সে অন্যের মনে উদ্দীপ্ত ক'রে তার আত্মপ্রকাশকে পূর্ণতর ক'রে তোলে। শিল্প-সামগ্রী—পটের উপর বর্ণ-বিন্যাস, খোদাই-করা মর্মর-প্রস্তর, ধ্বনিতরঙ্গ, ছাপার অক্ষর—এ-সমস্তই সেই উদ্দীপনার ভৌতিক উপকরণমাত্র। যাকে বলি প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য সে-ও তা-ই। চিত্র বা সঙ্গীত যে-অর্থে উদ্দীপক, ছাপার অক্ষরে কবিতা সে-অর্থে উদ্দীপক নয়, তাকে বরঞ্চ উদ্দীপকের উদ্দীপক বলা যেতে পারে। প্রথমত সে উদ্দীপ্ত করে শুধু ধ্বনি-হিল্লোল ও চিত্রকল্প; পরে, এদের উদ্দীপনায় পাঠকের মনে জাগে শিল্পীর উপলব্ধ ভাবরূপ। সে-উপলব্ধি অবশ্য পাঠকেরই, তার সঙ্গে শিল্পীর উপলব্ধির কোনো রহস্য-নিগূঢ় তাদাত্ম্য নেই, আছে অতিশয় পার্থিব আনুরূপ্য বা সাদৃশ্যমাত্র।

কলিংউড্ অভিব্যক্তির এমনতরো অন্তর্মুখী অর্থ করতে নারাজ। তাঁর কাছে সুন্দরের দ্যোতনায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা দুয়েরই অতীত একটা বৃহত্তর সত্তার ইঙ্গিত নিহিত। সৌন্দর্যের একটি স্বতোবিরুদ্ধতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন; সুন্দর বস্তু একদিকে বাস্তব-বিশ্বের সঙ্গে অসম্পৃক্ত, তাঁর ভাষায় বিশুদ্ধ কল্পনা; অন্যদিকে সে দাবী করে উত্তর-প্রপঞ্চ পরম সত্তারই অভিব্যক্তি। এ-অভিব্যক্তি অবশ্য অনুভবগত, চিত্তগত নয়। কী অভিব্যক্ত হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট সম্যক্-বোধগম্য পরিচয়ে আমরা বঞ্চিত, কিন্তু কিছু-একটা ইঙ্গিত যে সুন্দরকে অর্থ-জ্যোতির্ময় ক'রে তোলে, রূপদ্রষ্টার মনে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে-অনির্দিষ্ট ইঙ্গিতের অর্থ কী তা শিল্পী জানে না, জানতে চায়ও না.—তাকে সুনির্দিষ্ট করবার সমস্যা দার্শনিকের। যে-মনোবৃত্তির প্রণোদনায় কলিংউড্ অভিব্যক্তির এই বহিরাশ্রয়ী বিশাল অর্থ করেছেন তার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি হেগেল-প্রবর্তিত ব্রহ্মবাদের কাছে ঋণী। সে-মতবাদের সৌন্দর্যতত্ত্ব বেদমন্ত্রের মতো একটি সংক্ষিপ্ত অর্থঘন বাক্যে সর্বত্রই ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'য়ে থাকে—ইন্দ্রিয়গম্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের আবির্ভাব। কথাটা কিন্তু এতোই ব্যাপক যে, সমস্ত বিজ্ঞানকেও অনায়াসে এর পরিধির মধ্যে টেনে আনা যায়। নিউটন-জীবনীর সেই সুবিখ্যাত, যদিও কল্পনা-প্রসূত, বৃত্তান্তের কথাই ধরা যাক্। আপেল-পতনে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের উদ্ঘাটন কি ইন্দ্রিয়গম্যের ভিতরে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকাশ নয়? অবশ্য বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকৃতি আলাদা, সে হচ্ছে গাণিতিক-সঙ্গতি-প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন তত্ত্বশৃঙ্খলা, সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত তথ্য যাব মধ্যে দানা বেঁধেছে যুক্তির অটুট সূত্রে। আর্টের ইন্দ্রিয়াতীত কী? হেগেল্-বাদীরা বলবেন তাঁদের সেই ব্রহ্ম, যার শতাব্দীব্যাপী ব্যাখ্যার পরে আজও সন্দেহ দূর হয না যে, তার পরিগ্রহণে যুক্তির চেয়ে নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাই অধিক। আস্তিককেও এর উত্তর দিতে দিশেহারা হ'তে হবে না, সকল সমস্যার চরম নিষ্পত্তি-

রূপে রয়েছেন তার ভগবান। রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে লিখতে পেরেছিলেন : "ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি; রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো। কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে, আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, আমি সেই সুন্দরের দূত।" কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরবাদে আস্থা হারিয়েছেন, এই সোনার লঙ্কাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেছেন, সৌন্দর্যধ্যান স্তিমিত নয়নে কোন নভোপ্রান্তরচারিণীর সুদূর ছায়াঞ্চল দেখবেন তাঁরা?

১৩৪১

কাব্যের বিপ্লব এবং বিপ্লবের কাব্য

হেগেল্‌কে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে দিলে কোথাও কোনো গলদ আর থাকবে না, নীহারিকার সৃষ্টি থেকে আরম্ভ ক'রে ধনিক সভ্যতার বিনাশ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মূলতত্ত্বটি জলের মতো পরিষ্কার হ'য়ে যাবে—এমনতরো ভোজবাজিতে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি যাঁদের নেই তাঁরাও অস্বীকার করবেন না যে, মানবজীবনের বিবিধ ধারা, আর্থিক এবং পারমার্থিক, পরস্পরকে অনেকখানি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করে। তাই এ-কথা বিচিত্র নয় যে আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অসমগতি এবং ধন-উৎপাদন ও বণ্টনের অব্যবস্থা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে-ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছে তার অনুকম্পন কবিতার মতো অন্তঃপুরবাসিনীর দেহেও এসে লাগলো। নানা প্রশ্ন ও সমস্যার মধ্যে আধুনিক কবিরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন, এবং যেটা সবচেয়ে দুর্ভাবনার কথা, জনসাধারণের সঙ্গে, এমন-কি শিক্ষিত-সাধারণের সঙ্গেও, তাঁদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হ'তে চলেছে।

নালিশ উঠেছে প্রধানত দুটি কথা নিয়ে। অধিকাংশ পাঠকের মুখে শোনা যায় যে কবিরা দিনকের দিন এমনই অভিনব ভাষা আর উদ্‌ভট ভঙ্গির পক্ষপাতী হ'য়ে উঠছেন যে সমসাময়িক কোনো কবিতা বুঝবার দুঃসাধনায় সপ্তাহখানেক মগজ খাটিয়ে দুটো-চারটে শব্দকোষ মহাকোষ ঘেঁটে বুদ্ধি যদি-বা বাড়ে, বিদ্যা যদি-বা প্রশস্ত হয়, রসের আস্বাদটুকু কিন্তু মেলে না। দ্বিতীয় অনুযোগের বিষয় হচ্ছে এস্কেপিজম্‌। ঐ-বস্তুটা অবশ্য এ-যুগের কবিদের উদ্‌ভাবন নয়। ব্যাধি বেদনা আর ব্যর্থতায়-ভরা এই পৃথিবী থেকে পলাতক 'অদৃশ্যপক্ষ'-সঞ্চরণশীল কীট্‌স্‌-এর কবিতাও এস্কেপিস্ট। জিনিসটা

পুরাতন হ'লেও তার সম্বন্ধে নালিশটা সভ্য নূতন, মার্ক্সীয় সাহিত্য বিশারদদের অবদান। মোটের উপর অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে একদিকে কবিতার পাঠক-সংখ্যা (নিতান্ত বাজারি ঠুন্‌কো প্রেমের কবিতা বাদ দিয়ে) দ্রুতগতিতে শূন্যের দিকে এগুচ্ছে, এবং অন্যদিকে আমাদের কবিরা বর্তমান সমাজ ত্যাগ ক'রে কেউ-বা এ্যাংলো-ক্যাথলিসিজম্-এর মধ্যযুগে অন্তর্ধান করেছেন, কেউ-বা পৌরাণিক-যুগের ভাঙা দেউলে ব'সে নিজের হাতে-গড়া প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদন করেছেন।

কবি ও কবিতার নেপথ্য-বিলাস কিন্তু বেশিদিনের নয়। হোমরের যুগে শেক্সপীয়রের যুগে এদের বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে হয়নি, এবং প্রাগৈতিহাসিক কালে তো কাব্য নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলাই ছিলো জাতীয় (tribal) সংযোগের প্রধান উপকরণ। বহু লোকের সম্মিলিত কণ্ঠের আবৃত্তি বা গীতি (তখন কবিতা আর গানের অঙ্গ-বিচ্ছেদ ঘটেনি) প্রাক্-সভ্য মানুষের জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ছিলো। কড্‌ওয়েলের বিশ্বাস যে ছন্দোবদ্ধ ভাষার তখন বিশেষ function ছিলো এমন-সব ক্ষেত্রে উপজ্ঞাগত উদ্যম জাগিয়ে তোলা যেখানে কোনো প্রত্যক্ষ উদ্দীপক চোখের সামনে উপস্থিত নেই। বাঘ দেখলে এ্যাড্রিনলীন্-নিঃসরণের দ্বারা ছুটে পালাবার অনুকূল বেগ ও বলসঞ্চয়ের বিধান শরীরের মধ্যেই নিহিত, কিন্তু ছ'মাস পরে যে-ফসল ফল্‌বে তার আয়োজনের উপযুক্ত সঙ্কল্প ও উত্তেজনা সরবরাহের দায়িত্ব ছিলো কাব্যের। সমষ্টির সান্নিধ্যজনিত এই আবেগ কবিতা বা গানের সঙ্গে ক্রমশ এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়লো যে নির্জনেও যদি কেউ তার পুনরাবৃত্তি করতো তাহ'লে সে বুল্‌বুলের কূজন-মুখরিত কোনো পত্র-নিবিড় নিকুঞ্জে গিয়ে পৌঁছতো না, সে পেতো নিজেকে তার সমগ্র জাতির মর্মস্থলে। আর্টের নিভৃত চর্চার মধ্যেও অটুট রইলো জনগণের সঙ্গে সমবেদনাবোধ।

তারপরে প্রাথমিক সাম্যতন্ত্রী সমাজকে সরিয়ে দিয়ে এলো শ্রেণী-বিভক্ত ধনতন্ত্রী সমাজ, আর্টের জাতীয় রূপ ঘুচলো, দেখা দিলো তার শ্রেণীরূপ। সেই রূপ ছিলো এলিজাবেথীয় যুগের। কৃষক-শ্রমিকের সঙ্গে কাব্যের যোগ অবশ্য রইলো না, কিন্তু শিক্ষিত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ে তার গতি ছিলো অবাধ। শেক্সপীয়রের নাটকে রস পেতো না এমন ভদ্রব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। কবির সে-প্রতিপত্তিও আজ আর নেই। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হয়েছে, মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির ফলে বইয়ের প্রচার হাজারগুণে বেড়েছে, অথচ কবিতার পাঠক খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজ ছেড়ে, শ্রেণী ছেড়ে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচারে আধুনিক কবিতার আত্মহত্যা আজ আসন্ন। এর দুটি প্রধান কারণ :

১। ফলিতবিজ্ঞানের কল্যাণে সাধারণের চিত্তাধিকার-ক্ষেত্রে কবিতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এসে দাঁড়িয়েছে সিনেমা, রেডিয়ো, খবরের কাগজ আর ছ'পেনি উপন্যাস। এদের স্থূল উত্তেজনা আর লঘু চিত্ত-বিনোদনের সঙ্গে কাব্যের সূক্ষ্ম রসপরিবেশন পেরে উঠবে কেন। এ-প্রতিযোগিতাটি তেমনি অসম এবং অসঙ্গত যেমন কারখানার সঙ্গে কারিগরের প্রতিযোগিতা। কবিকেও হটতে হ'লো, কারিগরকেও হার মানতে হ'লো এবং উভয় ক্ষেত্রে পরাভবের অভিমান একই প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে—কড্‌ওয়েল যার নাম দিয়েছেন skill-fetishism। তাঁরা আপন-আপন কৌশল ও দক্ষতা নিয়ে অযথা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, তার অসঙ্গত মূল্য দাবী করলেন, এবং সকলের কাছে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন যে অন্তত এ-ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দিগ্ধ। ইংরেজি সাহিত্যে এর ফল ততোটা পরিস্ফুট হয়নি যদিও ইডিথ্‌ সিট্‌ওয়েল্‌, কমিংস্‌ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে, কিন্তু ফ্রান্স-এ সিম্বলিস্ট প্রচেষ্টার উৎস এইখানে। তাঁরা শব্দার্থকে অগ্রাহ্য ক'রে শব্দের ধ্বনি ও রূপের অতিসূক্ষ্ম কারুকার্যে পদ্য রচনা করলেন,

মালার্মে উপদেশ দিলেন "Poetry is written with words, not with ideas", কবিতা হ'লো শ্রোতব্য ও দ্রষ্টব্য, বোধ্য আর রইলো না।

২। দুর্বোধ্যতার দ্বিতীয় কারণের সঙ্গেও বর্তমান সমাজবিপ্লবের সম্বন্ধ রয়েছে, কিন্তু তা অংশত, আসলে সেটা কাব্যধর্ম-প্রসূত। পণ্ডিতেরা শব্দের দুইপ্রকার অর্থ নির্ণয় ক'রে থাকেন, প্রথমটাকে অভিধা এবং দ্বিতীয়টাকে অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে। অভিধা সম্পূর্ণ বিষয়গত, শব্দ সেখানে সঙ্কেতমাত্র, শ্রোতার মনকে কোনো বাহ্যবস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়াই তার একমাত্র কাজ। বৈজ্ঞানিক ভাষার এই আদর্শ এবং এর পরিপূর্ণ সিদ্ধি বোধহয় শুধু গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানেই সম্ভব হয়েছে। অভিব্যক্তি একান্ত বিষয়ীগত, শব্দের বাহ্যসঙ্কেত সেখানে লুপ্ত না-হ'লেও গৌণ, তার ব্যবহার বাহনরূপে, বক্তার মনোভাব বা হৃদয়াবেগকে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করবার উদ্দেশ্যে। কবিতায় নিত্যব্যবহার্য কোনো-একটি শব্দ নিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে তার বিষয়-নির্দেশক আভিধানিক অর্থ ব্যতীত তার সঙ্গে বহুতর চিত্রকল্পের ও তৎসংশ্লিষ্ট আবেগের আনুষঙ্গিক যোগ বিদ্যমান। কবির শব্দচয়ন ও বিন্যাসের অভিপ্রায় এই আনুষঙ্গিক চিত্রকল্প-সমাবেশে উদ্দিষ্ট ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলা। ধ্বনির তারতম্য এবং ছন্দের বন্ধন পাঠকের মনকে তন্দ্রাবিষ্ট ক'রে তার স্বাভাবিক বিষয়ানুগত্যকে প্রতিরোধ ক'রে আবেগ-সঞ্চারের সহায়তা করে। অবশ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন কবির সাধ্যও নয়, কাম্যও নয়। কারণ ভাবানুষঙ্গ নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। পর্বত শব্দটা আমার কাছে বহ্নি ও ধূম্রের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রতীক, আপনার চোখের সামনে হয়তো পুরীর সমুদ্রতীরের ছবি নিয়ে আসে, এবং আরেকজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানান-পদ্ধতির নিয়মাবলী। অবশ্য কল্পনার এই যদৃচ্ছগতি খানিকটা

অবদমিত হয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শব্দের চাপে, তবু কবিতা যদি উৎকেন্দ্রিক হ'য়ে বিভিন্ন পাঠকের খামখেয়ালী মর্জির স্পর্শরেখা ধ'রে বিবিধ দিকে ছুট্‌তে না-চায়, যদি সকল পাঠকের মনে মোটের উপর একইরকম ভাবাবেগের উদ্বোধন তার লক্ষ্য থাকে, তাহ'লে তাকে আশ্রয় নিতে হবে একটি বাহ্য ও সর্বজনীন বিষয় বা বৈষয়িক পরিস্থিতির। বিষয় যেন বিষয়ীকে ছাড়িয়ে না-যায় সেদিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখা দরকার। কবিতার চরম সিদ্ধি নির্ভর করে তার অভিধাগত ও অভিব্যক্তিগত অর্থের নিখুঁৎ ভারসাম্যের উপর। আগেকার দিনে সে-ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটতো অভিধার চাপে অভিব্যক্তির লোপ পাওয়াতে। আজকাল কিন্তু রুচির বদল হয়েছে, ঝোঁক পড়েছে অভিব্যক্তির উপর। বাঙলা সাহিত্যে এর উদাহরণ বিষ্ণু দে। যেখানে তাঁর অবহিত কলাকৌশল ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছে, সেখানে তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করেছেন, যথা "ওফেলিয়া" বা "ক্রেসিডা"য়। (এগুলির পরিস্থিতি জীবন থেকে নেওয়া হয়নি পরিচিত নাটক থেকে আহরণ করা হয়েছে, তবু সেটা বিষয়গত, কারণ তা সাধারণের অধিগম্য, বহুলোকের পূর্ব কাব্যপাঠের দ্বারা তার বিষয়ীত্ব ঘুচে গেছে।) আর যেখানে তিনি সে-ভারসাম্যের দিকে লক্ষ না-রেখে একান্ত নিজস্ব সাধারণের অনধিগম্য অনুষঙ্গ ও স্মৃতির মধ্যে আত্মস্থ হয়েছেন ("অপস্মার", এবং সম্ভবত "ঘোড়সওয়ার" কবিতায়) সেখানে পাঠকের মন, অন্তত আমার মন, সম্পূর্ণরূপে সাড়া দিতে অক্ষম। কাব্যের এই নবরীতির সমর্থনে এলিয়ট লিখছেন:

The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him: much as the imaginary burglar is always provided

with a bit of nice meat for the house-dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way; some of them, assuming that there are other minds like their own, became impatient of this meaning', and perceive possibilities of intensity through its elimination.

মুশকিল এই যে কবির মনের অনুরূপ কোনো পাঠকেরই মন হয় না, এবং হয় না ব'লেই কবিতার একটি 'meaning' অর্থাৎ বহিঃ-পরিস্থিতির আশ্রয় দরকার। তবে সমসাময়িক কবিদের পক্ষে এমন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়তো সম্ভব যে আজকের দিনে সমাজের স্তরে-স্তরে ভাঙন ধরেছে, তার দিগন্তব্যাপী বিকৃতি ও বিনাশের মধ্যে তাঁদের রূপায়নিক কল্পনা কোনো আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, ফিরে আসছে ব্যাহত হ'য়ে, বিভ্রান্ত হ'য়ে। তাঁদের আত্মপরিক্রমা মানুষের প্রতি ঔদাসীন্যের ফল নয়, নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া। আমাদের দেশের কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই মনোভাবের প্রতিভূ। তিনি যে "অবিকল সিদ্ধ স্বয়ম্বশ চিরসত্তা"কে আপন অন্তর্নিবিড় চৈতন্যে সন্ধান করেছেন, তার পটভূমিকায় রয়েছে তাঁর বিশ্বাস যে

> মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
> সংক্রমিত মড়কের কীট,
> শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।

একে defeatist ভাববিলাসিতা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া বৃথা, কারণ এখানে জয়-পরাজয়ের আদর্শ নিয়ে মতভেদ।

সাম্যবাদী বলতে চান যে, আমাদের শিল্পীরা যে শ্রোতা বা পাঠকের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাঁদের শিল্প-রচনাকে স্বগতোক্তিতে পরিণত করেছেন, এটা বণিক-সভ্যতার নিদানকালের লক্ষণ। এই সভ্যতার দেহে যতোদিন প্রাণ ছিলো ততোদিন তার সঙ্গে কালচারের

সম্বন্ধ ছিলো নিবিড়, তার আর্ট ছিলো সামাজিক ও প্রগতিশীল। আজ ইতিহাসের রথচক্র তার উপর দিয়ে চলছে, তার বৈদগ্ধ্যের বহুমূল্য উপকরণগুলি ভেঙেচুরে মিস্‌মার হ'য়ে গেলো ব'লে। আজ আমাদের চোখের সামনে এক নবীন নিঃশ্রেণীক সমাজের দৃশ্যপট, আমাদের মনন ও মনীষার কেন্দ্র সেইখানে, আমাদের ভাব ও আবেগের উৎস তারই তলে। কাজেই শুনতে পাই : "No book written at the present time can be 'good', unless it is written from a Marxist or near-Marxist point of view." (Upward, *Mind in Chains.*) আর্টের উপর দলপতিদের দণ্ডচালনা এইখানে থেমে যায়নি, হুকুম হ'লো যে তাকে আপন সাবেকী নির্লিপ্ততা আর আত্মম্ভরিতা ভুলে গিয়ে সোজাসুজি লাগতে হবে দলের কাজে : "Art, an instrument in the class struggle, must be developed by the proletariat as one of its weapons." (Freeman, *Proletarian Literature in U. S. A.*) কিন্তু আর্টকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবো কিসের জন্যে? কোনো সমাজ-ব্যবস্থা, তা সে শ্রেণী-বিভক্তই হোক্ আর শ্রেণী-বিবর্জিতই হোক্, চরমমূল্যের দাবী করতে পারে না। যে অনাগত সমাজের উদ্যোগ-পর্বের আয়োজনে শিল্পীদের আহ্বান করা হচ্ছে তার মূল্য কিসে, তার সার্থকতা কোথায়? নিশ্চয়ই সেটা কেবল এই নয় যে তাতে সক্ষমেরা নির্ব্যতিরেকে খাটবে আর খাবে আর ঘুমুবে, বৃদ্ধেরা বিশ্রামাগারে ব'সে ঢুলবে, আর শিশুরা ঘর বা হাঁসপাতাল ভরবে। যদি তার কোনো সার্থকতা থাকে তবে তা এই যে আজ যে-চরম-মূল্যের সন্ধান আমাদের মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠীরা পেয়েছেন, তার যোগ্যতা এবং সুযোগের ক্ষেত্র সেখানে সকলের জন্য অবারিত হবে। চিৎপ্রকর্ষ আর চারুশিল্পের সম্প্রসারণই যদি সমাজবিপ্লবের

লক্ষ্য হয়, তা হ'লে আর্টকে সে বিপ্লবী কার্যক্রমের অন্যতম অস্ত্র বলতে গেলে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে একটি মারাত্মক গরমিল থেকে যায়। এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, যার দু-বেলা অন্নের সংস্থান নেই, পরমার্থলাভের চেয়ে পরমান্নলাভের প্রয়োজন তার অধিক। আমি শুধু বলতে চাই যে আমরা যদি পরমার্থের কথা না-ভাবি, তাহ'লে অন্নবস্ত্রের সংস্থান ক'জনের হ'লো আর ক'জনের হ'লো না, কোনো সভ্যতার মূল্য-বিচার সে-তালিকার উপর নির্ভর করতে পারে না। অবশ্য যুগসন্ধিকালে এমন অবস্থা-বিপর্যয় ঘটতে পারে যাতে বেঁচে থাকবার তাগিদই সকলের পক্ষে সর্বগ্রাসী হ'য়ে উঠবে। যেমন যুদ্ধের সময়ে শিল্পী তার তুলি রেখে, বৈজ্ঞানিক তার গবেষণা ছেড়ে, হাতে বন্দুক ধরতে বাধ্য হয়। আজকে পৃথিবীর সর্বত্র সে-দুর্দিন এসেছে এটা সম্ভব, হয়তো সত্য। আর্টিস্টরা তাঁদের সমস্ত শক্তি সমস্ত সাহস নিয়ে ফাশিস্ট বর্বরতা-বাহিনীর সম্মুখীন হবেন, এটা তাঁদের পক্ষে অগৌরবের কথা নয়। কিন্তু রণপ্রাঙ্গণে সেনাধ্যক্ষরা তাঁদের হাতে যে-কাজ দেবেন তাকে আর্ট বলবার নির্বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। সাম্যবাদের উর্বর ভূমিতে হয়তো সোনার ফসল ফলবে, কিন্তু শ্রেণী-সংঘর্ষের যন্ত্ররূপ সাম্যবাদী শিল্প হচ্ছে আমাদের পরিভাষায় "বন্ধ্যাপ্রসূতি।"

এস্কেপিজম্ সম্বন্ধে মার্ক্স-পন্থীরা যে-বিসংবাদের অবতারণা করেছেন সেখানেও তাঁদের সাহিত্য-বিচার অনুজ্ঞাবাহক। সাহিত্যকে বস্তুতান্ত্রিক হ'তে হবে, বাস্তবমুখিন হ'তে হবে—এই কথাগুলি মেনে নেবার আগে জানতে চাই কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা অবাস্তব। চোখ খুলে সামনে যা দেখতে পাই, যাকে আমরা চলতি কথায় বলি "ফ্যাক্ট্", তাই কি বাস্তব? তা হ'লে তো সাম্যবাদীদের প্রসাদ-লালিত পদার্থবিদেরাই এস্কেপিস্টের চূড়ান্ত। আইনস্টাইনের চতুরায়তনিক বঙ্কিমতা কিম্বা শ্রোয়ডিঙরের সম্ভাবনা-তরঙ্গের সঙ্গে

টেবিল-চেয়ার ঘর-বাড়ীর সম্বন্ধ কতোটুকু ? অবশ্য প্রতীয়মান বস্তু-মাত্রের জন্য সাম্যবাদীদেরও বড়ো-একটা মাথাব্যথা নেই, তাঁদের "বাস্তব" হচ্ছে ডায়লেকটিক্-গতিধর্মী জড়প্রকৃতি। এটা যে প্রত্যক্ষ নয়, আনুমানিক, বহু মতবাদের মধ্যে একটি মতবাদমাত্র, তা বোঝাবার জন্য পরিভাষা-কণ্টকিত কোনো প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। এবং এই মতবাদটিকে বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় স্থাপিত করবার জন্য এঙ্গেল্‌স্ প্রমুখ যে-সব দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা ভগবানের অস্তিত্বের বাজার-চল্‌তি "প্রমাণে"র চেয়েও হাস্যকর। তবু এই ধ্রুব সত্যটিকে আর্টের মধ্যে রূপ দিতেই হবে। যদি আপনার শিল্পী-মন তথ্যের অন্তরালে অন্য-কিছুর সন্ধান পেয়ে থাকে, তা সে গ্রীক নাট্যকারদের অন্ধ নিয়তিই হোক্ কিংবা "নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন"ই হোক্, তাহ'লে আপনাকে শিষ্ট ভাষায় এস্কেপিস্ট বলা যায়, কিন্তু আসলে আপনি ফাশিস্ট, স্বার্থান্ধ, সভ্যতার শত্রু।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সঙ্গে একাধারে সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য রক্ষা ক'রে টি. ই. হিউম্ দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবিধ ধারার মূল উৎস হচ্ছে কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসগুলি যুগ-চৈতন্যের যে অসংজ্ঞাত স্তরে সক্রিয় সেখানে যুক্তিতর্কের অবকাশ নেই, প্রমাণ-অপ্রমাণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উত্তর-রেনেসাঁস্ চিৎপ্রকর্ষের মূলে রয়েছে হিউম্যানিজম্ অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজ শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস, এবং তার প্রগতির অনন্ত সম্ভাবনার স্বীকৃতি। হিউম্যানিজম্‌কে হিউম্ ভ্রান্ত মনে করেন, তাঁর বিবেচনায় মধ্যযুগের মূল্যবোধই সত্য, অন্তত অধিকতর সত্য। সে-মূল্যবোধে মানুষ অকিঞ্চন, প্রগতি কবিকল্পনা, জীবনের শেষ পরিণতি অনিবার্যরূপে ট্র্যাজিক্। চরমমূল্যের আধার মানুষ নয় ভগবান, অনাত্মীয়, সুদূর, স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভগবান।—এমন প্রাথমিক প্রাগান্বীক্ষিকা (pre-logical) বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার বিচার সম্ভব নয়, তার

কোনো অর্থই এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হিউম্ নিজেই প্রচার করেছেন যে আমাদের সংস্কৃতির সমগ্র রূপকল্প এই বিশ্বাসের দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং আমাদের বিচারের পদ্ধতি ও প্রতিমানও সে-বিশ্বাসের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। সে-বিশ্বাসকে বিচার করতে চাইলে যুগধর্ম-নিরপেক্ষ প্রতিমান আবশ্যক। তেমন কোনো প্রতিমানের সম্ভাবনা হিউমের দর্শনে নেই। তবে তর্কের পথ ছেড়ে দিয়ে কবি হিউম্ বলতে পারেন যে হিউম্যানিজম্-এর রূপায়ণিক প্রাণপ্রবাহ আজ নিস্তেজ হ'য়ে এসেছে। মানুষের মতন মানুষের বিশ্বাসেরও জন্ম জরা ও মৃত্যু ঘ'টে থাকে। যদিচ তার পরমায়ু "তিন কুড়ি দশ"-এর অধিক, তবু এমন দিন আসে যখন তার প্রাণের দৈন্য আর ঢেকে রাখা যায় না। সে-দৈন্যের চেহারা আজ শিল্পীদের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, তাই তাঁদের সৃজনী-শক্তি ব্যাহত, আত্মসম্বোধনরত। এর হয়তো কোনো উপায় নেই, ইতিহাসের অনাদ্যন্ত প্রবাহ এমনি ক'রে ভাঙে আর গড়ে। চিরাগত বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ভিৎ গেছে ভেঙে, তার ভগ্নস্তূপের উপর নতুন যুগের ইমারত যতোদিন-না মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ততোদিন আমাদের কবিদের গলা শোনাবে "শান্ত অর্থহীন, যেন শুক্‌নো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।" ততোদিন আমরা কেবল চেয়ে দেখবো চারিদিককার প্রাণ-স্পন্দিত শ্যামলিমা যাচ্ছে বিবর্ণ হ'য়ে, যেখানে বনস্পতি ছায়া বিস্তার ক'রে ছিলো সেখানে রইলো শুধু রিক্ত বিস্তৃত মরুভূমি। আর সে-মরুভূমির তৃষ্ণার্ত হাহাকারে রইলো এ-যুগের ছন্দোহীন প্রার্থনা :

"অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়াফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।"

১৩৪৫

ভূমিকা : আধুনিক বাঙলা কবিতা

কোনো-একটি ভাষায় নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কিংবা বিশিষ্ট শ্রেণীর ভিতরে কোন-কোন কবিতা ভালো, কাব্যসংকলনগ্রন্থকে এই প্রশ্নের উত্তর মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ কাব্যসংকলন কাব্য-সমালোচনারই অন্তর্ভুক্ত। কাব্যসমালোচনা এর সঙ্গে আর-একটি প্রশ্ন তুলতে বাধ্য : ভালো কবিতা কোনটা জানতে হ'লে জানা দরকার ভালো কবিতা কী। এ-দুটি প্রশ্ন যে পরস্পরকে এড়িয়ে চলতে পারে না সে-কথা এলিয়ট্ প্রসঙ্গত স্বীকার করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি না-হ'লে প্রথম প্রশ্ন-সমাধানে এগুনোই যে সম্ভব নয়, তা তিনি মানেননি ; বরঞ্চ দ্বিতীয় প্রশ্নের নিরাকরণ তাঁর আয়ত্তে নয়, তাঁর আলোচনা-ক্ষেত্রের অন্তঃপাতীও নয়, এই সবিনয় স্বীকৃতির মধ্যে সেটাকে চাপা দিয়েছেন। তার মানে এই যে ভালো কবিতা কী তা না-জেনেও আমরা চিনে নিতে পারি কোন কবিতাটি ভালো সম্ভবত কোনো-এক অনির্দেশ্য বুদ্ধি-অতিক্রান্ত শক্তির সাহায্যে, যাকে দার্শনিকরা বোধি নামে অভিহিত করতেন, কিন্তু 'রুচি' ব'লেই সাহিত্যিক সমাজে যার প্রচলন। সে-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই রুচিসম্পন্ন ব'লে নিজের প্রমাণ-নিরপেক্ষ পরিচয় দিয়ে থাকে ; সাহিত্যিক আভিজাত্যের নীল রক্ত ধারা তার ধমনীতে প্রবহমান, পরের রুচিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তার বংশপরম্পরাগত। সুরুচি মানে ভালো কবিতা চিনবার শক্তি, এবং ভালো কবিতা তা-ই যা রুচিবানেরা বরণ করেন, এমন-একটি স্থূল চক্রিক ন্যায় যে কেমন ক'রে তাঁদের সূক্ষ্ম সুকুমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়, তার রহস্য বাণীর বরপুত্রেরাই জানেন।

এটা অবশ্য সম্ভব যে ভালো কবিতা কী সে-বিষয়ে আমাদের মনে

একটি ধারণা রয়েছে, অথচ সেটাকে আমরা পরের কাছে, এমন-কি নিজের কাছেও, ভাষায় ব্যক্ত করিনি। সে-ধারণা অজ্ঞাত বা অসংজ্ঞাত থেকেও কোন কবিতা ভালো তা বেছে নিতে আমাদের নির্দেশ দিতে পারে। সক্রেটিস্ যেমন ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলবার সময়ে ধ'রে নিয়েছিলেন যে আমরা কতকগুলো নৈতিক ঘটনাকে ন্যায় কিংবা অন্যায় ব'লে নিঃসন্দিগ্ধভাবে চিনি। তাঁর সমস্যা ছিলো এই নির্বিবাদ দৃষ্টান্তগুলির তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে ন্যায়ত্বের ধারণায় পৌঁছানো। তেমনি হোমর, দান্তে, শেক্সপীয়র, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস—এঁদের রচনা হয়তো সর্ববাদীসম্মতিক্রমে 'ভালো কবিতা'র আখ্যা পেতে পারে। সক্রেটিসের মতন, কাব্য-সমালোচককেও এ-সমস্ত কবিতার সামান্যতা ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ থেকে 'ভালো কবিতা'র সংজ্ঞা-নিরূপণের চেষ্টা করতে হবে, নইলে যখন এমন কবিতার বিচার প্রয়োজন যেখানে সর্বসম্মতির অভাব, আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা অনিবার্য, তখন আপন বনেদী রুচির দোহাই পাড়া ছাড়া তার গতি থাকবে না।

রুচির নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে সমালোচনার ইতিহাস স্বৈরাচারের তালিকায় পরিণত হয়েছে। ড্রাইডেনের মতন কবি ও সমালোচক তাঁর সমসাময়িক নগণ্য নাট্যকারগণকে গ্রীক ও এলিজাবেথীয়দের চেয়ে শ্রেয় মনে করতেন, এবং *Measure for Measure*-এর ভাষাকে vulgar আখ্যা দিয়ে গেছেন। কাউলির প্রতিপত্তি তাঁর সময়ে মিল্টনের চেয়ে অধিক ছিলো, মিল্টন স্বয়ং তাঁকে শেক্সপীয়র ও স্পেনসরের তুল্য জ্ঞান করতেন। অর্ধশতাব্দী পরে পোপ্ অবজ্ঞাভরে প্রশ্ন করছেন : "কাউলি আজ পড়ে কে?" পিপ্স্ খুব বড়ো সাহিত্যিক না-হ'লেও একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, এবং এতোই বিদগ্ধ যে 'অথেলো' নাটকখানির ইতরতা বরদাস্ত করতে পারতেন না। ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে প্রামাণ্য কাব্যসংকলনের

সম্পাদক পল্‌গ্রেভ্‌-এর রুচি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা নিশ্চয়ই মূঢ়তা। তাঁর সংকলনগ্রন্থে যেখানে ক্যাম্‌বেলের এগারোটি কবিতা বর্তমান, এবং যার পরিবর্ধিত সংস্করণে লংফেলোর ("কিছু না হোক লংফেলোদের হব আমি সমান তো"—সেই লংফেলো) তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছে, সেখানে ডান্‌ কিংবা ব্লেকের জায়গা হয়নি। মোটকথা ভিন্ন দেশের রুচি তো ভিন্ন বটেই, কোনো একটি দেশেও যুগে-যুগে তার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের মহৎ তুচ্ছ হ'য়ে যায়, তুচ্ছ মহৎ। একই যুগেও রুচিবৈষম্য বড়ো কম নয়, তবু যে একটা ছাঁচ গ'ড়ে ওঠে সেটা স্বাধীন বিচারের পরিণাম নয়, মানুষের দাসত্বপ্রীতি ও ফ্যাশনপ্রবণতার নিদর্শন। "With the ascendency of T. S. Eliot, the Elizabethan dramatists have come back into fashion and the 19th century poets gone out. Milton's reputation has sunk and Dryden's and Pope's risen. It is as much as one's life is worth nowadays among young people, to say an approving word for Shelley or a dubious one about Donne. And as for the enthusiasm for Dante —to paraphrase the man in Hemingway's novel, there's been nothing like it since the Fratellinis."
(Edmund Wilson)

এ-কথা সত্য যে দর্শনে অনন্তকাল ধ'রে এবং পদার্থবিজ্ঞানে ইদানীন্তন প্রভূত মতানৈক্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তা সত্ত্বেও যখন এদের পক্ষে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব, তখন সাহিত্যের রুচিবৈষম্য কেন তার নৈর্ব্যক্তিকতার অপ্রমাণ। এইজন্য যে, দর্শনে-বিজ্ঞানে যখন মতভেদ ঘটে তখন দুই পক্ষ পরস্পরকে আহ্বান করে তার প্রতিজ্ঞাগুলি বিচার করতে, তার যুক্তি খণ্ডন

করতে, তার ভ্রান্তি উদ্‌ঘাটন করতে। এ-তর্কের মীমাংসা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে হয় না, কিন্তু তার সম্ভাবনা আছে, এবং সে-সম্ভাবনার উপরই objectivity-র দাবী নির্ভর করে। এদিকে, সাহিত্যে যখন রুচির গরমিল ঘটে তখন এ-কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না যে আমি দান্তেকে বড়ো কবি ব'লে জানি এবং আমার রুচি আপনার চেয়ে শ্রেয়, কি এলিয়ট্ অথবা অন্য-কোনো সাহিত্যিকপ্রবর এমন-তরো মন্তব্যের পরিপোষক। এর বেশি কিছু বলতে গেলেই কবিতা কী, তার ভালোমন্দ কিসে, এমন-সব প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়।

কবিতা কী, অথবা আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে আর্ট কী, এ-সমস্যা প্লেটোর সময় থেকে বহু মতবাদ ও মতবিরোধের সৃষ্টি করেছে। সংক্ষেপে, এবং চাক্ষুষ বৈচিত্র্যের চেয়ে মর্মগত ঐক্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হ'লে, সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে সাজানো যেতে পারে : পারমার্থিক, সামাজিক এবং স্বাশ্রয়ী।

পারমার্থিক। আর্টের স্বাতিক্রমণশীলতায় বিশ্বাস প্রাচীন, তবে হেগেলের দুর্নিবার ব্যক্তিত্বের ছাপ পেয়ে উনিশ শতকের নন্দনশাস্ত্রে এর অসম্ভব পরিব্যাপ্তি দেখা যায়। এ. সি. ব্র্যাডলি কাব্যের বিশুদ্ধতা ও অনন্যাধীনতার পক্ষে ওকালতি করতে গিয়েও স্বীকার ক'রে ফেলেছেন যে কাব্যের মূল্য তার প্রকাশ্য রূপে নয়, সে-রূপের অতীত কোনো-এক বৃহত্তর সত্তার ব্যঞ্জনায়। এটা হেগেল্-দর্শনের সেই অতি উদ্‌ধৃতিজীর্ণ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি যে আর্ট হচ্ছে ইন্দ্রিয়গম্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বও এই মত-বাদের পরিধির মধ্যে এসে পড়ে। "আমার জন্য সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক'রে সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক'রে সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক'রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি ? মানুষ তাই মধুর ক'রেই বললে, 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে

বাজল, হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক'রে নিলাম'।" এই স্বীকৃতির স্বাক্ষর হচ্ছে তার কলাসৃষ্টি। তাতে সে প্রকাশ করেছে তার অন্তরতম উপলব্ধিকে, ছন্দে মিলে রঙে রেখায় রূপ দিয়েছে সুন্দরের মধ্যে সত্যের আবির্ভাবকে। সাধকের বাণী শিল্পীর বাণী বটে: তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। একটি জায়গায় অবশ্য কবির সঙ্গে দার্শনিকের মতবৈষম্য স্বাভাবিক। হেগেল্ মনে করেন সেই বেদনীয় পুরুষের সম্যক্‌জ্ঞান দর্শনেই সম্ভব, আর্টে তার পরিচয় কেবল আভাসে ইঙ্গিতে। আর্টকে তাই তিনি দর্শনের প্রাথমিক ও অপরিণত রূপমাত্র বিবেচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বলবেন যে দার্শনিকের তত্ত্বব্যবসায়ী বুদ্ধি যেখানে এক ও বহু সামান্য ও বিশেষ প্রমা ও প্রতিভাসের শত তর্কজালে জড়িয়ে দিশাহারা হয়, সেখানে শিল্পীর রূপায়নিক উপলব্ধি সমস্ত তর্কবিতর্কের হট্টগোল থেকে দূরে স'রে গিয়ে শুনতে পায়।

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু আমার জীবনে
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু গভীর গোপনে।

সামাজিক। শিল্পীর উদ্দেশ্য ধর্মনীতি প্রচার, এমন কথা সোজাসুজি কেউ না-বললেও, আর্টের মূল্য যে অনেক পরিমাণে নৈতিক, গত শতাব্দীতেও এই মত শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, তল্‌স্তয় প্রভৃতির সমর্থন লাভ করেছিলো। আর্টের উপর মর্‍্যালিটির দাবি বিংশ শতাব্দীতেও অস্বীকৃত হয়নি, তবে তার স্বরূপ এখন ব্যক্তিক নয়, সামাজিক। ব্যক্তির চরিত্রোৎকর্ষের চেয়ে সমাজের সুনিয়ন্ত্রণকে এখন বড়ো ক'রে দেখা হচ্ছে। সমাজ-জীবনকে সব দিক থেকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে ধনবণ্টনের অব্যবস্থা এবং বৃত্তিভোগী ও শ্রমজীবীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ, এ-বিষয়ে বড়ো-একটা মতভেদ নেই। আমাদের চিৎপ্রকর্ষের সমস্ত প্রেরণাকে আপাতত নিয়োগ করতে হবে এই বিকলাঙ্গ সমাজের

পুনর্গঠনের জন্য। কাজেই শিল্পীর শুভানুধ্যানের ভিত্তি হবে অর্থ-নৈতিক, আধ্যাত্মিক নয়।

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে আর্টের কোনো চিরন্তন প্রতিমান থাকতে পারে না। প্রত্যেক যুগের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি সে-যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ ছাঁচে ঢেলে দেয়; তার রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন, আচার, ধর্মনীতি তো এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বটেই, তার দর্শন বিজ্ঞান, তার শিল্পকলা, তার অধ্যাত্মচর্চার উপরও এর ছাপ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে পড়ে। ফিউডল্ যুগে যদিচ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ছিলো ধনী-নির্ধন ও দাস-প্রভুর সম্বন্ধের দ্বারা কলুষিত, তবু তাতে একটি চিত্রল সততা এবং মানবিক সম্পর্কের বিকাশ সম্ভব ছিলো ব'লে আর আর্টের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেও ফুটে উঠলো অকপট প্রাণের শ্যামলিমা। রেনেসাঁসের সময়ে যখন ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'লো, তখন তার নবীন রক্তে প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে মানুষকে (যদিও অল্পসংখ্যক মানুষকে) ধনশালী করবার তস্করসুলভ বলিষ্ঠ উল্লাস ছিলো। সেই বলিষ্ঠতা দেখা যায় তার নবনির্মিত সংস্কৃতির বহুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখায়, ইটালির চিত্রে, ইংলণ্ডের সাহিত্যে, সমস্ত য়োরোপের জ্ঞানার্জনস্পৃহায়। কালক্রমে এর নবীনতা ঘুচলো, অগ্রগতির অনু-প্রেরণা নিঃশেষ হ'লো, উনিশ শতকের শ্রমবিপ্লবের ফলটুকু ভোগ করবার পর এর জীর্ণ দেহ আর প্যারিসীয় প্রসাধনে ঢেকে রাখা সম্ভব রইলো না। ব্যক্তিসম্পর্কের শেষ চিহ্ন মুছে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ঠেকলো এসে অনাবৃত স্বার্থের সম্বন্ধে। বাণীর মন্দিরে কুবেরের সিংহাসন পাকা হ'লো; বিংশ শতাব্দীর কবিরা "Hymn to Intellectual Beauty" না-লিখে লিখতে বাধ্য হলেন:

আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার। (সমর সেন)

এই আশুবিলীয়মান সভ্যতার ধূলিধূসরিত পটভূমিকায় কিন্তু ফুটে উঠছে নতুন এক সমাজের অরুণরেখা। সে-সমাজের সংস্কৃতি কী রূপ ধারণ করবে, তার সাহিত্য তার শিল্প কী আদর্শ বরণ করবে, তা এখনও নিশ্চিত ক'রে বলবার সময় আসেনি। ইতিমধ্যে শিল্পীর কাজ পুরাতনের ভগ্নাবশেষ ঝেঁটিয়ে ফেলে নূতনের পথ পরিষ্কার করা। ইতিমধ্যে আর্ট শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবে, সর্বদেশকালের যে-অধিপতি তাকে হ'তে হবে সামান্য সৈনিক। এতে যদি আমাদের বিশুদ্ধ শিল্পানুরাগ পীড়িত হয়, আমাদের পরমমূল্যবোধ যদি বিক্ষুব্ধ হয়, তা হ'লে আমরা ত্রৎস্কির উক্তি স্মরণ করতে পারি: "It is society itself which under communism becomes the work of art."

স্বাশ্রয়ী। এর প্রায় বিপরীতে মত প্রকাশ করেছেন ক্রোচে এবং কলিংউড। চিত্র বা কাব্য তাঁদের কাছে বিশুদ্ধ কল্পনা, সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তো বটেই, বহির্জগতে কোনো-কিছুর সঙ্গে তার ক্ষীণতম সম্বন্ধ নেই, বাস্তব-অবাস্তব কোনো বিশেষণই তাতে প্রয়োগ করা যায় না। আমাদের ধ্যানদৃষ্টি যখন তাতে নিবদ্ধ তখন আমাদের চিত্ত অপরাপর সকল বিষয়ের অবগতি থেকে আকুঞ্চিত হ'য়ে অব্যাহত একাগ্রতা লাভ করে তারই মধ্যে, অন্য-কিছুর চৈতন্যের অবকাশ তখন থাকে না। বাস্তব সে নয়, কারণ কোনো জিনিষকে বাস্তব বলা মানেই আর-সমস্ত জিনিষের সঙ্গে তাকে কতকগুলো নিত্য ও সার্বভৌম নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা। অবাস্তবও তাকে বলা চলে না, কারণ অবাস্তব তা-ই যার ব্যবহার জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম, যা অপ্রত্যাশিত, উৎশৃঙ্খলিত। যেমন রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম। সে-সর্প আপন জৈবধর্ম পালন করে না, ছোবলায় না, পালায় না, কাজেই তাকে বলি অবাস্তব। কিন্তু শিল্পীর রচনাকে আমরা বস্তুবিশ্ব থেকে পৃথক্ ক'রে দেখি, তাতে বাস্তবের কোনো নিয়ম আরোপই করি না।

অবশ্য তার সঙ্গে শিল্পীর সমাজের, সে-সমাজের আর্থিক সংস্থানের, তার পূর্ব-ইতিহাসের সম্বন্ধ একদিক থেকে ক্রোচেও স্বীকার করেন। তবে সে-সম্বন্ধের কথা যখন আমরা অবগত, তখন আমরা ঐতিহাসিক বা সমালোচক, রূপদ্রষ্টা নই। তখন শিল্পরচনা ঐতিহাসিক ঘটনামাত্র, তার শিল্পরূপ আমাদের তথ্যসন্ধানী ও তত্ত্ববিশ্লেষণী দৃষ্টির দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কিন্তু রসানুভূতির মধ্যে যখন তাকে পাই, তখন তার সঙ্গে সমাজের বা বস্তুজগতের কোনো যোগাযোগ নেই, সে স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রাণধর্মের অনুশাসন থেকে আমরা দুটি দিকে মুক্তির পথ পেয়েছি, দর্শনে আর শিল্পকলায়। দর্শন বিশুদ্ধ concept-সমূহের বিন্যাসের মধ্যে অন্তঃসঙ্গতি আনতে চায়; শিল্পীর কারবার image নিয়ে। এই মানসপুতুলগুলিকে সে খুশিমতো ভাঙে আর গড়ে, সাজায় আর গুছায়। সে ভাঙাগড়ার খেলায় একমাত্র তার মনোগত সৌষ্ঠবের দাবী ছাড়া আর-কিছুই সে মানে না, ব্যবহারজগতের কোনো বিধিই সে পালন করে না। জৈববিজ্ঞানের আধিপত্য থেকে সে মুক্ত। আমাদের আটপৌরে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত উপলব্ধি উদ্বর্তনের মৌল অনুপ্রেরণার বশীভূত; আমরা প্রয়োজনের দাস। সে-দাসত্বের শৃঙ্খলমোচন করতে পারে শিল্পী। রসের অনুভূতি মুক্তির অনুভূতি; তার সার্থকতা, তার পরিপূর্ণতা এইখানে।

বহু মতবাদের মধ্যে তিনটি প্রতিভূ মতের উল্লেখ করা গেলো। এগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা কিংবা আপেক্ষিক বিচার এখানে সম্ভব নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে এর কোনো নিষ্পত্তি না-হ'লে, কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অংশতও কোনো মতস্থৈর্য না-ঘটলে, কবিতার ভালো-মন্দ যাচাই নিতান্ত ব্যক্তিগত খামখেয়াল, তাতে সর্বসম্মতির দাবী করতে যাওয়া হয় মূঢ়তা, নয় অহংকার। সে-যাচাই আমরা যে রূপ-দক্ষ রুচি দিয়ে করি তা সেই রসনা-রুচির সগোত্র যার কল্যাণে কেউ আম খেয়ে সুখ পান, কেউ-বা আমসত্ত পছন্দ করেন।

আধুনিক বাঙলা কবিতা ঠিক কোন্‌খান থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত, প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সব জায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য ব'লে গণ্য করেছি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের কবিতা যে মোটের উপর রবীন্দ্র-কাব্যেরই প্রতিধ্বনি, এতে সন্দেহ করা চলে না, এবং আক্ষেপও করা যায় না যখন আমরা স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাঙলার মতন দীন সাহিত্যকে ঋদ্ধির কোন স্তরে নিয়ে এসেছে। তৃতীয় দশকে নজরুল ইস্‌লাম, যতীন সেনগুপ্ত প্রভৃতির শক্তি ও সাহসের ফলে সে সর্বজয়ী প্রতিভার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের ঘোষণা ক'রে নবীন বাঙালি কবিদের নিজেকে চিনবার এবং চেনাবার সুযোগ দেখা দিলো। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে তাকে আশাতীত মর্যাদা দান করলেন। গদ্যরীতির প্রচলন ক'রে, কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা বর্জন ক'রে, কবিকুল-পরিত্যক্ত 'অসুন্দর' প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশকে গ্রহণ ক'রে, তিনি নিজের ঐতিহ্য নিজেই ভেঙেছেন। তার স্থানে নতুন কোনো ঐতিহ্য এখনো গ'ড়ে ওঠেনি, অদূর ভবিষ্যতে গ'ড়ে ওঠবার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধ-পরবর্তী মেজাজ ঐতিহ্য-গঠনের অনুকূল নয়।

আধুনিক বাঙলা কবিতা যে আধুনিক ইংরেজি কবিতার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এদিকে মধুসূদন দত্তই পথপ্রদর্শক। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা কাব্যে দুটি মূল ধারা প্রবাহিত ছিলো, বৈষ্ণব ও মঙ্গলকাব্যের ধারা। মঙ্গলকাব্যের দেশজ রূপ ভারতচন্দ্রের হাতে সংস্কৃত হ'য়ে দরবারী সূক্ষ্মতা, ছন্দোচাতুরী ও অলঙ্কারব্যসন লাভ করেছিলো। মধুসূদনের

সময়ে ভারতচন্দ্রই সবচেয়ে প্রতিষ্ঠালব্ধ ও অনুকরণযোগ্য কবি ছিলেন। এছাড়া তখন দাশরথী রায়ের পাঁচালী আর রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত ছিলো জনপ্রিয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব কিন্তু প্রাদেশিকতার কোনো সীমানাই মানলো না, যে-পথে বেরিয়ে পড়লো তার পাথেয় তিনি সংগ্রহ করলেন সমুদ্রের ওপার থেকে, হোমর ভার্জিল্ মিল্টনের কাছ থেকে। এর জন্য তাঁকে বিস্তর গালাগাল সহ্য করতে হয়েছিলো। গালাগাল কিন্তু টিকলো না, টিকে রইলো তাঁর দুঃসাহসিক অবদান। রবীন্দ্রনাথ এসে বাঙলার প্রাচীন কাব্যের একটি ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, বৈষ্ণব ভক্তি ও ভাবার্দ্রতা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করলেন লেক্ স্কুলের প্রকৃতি-বন্দনা, তাতে কিছু আমেজ দিলেন উপনিষদীয় অধ্যাত্ম-রসের। সমস্তকে নির্মল ক'রে উজ্জ্বল ক'রে রইলো অবশ্য তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার রশ্মিধারা। আজ তৃতীয় দফায় বাঙলা কবিতা প্রতীচীর কাছে ঋণী। এবার কিন্তু উত্তমর্ণরা সমসাময়িক, মিল্টন বা ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ শেলি-র সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা তাঁদের এখনো গ'ড়ে ওঠেনি।

সাম্প্রতিক য়োরোপে, অন্তত ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে, দুটি প্রায় বিপরীত আন্দোলনের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল, প্রতীকী (symbolist) এবং সাম্যবাদী। প্রতীকী আন্দোলন রোম্যান্টি-সিজমেরই পুনরাবর্তন, তবে তার সঙ্গে এর মিল যতোখানি, গরমিলও তার চেয়ে কম নয়। ক্লাসিক যুগের বুদ্ধিপ্রবণ ও ভঙ্গিপ্রধান সাহিত্যের প্রতিবাদস্বরূপ এসেছিলো রোম্যান্টিকদের কল্পনা ও আবেগের উচ্ছ্বাস, এবং ড্রাইডেন পোপ কিংবা রাসীন মলিয়েরের লেখার মধ্যে সমগ্র সমাজকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলবার যে-চেষ্টা ছিলো, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেই ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ শেলি যুগো নিজের উপলব্ধিকে, নিজের বিশিষ্ট মনোভঙ্গিকে বড়ো ক'রে দেখলেন। হোয়াইট্হেড মনে করেন যে সপ্তদশ শতকের নবগঠিত জড়বিজ্ঞানের অভাবনীয় সিদ্ধির

ফলে মেকানিস্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বব্যাপী হ'য়ে উঠেছিলো, ক্লাসিসিজম্ তারই সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব। এই সূত্র ধ'রে উইল্‌সন্ বলতে চান যে উনিশ শতকের মধ্যভাগে জীববিজ্ঞানের পরিণতির সঙ্গে ক্লাসিসিজমের দ্বিতীয় অভ্যুদয় হ'লো, এবার কিন্তু পদ্যের চেয়ে ইবসেন ফ্লোবের প্রভৃতির গদ্যেই তা স্পষ্টতর। কিন্তু উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী দর্শনের আত্মম্ভরিতা এতোই উত্তুঙ্গ হ'য়ে উঠেছিলো যে অল্পকালের মধ্যে তার অনিবার্য ব্যর্থতাবোধের ফলে, বুদ্ধির সার্বভৌম শক্তির উপর ভরসা রইলো না, বের্গসঁ ব্র্যাডলি প্রভৃতি বোধির চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। সাহিত্যে এর পরিণাম প্রতীকী আন্দোলন। বুদ্ধিকে অস্বীকার ক'রে আবার আবেগ ও কল্পনার আধিপত্য এলো, আবার ঝোঁক পড়লো শিল্পীর ব্যক্তিত্বের উপর। রোম্যান্টিকদের ভাষাগত শৈথিল্য কিন্তু গেলো ঘুচে, উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে শৈলীয় অনবহিতি সযত্নে বর্জিত হ'লো। ক্লাসিসিস্টদের কাছ থেকে শেখা বাক্যবিন্যাসে চোস্ত বলিষ্ঠতা অটুট রইলো, এবং কাব্যকে আরও প্রকাশক্ষম করা হ'লো ভাষাগত সর্ববিধ শুচিবায়ু পরিত্যাগ ক'রে, শুঁড়িখানায় কথোপকথনের সঙ্গে রাজকীয় সালঙ্কার সম্ভাষণের নির্ভীক সমাবেশ ঘটিয়ে। এদিক থেকে লেক্ স্কুলের কবিদের চেয়ে এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য বেশি।

প্রতীকী কবিদের ভাষা ব্যবহারে যে-গুণটা সবচেয়ে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে তার অভূতপূর্ব নির্বাহুল্য। শব্দচয়ন এঁদের এতো নিখুঁত এবং বাক্যনির্মাণ এতো ঘন যে এলিয়টের পক্ষে সম্ভব হয়েছে আস্ত একখানি উপন্যাসকে "Portrait of a Lady"-র মতো ছোটো কবিতায় সন্নিবিষ্ট করা। এতোখানি ক্ষিপ্রগতির জন্য অবশ্য উল্লেখ ও উদ্‌ধৃতির সাহায্য প্রায়ই নিতে হয়, ইংরেজি এবং অন্যান্য প্রধান সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। ফলে কবিতার যে পূর্বতন প্রাঞ্জলতা ও অনায়াসবোধ্যতায় আমরা অভ্যস্ত

তা অনেক পরিমাণে অবলুপ্ত। কোনো-এক জনপ্রিয় মাসিকের সম্পাদক নাকি বিষ্ণু দে-র একটি কবিতার অর্থবিভ্রাটে প'ড়ে সেটাকে চারিদিক থেকে চৌষট্টিবার পড়েছিলেন। এই প্রশংসনীয় অধ্যবসায়টি বাহুল্য হ'লেও এটা সত্য যে, কোনো-কোনো ইংরেজ এবং বাঙালি কবির লেখা পড়তে গেলে রসানুভূতির আনন্দের সঙ্গে হেঁয়ালি ভাঙবার কৌতুক এবং কষ্ট একাধারে ভোগ করতে হয়। এঁরা বাহুল্য বর্জনের অজুহাতে সিনেমা-প্রযোজকদের cutting পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে কবিতার যেখানে-সেখানে কাঁচি চালিয়ে যান। সে ছেঁটে-ফেলা অংশগুলি পাঠককে নিজ গুণে পূরণ ক'রে নিতে হয়, নইলে বাঙলা কবিতাও তিব্বতী মন্ত্রের মতো শোনায়। এই পদ্ধতিকে আমি নিন্দার্হ বলতে চাই না, পাঠকের কাছ থেকে লেখক কিছু সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারে বৈকি। বিষ্ণু দে-র "ক্রেসিডা" বা "জন্মাষ্টমী"র মতো অর্থঘন কবিতায় এর চরিতার্থতা বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁরই কোনো-কোনো দুর্বল কবিতায়, এবং তাঁর অনুকারকদের অনেক কবিতায়, এর আতিশয্য লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই শোকাবহ হয়েছে।

রচনাভঙ্গিতে রোম্যান্টিকদের সঙ্গে প্রতীকীদের বৈষম্য যতো প্রকট হোক্, বিষয়ের দিক থেকে এঁরাও অন্তরাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পক্ষপাতী। তফাৎ বরঞ্চ এই যে এঁরা নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অধিকতর সজ্ঞান, নিজেকে নিয়ে আরও বেশি ব্যাপৃত। অনেক সময় এঁদের লেখা এমন একান্ত ব্যক্তিগত উপকরণের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে যে লেখক ও পাঠকের ভাব-বিনিময় প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। সিম্বলিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উইলসন্ লিখেছেন: "It is an attempt by carefully studied means—a complicated association of ideas represented by a medley of metaphors—to communicate unique personal

feelings." এই উপমাপুঞ্জের সাহায্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সাধারণের বোধগম্য অর্থ প্রকাশ করাকে প্রতীকী কবিরা অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। বরঞ্চ এঁদের বিশ্বাস যে কবিতার ধ্বনি ও রূপকল্পের সঙ্গে একটি শৃঙ্খলিত ন্যায়যুক্তিসঙ্গত অর্থ জুড়ে দিলে তার উপর অযথা ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়, বিশুদ্ধ আবেগ বহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য তার সংকুচিত করা হয়। "The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him : much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house-dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way : some of them assuming that there are other minds like their own, become impatient of this 'meaning' which seems superfluous, and perceive possibilities of intensity through its elimination." (T. S. Eliot)

সাধারণ অভিজ্ঞতার জগতের দিকে ভাষার সমাজ-প্রদত্ত আভিধানিক নির্দেশকে বিলুপ্ত ক'রে, ভালেরি, এলিয়ট্, য়েট্স্ প্রভৃতি তাঁদের কাব্যলোকের চারিদিকে একটি অখণ্ড শূন্যতা রচনা করেছেন : এর ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাও সম্ভব, তবে মার্ক্সের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যেই এর পূর্ণতর হদিস পাওয়া যায়। ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগে সংস্কৃতির অবকাশ ছিলো, প্রয়োজনও ছিলো। আজ তাকে আগাছার মতন ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। চিত্রে কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে লোকহিতৈষণায় সর্বত্র যে-প্রাণরসাধারা প্রবাহিত ছিলো তার উৎস শুকিয়েছে। ধনতন্ত্রী সমাজ এখন রুদ্ধগতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল। তার অন্তর্নিহিত সংকট

তাকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করেছে, আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সে আজ অস্ত্রসজ্জিত, মারণব্রতী। বাইরের যখন এই অবস্থা, য়েট্‌স্‌-এর ভাষায় যখন

The blood-dimmed tide is loosened, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned.

তখন যদি কবির বিভ্রান্ত দৃষ্টি আপন অন্তরলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও আবেগের রহস্যব্যঞ্জনায় ব্যাপৃত থাকে, তাহ'লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কোনো-কোনো কবিতায় এই 'পলায়নী' মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। তাঁর বেলায় কিন্তু সন্দেহ করবার হেতু রয়েছে যে তাঁর সমাজবিমুখতা সামাজিক কারণে নয়, স্বভাবজ। তাঁর মনের নির্মিতিই ভাবুক। 'অতএব', 'কিন্তু' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সংযোজিত পদবিন্যাস তাঁর কবিতায় আমরা প্রায়ই লক্ষ করেছি, এবং সবিস্ময়ে আনন্দবোধ করেছি যখন তিনি রসশাস্ত্রের দাবী ও অন্বীক্ষাশাস্ত্রের বিধি যুগপৎ অক্ষুণ্ণ রেখে স্বচ্ছন্দে কাব্য রচনা ক'রে গেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা আধুনিক যে-কোনো বাঙালি কবির তুলনায় গভীর এবং বাস্তব, কিন্তু অভিজ্ঞতার বিষয়ের চেয়ে অভিজ্ঞতার ভঙ্গিটাই তাঁর অনুব্যবসায়ী মনকে আকৃষ্ট করে বেশি। তবে সাম্যবাদের হাওয়া আজকাল এমনই বেগে বইছে যে তাঁর অন্তঃসলিল মননধারাও নিস্তরঙ্গ থাকতে পারেনি, নিজের স্বভাবের প্রতি বিদ্রোহ ক'রে বলেছে :

তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?

সুধীন্দ্রনাথের প্রতর্কোন্মুখ দৃষ্টি কিন্তু এই আসন্ন প্রলয়ের মধ্যে নবসৃষ্টির সূচনা দেখছে না, দেখছে শুধু

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অসার পটভূমি,
সবি সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি॥

বিষ্ণু দে-র চিন্তা এতোখানি আত্মকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু তাঁর সমাজ-বোধও নেতিবাচক, negative emotion-এর দ্বারা পরিচালিত। সমাজের চেতনা হয় তাঁর বিদ্রূপের সমস্ত শাণিত অস্ত্রগুলিকে উদ্যত ক'রে তোলে, নয় তাঁর অতি-আধুনিক অতি-সাবধানী মনের উপর গভীর বিরক্তি ও বিষাদের ছায়া ফেলে :

ভুলেছ কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় না কো শেষ,
প'ড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত রুক্ষ দেশ।
— নিয়ে যাবে বল কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে!
মিনতি আমার
যাত্রা কর রোধ।
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তি-দেশে, নব প্রতিভাসে
যাত্রা কভু যাবে না থমকি।

এই কবির রচনা ইতিমধ্যে আমরা যা পেয়েছি তার মূল্য কিছু কম নয়, কিন্তু এখনও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। তাঁর নিত্যনবপরীক্ষানিরত লেখনীর মধ্যে যে মহৎ কবিতার শুধু প্রতিশ্রুতি নয় অঙ্গীকার রয়েছে, তা তাঁকে অনেকাংশে এড়িয়েই চলেছে, সম্ভবত এইজন্য যে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এখনও কোনো অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দানা বাঁধেনি।

আমাদের দেশে যাঁরা সাম্যবাদী কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে একদল হচ্ছেন যাঁরা ভাব কিংবা ভঙ্গি কোনোদিক থেকে কবি নন। এঁরা যে-কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি ক'রে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনার বশেই কবিতা লিখছেন। এতে তাঁদের প্রোপাগ্যাণ্ডার কাজ কতোখানি হাসিল হয় বলা শক্ত, তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁদের সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে সন্দেহের

চোখে না-দেখে পারে না। অবশ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগকে বৃহত্তর অনুপ্রেরণার জন্য পথ ছেড়ে দিতে হ'তে পারে সে-সম্ভাবনার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে সাম্যবাদী দলে সমর সেনের মতো নিঃসন্দিগ্ধ কবিও রয়েছেন, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যকৌশল অত্যন্ত নির্বিকার বুর্জোয়া পাঠকদের কাছ থেকেও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে। এঁরা প্রায় বালক বয়সেই অনুকারকের দল সৃষ্টি ক'রে (সমর সেনের তো রীতিমত একটি স্কুল গ'ড়ে উঠেছে) আধুনিক বাঙলা কাব্যে আসন পাকা করেছেন। এঁদের সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু সিদ্ধি এখনও এতোটা নিশ্চিত নয় যে তাঁদের লেখা সম্বন্ধে—তথা সাম্যবাদী বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে—আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। হয়তো এঁরাই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবেন যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিচেতনা-সম্ভূত নয়, সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার জন্য কবির চাই শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, চাই ডায়লেক্‌টিক্‌ দৃষ্টি, চাই ইতিহাসের অর্থনীতি-মূলক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস।

আধুনিক বাঙলা কবিতা থেকে রোম্যান্টিক মনোভাব অন্তর্হিত এখনও নিশ্চয়ই হয়নি, তবে অন্তর্ধানের পথে চলেছে। পূর্বতন সমস্ত প্রথার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাই হালের ফ্যাশন। সে-ফ্যাশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না-ক'রে বুদ্ধদেব বসু উনিশ শতকের খেয়ালী সুরকে সাহস এবং কৃতিত্বের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অবশ্য বিশ শতকের রোম্যান্টিসিজম্‌ উনিশ শতকের ছায়ামাত্র হ'তে পারে না; যদি হয় তা হ'লে বুঝতে হবে যে, কবির ইন্দ্রিয় অসাড়, তাঁর মন অসংবেদনশীল। কবিতার প্রগতি সম্বন্ধে যতোই তর্ক উঠুক, তার পরিবর্তন অবিসংবাদিত। বুদ্ধদেবের খেয়ালী মনও তাই মাঝে-মাঝে বিংশ শতাব্দীর আত্ম-জিজ্ঞাসায় পীড়িত হয়, অমৃতস্য পুত্রদের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে ওঠে। তবে সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লব তাঁর

চিত্তকে স্পর্শ করলেও তেমন ক'রে অধিকার করেনি যেমন করেছে সুধীন্দ্র দত্ত কি বিষ্ণু দে-র চিত্তকে। Eternal verities নিয়ে ব্যস্ত থাকবার মতো মনঃসংকলন এখনও তাঁর রয়েছে। বিশেষ ক'রে, তিনি যে এখনও প্রেমের কবিতা লিখছেন এটা সৌভাগ্য ব'লেই গণ্য করি। বিষ্ণু দে-র সতর্কবাণী সত্ত্বেও, যে "প্রেমে পতন ছাড়া কিছুই নেই", আশা করি আমরা এখনও প্রেমে প'ড়ে থাকি। অথচ ঐ-কথাটা উল্লেখ করতে আধুনিক কবিরা ঘৃণা বোধ করেন, যদি-না ব্যঙ্গের গরজ থাকে। অবশ্য যে-সাহিত্য "সখি, কী পুছসি অনুভব মোয়", "সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু", "হে নিরুপমা", "বোলো, তারে বোলো", কিংবা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে সমৃদ্ধ, সে-সাহিত্যে প্রেমের কবিতার অকুলান আছে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তাই ব'লে কি ঐ-শব্দটা কাব্যসাহিত্য থেকে আজ একেবারেই নির্বাসিত হ'য়ে যাবে? সব জিনিষের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যখন আমরা বিশ্বাসী, তখন কেমন ক'রে বলতে পারি যে মানুষের প্রেম বৃত্তিটাই যুগে-যুগে অবিকল থাকে। নতুন কবিরা যদি নতুন ক'রে প্রেমের কবিতা না-লেখেন তা হ'লে আমাদের এ-কালের মনের কথা যে মনেই থেকে যায়, প্রকাশের আনন্দ পায় কেমন ক'রে?

১৩৪৭

আধুনিক কাব্যের সমস্যা : বিশ্বাস

সমস্যাটি বিশদ ক'রে বলবার দরকার নেই। সবাই জানেন যে সাম্প্রতিক কবিতায় এসেছে গণ্ডিবদ্ধতা, কোনো-কোনো স্থলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কারাবাস। কবি এবং তাঁর পাঠকের মাঝখানে অবোধ্যতা ও অবেদনীয়তার প্রাচীর উঠেছে, সে-প্রাচীরের উপর আবার ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। কবিতার, শুধু কবিতা কেন সমস্ত শিল্পকলারই, জন্ম হয়েছিলো ট্রাইবের সম্মিলিত অনুভূতির মধ্যে। সভ্যতার অনিবার্য গতিতে ট্রাইবের আদিম সাম্যতন্ত্র যখন বিভক্ত হ'লো শ্রেণীক সমাজের স্বার্থ-সংঘাতে, তখন গোটা সমাজের ক্ষেত্র থেকে কবিতার বিস্তার যদিও সংকুচিত হ'লো, তবুও শ্রেণীবিশেষের সমষ্টিচেতনার মধ্যে নিজেকে বিকাশ করবার শক্তি সে হারালো না। আজ সে-শক্তিও তার গেছে। বৃহত্তম সংখ্যার জন্য গভীরতম অভিজ্ঞতার প্রকাশ— টলস্টয়-কৃত এই শিল্পপ্রতিমানটিকে অক্ষরে-অক্ষরে উল্‌টো সাব্যস্ত করতেই আজকের শিল্পীরা উঠে-প'ড়ে লেগেছেন। অধুনাতন মূল্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ শিল্পী সে-ই যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কাছে সূক্ষ্মতম কলা-কৌশলের বাজি দেখিয়ে থাকে। শতকরা বাকি সাড়ে নিরানব্বই-জনকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, এবং অতি সূক্ষ্ম টেক্‌নিক্ যে অতি দক্ষ কলাবিদের কালোয়াতি ছাড়া আরও-কিছু ব্যক্ত করতে পারে এটা তার কাছে সেকেলে ঠেকে। লেখক এবং পাঠকের, আঙ্গিক এবং প্রসঙ্গের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য থেকে অলঙ্ঘ্য হ'তে চলেছে। নবীন সাহিত্যিকরা এ-বিষয়ে কী ভাবছেন তা সকলেরই জানা। আমার মতো যারা সাহিত্যিক নয়, নিন্দুক নয়, হতবুদ্ধি পাঠকমাত্র, তাদের দিক থেকেও সমস্যাটা ভেবে দেখার সার্থকতা আছে। ভেবে যে

সমস্যার সমাধানে পৌঁছেছি এমন স্পর্দ্ধা রাখবার মতো ভয়ংকরী অল্পবিদ্যা অবশ্য আমার নেই।

রোম্যান্টিক যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠ ও সিদ্ধকাম কবিদের সঙ্গে তুলনা করলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে আজকের কবিরা "অগ্রজের অটল বিশ্বাস" হারিয়েছেন। সে-বিশ্বাসের সরলতা জীবনের জটিল পথে তাঁদেব সহায় ছিলো কি অন্তরায়, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খেতো কি খেতো না, এ-সব আপাতত অপ্রাসঙ্গিক। তা ছাড়া এমনতরো প্রশ্ন মনে অংকুরিত হওয়া মানেই এই যে বিশ্বাস সেখানে শিকড়সুদ্ধ শুকিয়ে মরেছে। কোনো তর্ক না-তুলেও এটুকু অবশ্য বলা যায় যে সে-বিশ্বাস অগ্রজদের কলাসৃষ্টিকে তাজা ও প্রাণবন্ত ক'রে রেখেছিলো। সংশয়ের ঝড়-ঝাপ্‌টা বুকে ক'রে অকূল সাগর পাড়ি দেওয়ার সর্বনাশা দুঃসাহস দার্শনিকেরই স্বভাবধর্ম; শিল্পসৃষ্টির পক্ষে এ-অবস্থাটা কিন্তু অনুকূল নয়। একেবারে অবিশ্বাসী মন যে একেবারে রসবর্জিত, অনুর্বর। বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ কিনা সে-বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা আমার মতো অহিন্দু আর অভক্তের মুখে মানায় না. কিন্তু বিশ্বাসে যে কৃষ্ণের বাঁশি মিলয় কাব্যের ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

> ঘুণ-ধরা হাড়ে যেন লাগে
> উঞ্ছ-পুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ।

এটা হ'লো অভিমানের কথা। "জ্যেষ্ঠ"দের উপর যতোই রাগ হোক্, আর ব্যঙ্গোক্তিটাতে যতোই শান দেওয়া থাক্, এই আত্মচেতন কবি স্বীকার না-ক'রে পারেননি যে তাঁর সমসাময়িক কবিতার শুক্‌নো হাড়ে ঘুণ ধরেছে।

ইংরেজি সাহিত্যের পটে সংশয়ের ছায়া পড়েছিলো অনেকদিন আগেই, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি। টেনিসন আর আর্নল্ডের কবিতায় তার বিক্ষোভ অভিব্যক্ত। এ দু-জন কবির মনীষা ও চারিত্র্য

কিন্তু মূলত আস্তিক, শৈশব-শিক্ষার গুণে, দেশ-কালের চাপে আস্তিক না-হ'য়ে তাঁদের উপায় ছিলো না। সে-আস্তিকতার সমতল ভূমিতে মাঝে-মাঝে সন্দেহের পাথর উঁচিয়ে উঠেছে, মাঝে-মাঝে নৈরাশ্যবাদের ফাটল ধরেছে, তাতে ক'রে মেঝেটা জখম হয়েছে কিন্তু একেবারে ক্ষ'য়ে যায়নি, এবং তার উপর বিশ্বনিরীক্ষার যে-ইমারতটি খাড়া ছিলো তা পড়ি-পড়ি ক'রেও শেষ পর্যন্ত টি'কে রইলো। আর্নল্ড যদিও দেখলেন বিশ্বাসের সপ্তসাগর যাচ্ছে শুকিয়ে, শুনতে পেলেন ধাবমান তরঙ্গের ক্লান্ত গর্জন :

Retreating, to the breath
Of the night wind, down the vast dges drear
And naked shingles of the world.

কিন্তু হারানো বিশ্বাসের অসীম সমুদ্র যতোই তলিয়ে যাক্, কবির অন্তর তার অদৃশ্য তটরেখার নাগাল পায়, কখনো-বা "রাত্রির তারাভরা নিস্তব্ধতায় দূরাগত মৃদু মর্মরধ্বনি" কানে এসে বাজে, "বিষাদের গুরুভার মুহূর্তের জন্য হাল্কা" হ'য়ে যায়। টেনিসন অন্তরতম বন্ধু হ্যালামের অকালমৃত্যুতে আত্মহারা হ'য়ে যদি-বা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভাবলেন :

A monster then, a dream,
A discord. Dragons of the eprime
That tear each other in their slime—

কিন্তু শোকের তীব্রতা উপশমিত হ'লে তাঁর দুঃস্বপ্ন গেলো কেটে, স্মারণিক কাব্যের শেষ স্তবকে তিনি নিঃসংশয়ে জানলেন যে যাবতীয় সৃষ্টি ছুটে চলেছে এক পরমার্থ দিব্যধামের অভিমুখে, যেখানে আছে প্রেম এবং প্রেমের ঈশ্বর এবং সে-ঈশ্বরের শাশ্বত সুন্দর বিধান! এই জ্যেষ্ঠ কবিদ্বয়ের কাব্যময় ভঙ্গুর নাস্তিকতার সঙ্গে আধুনিকদের রূঢ় নিরেট নাস্তিকতার কোনো তুলনা হয় না।

আধুনিক য়ুরোপের সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হচ্ছে প্রাকৃতবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতবিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রখর সাফল্য ঘটেছিলো সেই সপ্তদশ শতকে, যাকে প্রতিভার শতক ব'লে অভিহিত করা হয়। স্বভাবতই প্রতিভা প্রায় সবক'টাই বৈজ্ঞানিক। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে দেখা গেলো যে এই নববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নির্দ্বন্দ্ব, এবং এতোদূর সর্বময় যে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক চিত্তেও একধরনের বৈজ্ঞানিক মনোভাব পরিশ্রুত হ'য়ে পড়েছে। সে-মনোভাবের গোড়ার কথা এই যে জড়প্রকৃতি জীব-জগৎ মানবসমাজ সর্বত্রই এক অখণ্ড নিয়মের রাজ্য, সমস্তই সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত। সেই সজ্জাই যেন তখনকার আর্টে বর্তেছে, বিষয়-বস্তুকে করেছে কেতাদুরস্ত, আঙ্গিক হয়েছে ছাঁচে-ঢালা এবং প্রথা-সম্মত। এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে পদার্থবিজ্ঞানের ফল না-ব'লে তার মূল বলাই সঙ্গত। হিউমের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বেরিয়ে পড়লো যে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস বিশুদ্ধ যুক্তির সূত্র ধ'রে প্রমাণিত হয় না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ও তার কোনো ভিত্তি নেই। ওটা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নয়, স্বীকার্য (postulate) মাত্র। ওয়াইট-হেড মনে করেন, এ-বিশ্বাস মধ্যযুগীয় ভগবৎ বিশ্বাসেরই রূপভেদ, যুগধর্মের তাগিদে পরলোক থেকে ইহলোকে নেমে এসেছে মাত্র। সে যা-ই হোক্‌, অষ্টাদশ শতকের ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যেও দেখা যায় এই বিশ্বাসের মৌল প্রেরণা। এই মাপাজোখা বাঁধাছাঁদা তালকে আশ্রয় ক'রে সে-সাহিত্যের ধ্রুপদী চাল সম্ভব হয়েছিলো। অভিজ্ঞতা বা যুক্তির ভূমিতে এ-বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করলেও হিউম্‌ তাকে টলাতে পারলেন না শিক্ষিত জনসাধারণের চিত্ত থেকে, নব-বিজ্ঞানের দীপ্তিচ্ছটা তখন চোখে ধাঁধা লাগিয়েছিলো। হিউমের ভূত কিন্তু বিজ্ঞানের কাঁধে চেপেই রইলো। উনবিংশ শতকের গোড়াতে যখন কতকটা অভ্যাসের ফলে, কতকটা হিউম্‌-কাণ্টের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায়, বিজ্ঞানের চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য

ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে, রোম্যান্টিক ভাবালুতার প্রবল বন্যা তাকে পাশ কাটিয়ে সাহিত্যকে অন্য খাদে বইয়ে নিয়ে গেলো। বিংশ শতাব্দীতে বের্গসঁ দুর্বিনীত বিজ্ঞান-মানসিকতাকে শায়েস্তা করলেন আর-একদিক থেকে, প্রাণ এবং মনের ক্ষেত্রে গাণিতিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যর্থতার ঢাক পিটে। আরো কয়েক বছর পরে এলেন এডিংটনের মতন আত্মশুদ্ধিপরায়ণ পদার্থবিৎ, ফলে পদার্থবিজ্ঞান তার বহুবিস্তৃত নিয়মানুবর্তিতার জালটাকে নিজের তরফ থেকে এবং নিজের গরজেই গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। প্রকৃতির অখণ্ড যন্ত্ররূপকে এখন বৈজ্ঞানিকেরা স্বয়ং অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন। সাহিত্যিকরা তো উনিশ শতকেই তার কায়েমী স্বত্বের বিরুদ্ধে নালিশ জুড়েছিলেন, এবার তাকে সাহিত্যের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বেদখল করা হ'লো।

রোম্যান্টিসিজমের পেছনে ছিলো স্বভাব-চালিত মানুষের, অর্থাৎ আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কৃত্রিমতা থেকে শৃঙ্খলমুক্ত মানুষের শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছার উপর আস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধনবৈজ্ঞানিকরা অবশ্য আগেই দেখিয়েছিলেন যে মানুষের মূল প্রবর্তনা হচ্ছে স্বার্থসিদ্ধি, পরহিতৈষণা নয়। তবে ধ'রে নেওয়া হয়েছিলো যে নতুন সমাজব্যবস্থা যদি সামন্ততান্ত্রিক সমস্ত বাধাবিঘ্ন সরিয়ে ফেলে মানুষমাত্রেরই অর্থলাভের পথকে সুগম ক'রে দেয়, তা হ'লে প্রত্যেকের স্বার্থসন্ধানের ফল হবে এই যে প্রত্যেকেই নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকৃতিদত্ত দাবী মিটিয়ে নিতে পারবে, নালিশের কোথাও কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। এ-ভুল ভাঙলো অল্পদিনে এবং নিদারুণভাবে। রোম্যান্টিক সাহিত্য যখন প্রকৃতি ও মানব-বন্দনায় কলগুঞ্জরিত সেইসময়ে ইংলণ্ডে দেখা দিলো বড়ো-বড়ো কলকারখানা, দেখতে-দেখতে দেশটাকে ছেয়ে ফেললো। দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে গিয়ে আটকা পড়লো, বাকি পনেরো আনা লোক এক মুঠো অন্নের জন্য তাদের শেষ সম্বল শ্রমশক্তি বেচে ফেলে

ক্রীতদাসের অধম হ'লো। ১৫-১৬ ঘণ্টা ক'রে খাটিয়ে ঠিক কয় ছটাক ক'রে খেতে দিলে এবং কয় মিনিট ক'রে জিরোতে দিলে ধড়ে প্রাণটা থাকে—অনেকখানি হিসেবী বুদ্ধি খরচ ক'রে কারখানার মালিকেরা তার নিখুঁৎ ব্যবস্থা করলেন। 'যে যার পথ দেখবে' নীতির এই ভয়াবহ পরিণাম লক্ষ ক'রে মহদাশয় ব্যক্তিরা বিচলিত হলেন কিন্তু মনুষ্যধর্মে বিশ্বাস হারালেন না। মরিস, ওএন প্রভৃতি রামরাজ্যের প্রত্যাশীরা ঠাহর করলেন যে আর-কিছু নয় এখন দরকার শুধু সর্বগ্রাহ্য একটি আদর্শ উদ্‌ভাবন করা, এবং সবাইকে সমঝিয়ে দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বজনের কল্যাণে নিয়োগ করবার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপায়টা কী। আদর্শ উদ্‌ভাবিত হ'লো, উৎসাহী ব্যক্তিরা উপায়ের ব্যাখ্যা ও প্রচারে মেতে উঠলেন। সে-প্রচার কেন ব্যর্থ হ'লো, এবং শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে কেন তা বারে-বারে ব্যর্থ হ'তে বাধ্য—এই হ'লো মার্কসিজমের গোড়ার কথা। মানবতন্ত্রবাদ অনেকদিন যাবৎ ভাবুক ও কর্মীর কল্পনাকে রঙিন ক'রে রেখেছিলো, ঐতিহাসিক জড়বাদের মধ্যে তার অবসান ঘটলো। মার্কস্‌ যদিও ইচ্ছাশক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেননি, তবু তাঁর জড়বাদে সে-ইচ্ছার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, ধনবিজ্ঞানের অন্ধ অব্যর্থ বিধানগুলিই সেখানে মৌলিক ও চরম। মানুষের শুভ সংকল্প কোনো সামাজিক বিপ্লব বা বিবর্তন উদ্রিক্ত করতে পারে না, প্রতিহতও করতে পারে না, বড়ো জোর পারে শুধু তার গতি শ্লথ বা দ্রুত ক'রে দিতে। অথবা মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌সের কথাটাকে এইভাবেও নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের মনে এমন সংকল্প জাগতেই পারে না যা জড়প্রকৃতির কোনো-একটি ঘটনা-সমাবেশের ছায়াপাতমাত্র নয়। হরে-দরে একই কথা। অর্থাৎ মানবকল্যাণ সাধিত হবে ভৌতিক নিয়মের অন্ধ অনুবর্তনায়, মহানুভবেরই প্রেরণায় নয়। এ-মতবাদের সত্য-মিথ্যা নিয়ে কোনো নৈয়ায়িক তর্ক ফাঁদতে চাই না, এ-ও মেনে নিতে প্রস্তুত আছি যে

বর্তমান সমাজের নিদারুণ অনাচার ও অব্যবস্থা ভেঙেচুরে সমাজটাকে নতুনভাবে গড়তে হ'লে আমাদের মার্কসের কাছেই দীক্ষা নিতে হবে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করবার যতোটা শক্তি ছিলো আদর্শবাদী হিউম্যানিজমের, জড়শক্তিবিলাসী মার্কসিজমের কি তা আছে?

হিউম্যানিজমের পরিপন্থী হ'লেও, এবং প্রচলিত সমস্ত ধর্মকে জনগণের মৌতাত ব'লে বরখাস্ত ক'রে দিলেও মার্কস্-ভক্তদের নিজস্ব একটি ধর্মবিশ্বাস গ'ড়ে উঠেছে। সে-বিশ্বাসের তেজ বহুকাল পূর্বের জেস্যুইট্‌দের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজকের মুমূর্ষু সাহিত্যকে নবজীবন দান করতে কি সে অপারগ? অপারগ কিনা বিচার করবার সময় এখনও আসেনি, মার্কস্-পন্থী সাহিত্যের এখনও কাঁচা বয়স, ভাবে-ভঙ্গিমায় বয়ঃসন্ধির আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে আরও কিছুদিন লাগবে তার। সে-সাহিত্য যে সাহিত্যের মরুভূমি হবে না এটুকু অবশ্য বলা যায়, কারণ তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তবে ফণিমনসার জঙ্গলে ভ'রে না-যায় সেদিকে নজর রাখা আবশ্যক। আশংকার একটু কারণ এই যে মার্কস্‌বাদীদের যে-প্রেরণা আপাতত সবচেয়ে প্রবল সেটা নেতিবাচক, বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এর অত্যাবশ্যকতা তর্কাধীন নয়, কিন্তু সাহিত্যিক ফলাফলটা বিবেচ্য। Bourgeous, fascist, spy বিদেশী শব্দের সঙ্গে বর্বর গুণ্ডা ভাড়াটিয়া প্রভৃতি খাঁটি স্বদেশী পদ যোগ ক'রে যে-যোগফলটা গদ্যে পদ্যে ও গানে পাইকিরি চালান দেওয়া হচ্ছে, অন্তত বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা বিয়োগান্তই হয়েছে। আশংকার আরও-একটু কারণ আছে। মার্কস্‌বাদের যে-দিকটা ইতিবাচক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হাঁ-ধর্মী, সেটা এতো নির্বস্তুক এবং শব্দাড়ম্বর-বহুল, হেগেলের উৎকট দার্শনিকতায় এমন সমাচ্ছন্ন যে কোনোদিন যে তার উৎস থেকে শিল্প-সাহিত্যের প্রাণরসধারা প্রবাহিত হবে

এ-কথা ভাবা শক্ত। দার্শনিক বিচারে তা টিঁকতে পারে না, সাহিত্যিক প্রয়োজনে লাগবার সম্ভাবনা তার নেই—তবে সে বেয়নেট্ হাতে চার্জ করবার সময়ে নিগেশন অফ্ নিগেশন ব'লে হাঁক পাড়লে বিপ্লবী সেনা বুকে প্রাণ তুচ্ছ-করা বল পায়। আমি ডেস্ক্‌লোকের অধিবাসী যুদ্ধক্ষেত্রের মনস্তত্ত্ব ভালো বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি যে হেগেল্‌কে ডিগবাজী খাওয়াবার জন্য সাম্যতন্ত্রব্রতীদের এতো মাথাব্যথা মাথার নিদারুণ অপপ্রয়োগ। ও-কথাটা পেশাদার দার্শনিকের অবসর-বিনোদনের জন্য ছেড়ে দিলেই ভাল হ'তো। মার্কসের মতবাদ যখন বায়ুর উপরিস্তর থেকে কঠিন ভূমিতলে নেবে আসবে, আমাদের দেশেও সোবিয়েত য়ুনিয়নের মতন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে এক নতুন নিঃশ্রেণীক সভ্যতা চোখের সামনে রেখায়-রেখায় ফুটে উঠবে, তখন আমাদের বামপন্থী সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই এমন-একটি প্রেরণার উৎস খুঁজে পাবেন যা ধনাত্মক (positive) ও মূর্ত (concrete), যার তেজ শুধু পুরাতনের ধ্বংসস্তূপে আগুন লাগাবার জন্য নয়, যা নতুন এবং মহানের জ্যোতিতে চিত্তকে উদ্‌ভাসিত করবে। ততোদিন প্রগতির সাহিত্য যদি সাহিত্যের পশ্চাৎগতিই হয় তাতে বিচলিত হবো না, ফাঁকা বুলি ও ঠাসা গালিগালাজের মধ্যেও সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শে রুচি স্থির রাখবো।

মধ্যযুগের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত দানা বাঁধছিলো আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মের চারিদিকে। অঙ্গসৌষ্ঠবে অতুলনীয় অনেক গির্জের চূড়া তৎকালীন স্থাপত্যের উৎকর্ষ য়ুরোপের নগরে-নগরে আজও ঘোষণা করবে, কিন্তু সে-চূড়াগুলি যে উত্তুঙ্গ প্রতাপের প্রতীক ছিলো তা আজ ধূলিবিলীন। মানুষের, টমাস একুয়াইনাসের মতো অনন্যসাধারণ মেধাবী মানুষেরও, বুদ্ধিবিচারকে শিকলে বেঁধে সেদিন ধর্মের পরাক্রম হয়েছিলো নিরংকুশ দিগন্তব্যাপী। রাজশক্তির স্বাজাতিক রূপান্তর এবং প্রজ্ঞাশক্তির মানবিক উদ্বোধনের সম্মিলিত অভিঘাতে কেমন ক'রে সেই

পরাক্রম দিনে-দিনে ক্ষয় পেলো, তার ইতিহাস রেনেসাঁসের প্রথম উন্মেষ থেকে ডারুইনের বিবর্তনবাদ পর্যন্ত পরিকীর্ণ। ধর্মানুষ্ঠানিক শাসনকে সমাজে পাকা করতে হ'লে মনের উপর তার ভিৎ মজবুত ক'রে গড়া দরকার। তাই কতকগুলি শাস্ত্রীয় মতবিশ্বাসকে নানা কৌশলে শতাব্দীর পর শতাব্দী অটল ক'রে রাখা হয়েছিলো। রেনেসাঁসের চিত্তজাগরণের পর এই সমস্ত প্রাচীন ডগ্‌মার সঙ্গে নবীন দর্শন-বিজ্ঞানের হাতাহাতি বেধে গেলো। ডারুইনিজমের সঙ্গে ডগ্‌মার যে যুদ্ধ সেইটাই বোধহয় য়ুরোপের রণক্ষেত্রে তার শেষ যুদ্ধ, পরে ডারুইনের তত্ত্বটাকে হাত করবার যে-ফন্দি চার্চের পক্ষ থেকে পোল প্রভৃতি করেছিলেন তা অত্যন্ত হাস্যকর। নববিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম-চিন্তার গরমিল যতোটা নিরবচ্ছিন্ন, দর্শনের সঙ্গে ততোটা নয়। দার্শনিকরা দু-পক্ষেরই যোদ্ধা। শাস্ত্রানুমোদিত বিশ্বাস, বিশেষত ভগবানে বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শুধু যে ধর্মব্যবসায়ীরাই চেষ্টার ত্রুটি করেননি তা নয়, দেকার্ত, লাইবনিৎস্, বার্কলি, এমন-কি কাণ্টের মতন বিশুদ্ধ দার্শনিকরাও ভগবানকেই তাঁদের দর্শন-সাধনার লক্ষ্য ও কেন্দ্র করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিজ্ঞানকেও ধর্মের তল্পি-বরদারীর কাজে লাগতে দেখা গেলো। এডিংটন সমগ্র পদার্থবিজ্ঞানকে কতকগুলি pointer reading ও পুনর্বাদী (tautologous) গাণিতিক সমীকরণে পর্যবসিত ক'রে ইহলোক-পরলোকের মাঝখানে ইন্টুইশানের পথটাকে প্রশস্ত করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। ইন্টুইশনের পথ অবশ্য ডগ্‌মা থেকে বহু দূরে, এবং এডিংটন স্বয়ং কোনো শাস্ত্রীয় ধর্মের পক্ষপাতিত্বে অস্বীকার করেন। তাঁর ওকালতিটি কবিসুলভ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানের দিকেই। তবে কিনা দেখা গেছে যে বাইরে থেকে ধর্মানুষ্ঠানের চাপ যদি আল্‌গা হ'য়ে যায় এবং ভিতর থেকে শাস্ত্র-বিশ্বাস ভেঙে পড়ে, তা হ'লে মিস্টিকের ইন্টুইশনও সে মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে বাড়বার পথ পায় না। সেইজন্য বুঝি এলিয়ট্

আজ এ্যাংলো-ক্যাথলিক, য়েট্‌স্‌ কেল্টিক পুরাণে মশগুল। সে যা-ই হোক্‌-না কেন কোনো-কোনো দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের সহ-যোগিতা সত্ত্বেও একালের যুগধর্মের সঙ্গে সেকালের রিলিজন্‌কে আর কিছুতেই খাপ খাওয়ানো গেলো না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরতা প্রভৃতি চিরন্তন বিশ্বাসগুলি মানবচিত্ত থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে চললো। তারই প্রথম বিক্ষুব্ধ চেতনা টেনিসন ও আর্নল্ডের কবিতায় স্বাক্ষরিত।

ভগবান এবং ভগবৎপ্রেম যখন কাব্যের নাগালের বাইরে চ'লে গেলো তখন অনেকের মনে হয়েছিলো যে নিতান্ত ঐহিক মানবপ্রেমই তার জায়গা জুড়বে, জীবনকে এবং সাহিত্যকে নিরাত্ম্য শূন্যতার গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাতেও কিন্তু বাদ সাধলো বিজ্ঞানের নবতম শাখা মনস্তত্ত্ব। মনের আসংজ্ঞাত স্তর ছাড়া তার তলায়-তলায় অসংজ্ঞাত ও অজ্ঞাত স্তরগুলিও খুঁজে বের করলেন ভিয়েনিজ স্কুলের চিকিৎসকরা। খুঁজে বের করলেন বলাটা তথ্যের অপলাপ হচ্ছে, বলা উচিত এই স্তরগুলির অস্তিত্ব ধ'রে নিয়ে কতকগুলি মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির ব্যাখ্যা এবং চিকিৎসা করতে সক্ষম হলেন। অবচেতন মনের শুধু অস্তিত্বই স্বীকৃত হ'লো না, তার স্বরূপ সম্বন্ধে নানারকম এলোপাথাড়ি গবেষণা চললো এবং শেষ পর্যন্ত তার যে ছক্‌টা তাঁরা সর্বসাধারণের কৌতূহলী চোখের সামনে এঁকে ধরলেন তা যেমন তাক্‌ লাগানো তেমনি পীড়াদায়ক। সে-ছবির অনেক অংশকে প্রামাণ্য মনে করা এখনও অবৈজ্ঞানিক, তবু মোটের ওপর শিক্ষিত-মণ্ডলীর মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হ'লো যে সেক্স আর প্রেম পরস্পরের মধ্যে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ও-দুটিকে একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ বললেই হয়। শেলি কিংবা রবীন্দ্রনাথ প্রেম সম্বন্ধে যে অশরীরী প্রায় অবাঙমনসগোচর ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে রেখেছিলেন তা যেন এই মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এক ফুঁয়ে উবে

গেলো। উবে যাওয়ার সঙ্গত কারণ হয়তো ছিলো না, তবু অনেক পরিমাণে উবে যে গেছে এটাই হ'লো তথ্য। অত্যন্ত নব্যতান্ত্রিক কবিরা প্রেমের ধার দিয়েও যেতে চান না, যদি-বা যান আড়ভাবে কথা বলেন, সে-কথার পেছনে বাঁকা অংকুশের মতো ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে—সবসময়ে প্রচ্ছন্নও থাকে না। অল্ডস্ হকস্লির গোড়ার দিক্‌কার উপন্যাসগুলি ফ্রয়েড-চালিত মুদ্গর দ্বারা মোহভঙ্গের ঝাঁঝালো প্রতিচ্ছবি। এতোটা ঝাঁঝালো যে মনে হয় উল্‌টো দিকেই বুঝি লেখকের মোহ জ'ন্মে গেছে।

অবিশ্বাসের মরুভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কখনো আধুনিকদের মতো পদক্ষেপ করতে বাধ্য হননি। যদি হতেন তাহ'লে তাঁর কাব্যের অফুরন্ত শ্যাম-সমারোহের কতোটুকু অবশিষ্ট থাকতো? এলিয়ট্ এই মরুভূমিকে কাব্যে অমর করলেন, কিন্তু সেখানে তিষ্ঠতে পারলেন না, ফিরে গেলেন ক্যাথলিক ধর্মের ছায়াতরুতলে। য়েট্‌স্ মরুভূমির মাঝখানে এক ওয়েসিস্ রচনা করলেন নানা দেশ-কাল থেকে আখ্যান-পুরাণের শান্ত শীতল ফল্গুধারা বইয়ে এনে: "I had made a new religion, at most an infallible church of poetic tradition, of a fardel of stories and of personages and of emotions,…I had even created a dogma." য়েট্‌স্ বা এলিয়টের মতন এতোটা ব্যক্তিগত খামখেয়ালী পথে সর্বজনীন কাব্য-সমস্যার নিরাকরণ হ'তে পারে না; আধুনিক কালের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় প্রাচীন যুগে পালানো নয়, আধুনিকতর যুগে এগোনো।—ভবিষ্যতের সাহিত্য আপন প্রাণরসের নির্ঝর খুঁজে পাবে কোন নবমহানুভবের শিলাবেদীতলে, কোন যুগচৈতন্য শিখরের গলিত তুষারে, তার নির্দেশ দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। হয়তো-বা ভূয়োদার্শনিকতা-বিবর্জিত এবং মানবধর্মে আস্থাবান সাম্যতন্ত্রের মধ্যেই, হয়তো-বা মনোবিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত পথ ধ'রে অন্তরাকাশের যে নতুন

দিগন্ত আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে, তারই বালার্কলেখায়। পদার্থবিজ্ঞানের কথা তুলছি না, কারণ পদার্থবিজ্ঞান ইতিমধ্যেই চিন্তার স্বাভাবিক রাজ্য প্রায় ত্যাগ ক'রে সাঙ্কেতিক জালে নিজেকে পাকে-পাকে জড়িয়েছে। অসম্ভব নয় যে উচ্চাঙ্গ গণিতের মতন মনের উপর থেকে তার প্রভাব (জীবনের উপর থেকে নয়, কেননা ফলিত পদার্থবিজ্ঞান তো রইলোই) ক্রমশ মিলিয়ে যাবে। এমনও হ'তে পারে যে মানুষ তার হৃতবিশ্বাস আর ফিরে পাবে না, তার উদ্বাস্ত জিজ্ঞাসা অরণ্যে-পর্বতে-প্রান্তরে শুধু ঘুরে বেড়াবে, কোনো পত্র-নিবিড় উপত্যকায় গিয়ে বলতে পারবে না যে এই তার আপন দেশ, এরই শ্যামতৃণস্পর্শে আছে বিশ্রামের আমন্ত্রণ। তবে কি কাব্যের ঐতিহ্যে এইখানে পূর্ণচ্ছেদ পড়লো; আধুনিক কবিতার মরুযাত্রী কারওয়ান রওনা হ'লো চিরাগত কাব্যের সেই প্রান্তসীমানা থেকে যেখানে এসে তার শ্যামলিমা নিঃশেষ হয়েছে, তার প্রাণপ্রবাহ চির-কালের মতো শুকিয়ে গেছে?—

বনকীর্ণ শ্যামল রুদ্র কম্পিত তরঙ্গ
—তোমার পটদূরান্তে হল লীন।
ছিল ঝর্নার প্রাণমঞ্জীর বাহিনী
নেই নেই।

কিন্তু একে মরুযাত্রাই বা বলি কেমন ক'রে। আগের শ্যামলতা, আগের কোমলতা যদি হারিয়ে থাকে কবিতা, তার বদলে সে এমন-কিছু পেয়েছে যা তপ্ত বালির মরীচিকামাত্র নয়। কোমলতা হারিয়ে সে পেয়েছে মাংসপেশী, দৃঢ় নির্ভীক অঙ্গসঞ্চালন-শক্তি। হৃতশ্বাস কবিরা কিছুকাল ধ'রে বক্তব্যের কথা ভুলে কেবল আঙ্গিকের তাল ঠুকতেই ব্যস্ত। ব্যাপারটা দেখতে শোভন হয়নি, এবং এই দাঁও কষাকষির ফল অন্তত বাঙলা সাহিত্যে এই হয়েছে যে কবিতা পড়বার আগ্রহই লেখকের মন থেকে নির্মূল হ'য়ে গেছে। আধুনিক কবিতা

লেখে না অথচ পড়ে, এবং প'ড়ে গালাগাল দেওয়া ছাড়া অন্য-কোনো প্রতিক্রিয়া মনে জাগে, এমন সংজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি আমি একজন --সম্ভবত একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; তবে আঙ্গিকের উপর ঝোঁকটা একেবারে ব্যর্থ যায়নি। আগেই বলেছি তাতে ক'রে কবিতাকে মাংসপেশল করেছে। তাছাড়া ইনিয়ে-বিনিয়ে পাতার পর পাতা টেনে নিয়ে কাব্যবস্তুকে পাৎলা ক'রে দেওয়ার বিরুদ্ধে আধুনিকতার বিধান কড়া। অত্যন্ত চোখা শব্দের অন্বেষণ, সবচেয়ে লাগসই উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ, যে-বাক্য বাদ দিলেও ব্যঞ্জনা খণ্ডিত হয় না তাকে কেবল পদলালিত্যের খাতিরে কবিতায় জায়গা না-দেওয়ার সংকল্প, এ-সব দিকে মনোযোগ প্রখর হওয়ার ফল যে শুভ তাতে সন্দেহ নেই। তবে লেখক এবং পাঠক উভয়পক্ষে তা এখনও অনভ্যাসের ফোঁটা।

আধুনিক কবিতায় আশ্বাস রাখবার আরও-একটি কারণ দেখতে পাচ্ছি। উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত কাব্যের পরিধি ছিলো সংকীর্ণ, প্রেম ভগবৎ-ভক্তি প্রকৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস এইধরনের চিরন্তন ও চিরাগত কয়েকটি হৃদয়াবেগের মধ্যে আবদ্ধ। সে-পরিধির বেড়া আজ ভেঙেছে। এমন-কিছু নেই যা এখন কাব্যের ভোজে অপাঙক্তেয়। বিশেষ ক'রে লক্ষ করবার কথা এই যে কবিতা আজ বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের সীমানাও ছাড়িয়ে যেতে প্রস্তুত। যাকে বলা যায় মানবিক প্রসঙ্গ তার সঙ্গে কবির ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্পর্ক ঘুচেছে। অবশ্য সাংখ্য-বেদান্তের তত্ত্বের প্যাঁচ কিংবা রাজনীতির অনুজ্ঞাকে কাব্যের পাতমোড়া দিয়ে পরিবেশন করবার চেষ্টা আজ হাস্যকর। কিন্তু আমাদের এমন-কোনো চিত্তজাগরণ বা বিশ্বনিরীক্ষা, যার মধ্যে চিন্তা ও বেদনা সমানে মিশেছে, যাতে কর্মপ্রেরণারও সঙ্গম ঘটেছে, কবিতায় তার সম্যক্ প্রকাশের পথ উনবিংশ শতকের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত হয়েছে আজ। অর্থাৎ মানুষের ভগ্নাবশেষ নিয়ে কবিতা আর ক্ষান্ত নয়, সম্পূর্ণ মানুষের সঙ্গে তার কারবার পাতা হ'লো।

এতোক্ষণ কবিতা বলতে লীরিক কবিতাই বুঝেছি। এই লীরিকের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ড্রামা এবং এপিকের বিশালতা ও বৈচিত্র্য আনতে চান এ-যুগের কবি। অপরপক্ষে আটপৌরে জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাবনা-বেদনা তাতে স্থান পেয়েছে, সামাজিক অর্থ-নৈতিক পরিবেশের অনেক-কিছু যা এতোদিন অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ছিলো তাকে জাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই একদিকে যেমন লীরিকে আসছে মহাকাব্যের বিশালতা, অন্যদিকে তেমনি প্রবেশ করছে উপন্যাসের প্রাত্যহিকতা।

কবিতা আজ সমস্ত গতানুগতিক সীমানা ছাড়িয়ে চলেছে। তার এই দৃপ্ত অভিযান সম্বন্ধে শেষ বিচার করবার দিন এখনও আসেনি। সিদ্ধি নয়, সাধনাই এখনও তার সামনে রয়েছে। আধুনিক কবি যেন পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক, পরীক্ষা চলছে নানা রাসায়নিক উপাদানের—ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির, সমিল ও অমিল পঙক্তির, উদ্ধৃত খণ্ডিত ও বিপর্যস্ত বাক্যের, আচম্‌কা উপমার, আজগুবি অনুষঙ্গের, অনভ্যস্ত প্রতীকের। এবং সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা চলছে সেই কবিতালক্ষ্মীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য যাকে শুধু কল্পনা ও অনুভূতির মধ্যে পেলেই পাওয়া শেষ হবে না, যাকে আমরা বলবো :

হ্বয়ামি তে মনসা মন
ইহেমান্ গৃহান্ উপজুজুষাণ এহি।

১৩৫০

সাহিত্যে যৌনপ্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ

নালিশ শোনা যায় যে মানিক বাঁড়ুয্যের সাম্প্রতিক লেখায় সেক্স এবং সেক্স-ঘটিত মনোবিকারের বড়ো বাড়াবাড়ি। কথাটা যদি বাজারে চল্‌তি বা চল্‌তি হবার উমেদার কোনো লিখিয়ে সম্বন্ধে উঠতো তাহ'লে ভাববার কিছু ছিলো না। উপন্যাস যতো পান্‌সেই হোক্ তাকে চালু করবার সহজ অথচ অমোঘ উপায় হচ্ছে সেক্সের ঝাল-মসলাটা বেশ ক'রে মাখিয়ে দেওয়া ; তাতে সাহিত্য-রসিকের মুখে যদি না-ও রোচে, বেরসিক হাজারও পাঠকের জিভে জল আসবে। অথবা ধ'রে নিতে পারতাম যে খোদ্ লেখকের মনটাই বিকারগ্রস্ত। কিন্তু 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কিংবা 'সহরতলী'র রচয়িতাকে তো এতো সহজে বরখাস্ত ক'রে দেওয়া যায় না। এই তিনটে উপন্যাসে এবং কয়েকটি ছোটগল্পে দেখেছি তাঁর মনের সুস্থ মাত্রাজ্ঞান ও তীব্র সংবেদনশীলতা, তাঁর টেক্‌নিকের মজবুত গাঁথুনি, তাঁর ভাষার নিপুণ গৃহিণীপনা। এ-ও দেখেছি যে তাঁর সবচেয়ে খুঁতখুঁতে সমালোচক তিনি নিজেই। এমন একজন লেখক নিছক খেয়ালের বশে কিংবা বাজারের ফর্‌মায়েশে একটা-কিছু নিয়ে মাতামাতি করবেন এটা কোনো কাজের কথা নয়। অথচ নালিশটা যে একেবারে ভুয়ো তা-ও বলতে পারিনে।

যাঁদের আমরা বলি ভদ্রলোক, সংখ্যায় নগণ্য হ'লেও তাঁরা নানা কৌশলে সমস্ত সমাজটাকে এমন ক'রে হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে রেখেছেন যে তাঁদের বেশ-খানিকটা গণ্য না-ক'রে' উপায় নেই। এই ভদ্রসন্তানরা যতোদিন সমাজ-শাসন ও পরিচালনার ভার নিজের

হাতে রাখবেন, আইন গড়বেন, আদালত করবেন, দর্শন-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায়-প্রশাখায় নিজের একচোখা মনের ছাপটি এঁকে চলবেন, ততোদিন সাহিত্য থেকে এঁদের বিতাড়িত করবার চেষ্টা নিরর্থক। চোখ বুঁজে সাহিত্যের আসরে এদের অস্তিত্ব লোপ ক'রে সান্ত্বনাটা কী যখন চোখ খুললেই দেখতে পাই এঁরা অক্‌টোপাসের মতো আট পায়ে সমাজটাকে আঁকড়ে ব'সে রয়েছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাঁরা শ্রমিক-সাহিত্য দাবী করছেন তাঁরা সাহিত্যকে এগিয়ে দিচ্ছেন না, গুলিয়ে দিচ্ছেন মাত্র। শ্রমিকতন্ত্র স্থাপনের পূর্বে শ্রমিক-সাহিত্য নিয়ে দাপাদাপি একধরনের উবুড়-করা আইভরি টাওয়ার-বিলাস। তবে বুর্জোয়া সমাজের বাইরের ব্যবস্থায় যেমন ভাঙন ধরেছে, তার মনের ভিতরেও তেমনি বিকার ঢুকেছে। সে-বিকারের প্রভাব সমগ্র সমাজ-দেহের উপর অনিবার্য এবং অপরিমেয়। যে-কারণে হোক্ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অনুভূতি ও ভাবনা আজ যদি শারীরিক বৃত্তিবিশেষের সঙ্গে খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চলে, তাহ'লে তো আজকের সাহিত্যিক তার ধোপদোরস্ত কোঁচাটিকে আলগোছে তুলে পাশে স'রে দাঁড়াতে পারে না; তাকে যে এই কাদা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে—যদি একে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি বলতে চান—নেবে আসতেই হবে। সেই কারণটা কী বরঞ্চ তার খোঁজ নেওয়া দরকার।

আজকের দিনে যেমন সেক্স, তেমনি 'বিশুদ্ধ প্রেম' নামক দূর-আকাশবর্তী এক বাষ্পনীহারিকার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতো উনিশ শতকের সাহিত্য। রোম্যান্টিকদের এই প্রেম আমাদের মানসিক পরিবেষ্টনে এতোখানি জায়গা জুড়েছে যে আমরা সহজেই ভাবি এ এক চিরন্তন প্রবর্তনা, সাহিত্যের সঙ্গে এর যোগ স্বতঃসিদ্ধ ও শাশ্বত। হক্সলি বা কড্‌ওয়েল মনে করিয়ে দিলে ভাবতে অবাক লাগে যে এরও ইতিহাস আছে, আদি অন্ত আছে। অথচ মাত্র কয়েক শতাব্দী পার হ'য়ে রেনেসাঁস যুগটা ছাড়িয়ে গেলে আমরা আর রোম্যান্টিক প্রেমের

পাত্তা পাই না, না সমাজে না সাহিত্যে। তার মানে এ নয় যে এমন একসময় ছিলো যখন নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিলো না। সে-আকর্ষণের উৎপত্তি খুঁজতে হ'লে মানবেতিহাসের বহু কোটি বৎসর পূর্বে প্রাণীলোকের নিম্নতম স্তরে গিয়ে হাজির হ'তে হয়, যেখানে বংশবৃদ্ধির উপায় স্ত্রী ও পুং প্রাণীর সঙ্গম নয়, লিঙ্গবিহীন জীবাণুর বিভাজন। নারী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণকেই যদি প্রেম বলেন তাহ'লে বলতে হয় যে প্রেম সম্বন্ধে প্রাচীনদের দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিলো অন্যরকম, আজকের প্রায় বিপরীত। রোম্যান্টিকদের কাছে প্রেম হ'লো এক স্বর্গীয় বা ঐশী প্রেরণা, মানব-জীবনের যা শ্রেয়তম ও সুন্দরতম তারই নির্যাস। প্রাচীনযুগে প্রেমের সাক্ষাৎ যদি-বা পাই (বিশুদ্ধ সেক্সের কথা বলছি না) যেমন হেলেনের প্রতি প্যারিসের প্রেম, তার সম্বন্ধে গদ্‌গদ্ ভাবোচ্ছ্বাস দেখা যায় না। বরঞ্চ তাকে ভাবা হয় যেন মানুষের ভূতে-পাওয়া দশা, অথবা এক ভয়াবহ ব্যাধি যার কবলে পড়লে আর রক্ষা নেই, কিন্তু কবলে না-পড়ার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করাই সুস্থ লোকের কর্তব্য।

মানুষ একদিকে হ'লো দলচর জীব, সামাজিক বোধ ও প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, বহুলোকের সহযোগিতায় প্রতিপালিত, তাদের দাবী মেনে চলতে এবং তাদের উপর দাবী খাটাতে অভ্যস্ত। সে চাষ করে এক-জোট হ'য়ে, শিকার করতে যায় দলবেঁধে, লড়াইয়ের ময়দানে সে সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। তার উৎসব-অনুষ্ঠান পালাপার্বন নৃত্যগীত সমস্তই সম্মিলিত। অন্যদিকে তার সেক্স তাকে করেছে যূথভ্রষ্ট, মিথুনচারী। সমাজের প্রতি সে বিমুখ, জনতার মধ্যে মাত্র একজন তার সকল আগ্রহ কেড়ে রেখেছে। তার সেই একেলার সঙ্গিনীকে নিয়ে সে নীড় বাঁধবে, বেড়া তুলবে, পর্দা টানবে। ফিউডল্ যুগের কবি ওমর খৈয়াম বনজঙ্গলের মাঝখানে তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে ব'সে এক টুক্‌রো রুটি আর এক পেয়ালা মদ নিয়ে স্বর্গ-রচনা করবেন।

বনজঙ্গলের মাঝখানে কিন্তু ঐ দুটি বস্তু কোথা থেকে জুটবে এবং ফুরিয়ে গেলে দিনের পর দিন জুটতে থাকবে—এই গদ্য চিন্তাটা কবির মনে না-আসারই কথা। তবে স্বর্গ-রচনার ব্যাপারে প্রিয়ার সঙ্গে পাঁউরুটির মূল্য সমীকরণে যে অকবিজনোচিত কাণ্ডজ্ঞান ও স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে তা খৈয়ামী চতুষ্পদীর দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। রুটির অত্যাবশ্যকতা অবশ্য সবাই একবাক্যে মেনে নেবে ; কিন্তু মদের পাত্র না-হ'লে কি ভূস্বর্গের খস্‌ড়াটা অসমাপ্ত থাকতো? থাকতো বোধহয়, কারণ কবিও যে সামাজিক জীব, সমাজের হাজারো লোকের সঙ্গে দায়িত্বের হাজারো সূত্রে বদ্ধ, সেটা তো সহজে ভোলা যায় না, তার জন্য ইরানী সুরার ঘন-ঘন প্রয়োজন। শ্রেণীবিভাগের পাকা ব্যবস্থায় লালিত কবি রবীন্দ্রনাথ সমাজ থেকে আরও দূরে স'রে এসেছেন। নিজের সামাজিক অস্তিত্বটাকে ভুলবার জন্য ইরানী সুরা তাঁর দরকার নেই। বর্ষার দিনে প্রিয়ার চোখে চোখ রেখে তিনি সরাসরি বলতে পারেন :

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

সেই 'আঁধারে' সামাজিক মানুষের সত্তাও লোপ পেয়েছে।

মানুষের এ দুটি দিকই যখন মৌলিক ও চিরন্তন, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সাহিত্যে ও শিল্পসৃষ্টিতে দুটি ধারাই যুগে-যুগে প্রবহমান থাকবে। কিন্তু সাহিত্য একটা থেকে আর-একটাতে দোলা খেয়ে এসেছে, কোনো একসময় দুটোকে সমানে কোল দিতে পারেনি। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে sex এবং herd instinct যতোদিন instinct মাত্র ছিলো ততোদিন তারা সাহিত্যের উপাদান হ'তে পারেনি,

ততোদিন সত্যিকার সাহিত্য বা যে-কোনোপ্রকার শিল্পকলা জন্মাতেই পারেনি। যখন সেগুলি নিছক উপজ্ঞা থেকে হৃদয়াবেগের স্তরে উপনীত হ'লো, মানুষ তখনই হ'লো শিল্পী, চাষবাসের যুদ্ধবিগ্রহের বাইরে সে এমন একটা-কিছুর সন্ধান পেলো যা জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক না-হ'লেও জীবন-সম্ভোগের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। যা সে অন্যকে দিতে বা অন্যের কাছ থেকে পেতে উৎসুক। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে, হোমর হিসিয়ডের মহাকাব্যে দেখা যায় যে প্রেম তখনও তেমনি পরিস্ফুট বা পরিব্যক্ত নয়, তাতে মুখ্যত প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক অনুভূতির বিস্তার ও গভীরতাই। প্রাচীনযুগে এটাই স্বাভাবিক, কেননা সেক্স অনেক কাল কেবল শারীরিক প্রবর্তনা রূপে থেকে গেলেও জীবনযাত্রা অচল হয় না, কিন্তু ছোটো-ছোটো উদ্বাস্তু শিকারী মানুষের দল যখন কৃষি-প্রধান জনবহুল শক্তি ও সমৃদ্ধশালী সমাজে পরিণত হয় তখন herd instinct-এ আর কুলোয় না, আত্মচেতন সামাজিক বোধের বিকাশ একান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। এই নবপরিস্ফুট সামাজিক চৈতন্য থেকেই মহাকাব্যের জন্ম, এবং একে পরিপুষ্ট করাতেই তার সার্থকতা।

সেক্সের মানসিক বিকাশ প্রেম এলো অনেক বিলম্বে, সভ্যতার অনেকখানি অভিব্যক্তির পর। ফিউডল্ যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগে আসতে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে সমাজে মানবিক সম্বন্ধের ক্রমশঃ হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ কিছু এখনও জমিদারী প্রথার মধ্যে টিঁকে রয়েছে। প্রতাপশালী জমিদার যদি-বা প্রজাকে অন্যায় উৎপীড়ন ও শোষণ করে তবু প্রজাদের জীবন থেকে সম্পর্কছিন্ন নয় তার জীবন, তাদের সুখ-দুঃখের খবর ও ভার কতক পরিমাণে না-নিয়ে সে থাকতে পারে না। কোম্পানির মালিকের সঙ্গে কারখানার মজুরের যে-সম্পর্ক তার সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখা যাবে যে

দুটোর প্রভেদ শুধু মাত্রাগত নয়, জাতিগত। একটাতে হৃদয়বৃত্তির বিকাশের রাস্তা খোলা আছে, আরেকটাতে নেই। মার্কস্-এর ভাষায় "বুর্জোয়ারা মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলে বাকি রেখেছে কেবল নগ্ন স্বার্থের, নির্মল দর-কষাকষির যোগসূত্র।" অনুভূতির সামাজিক স্রোতোধারা অবরুদ্ধ হ'য়ে অন্যদিকে বাঁক ফেরালো, যুগল প্রেমের খাদে বইতে লাগলো। সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মের কড়া অনুশাসন সেক্সের শারীরিক বিকাশকে অহেতুক বিধিনিষেধের বেড়াজালে ঘিরে মনের দিকে তার প্রসার অস্বাভাবিকরকম ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুললো। এ দুটি মূল কারণ থেকেই রেনেসাঁস যুগের রোম্যান্টিক প্রেম উদ্‌ভূত। উনিশ শতক পর্যন্ত সাহিত্যে সর্বত্র তার বোলবোলাও, কবি মানেই প্রেমিক, উপন্যাস মানেই প্রেমের কাহিনী।

বিশ শতকে আবার হাওয়া গেলো পাল্‌টে। প্রেমের কবিতা লেখা একরকম বন্ধ হ'য়ে এলো, উপন্যাসে বিশুদ্ধ প্রেমের জায়গা নিলো নির্জলা সেক্স। এর জন্য প্রথমত দায়ী ভিয়েনীজ স্কুলের মনো-বিকলনতত্ত্ব। বিস্তর তথ্যাদি ঘেঁটে তাঁরা সাব্যস্ত করলেন যে অত্যন্ত খাঁটি শেলি-মার্কা সেই-যে 'the worship that the heart lifts above, and the heavens reject not'—তার পেছনেও রয়েছে চাপা লিবিডো-র প্রবল তাড়না। এর ফলে সেক্স সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেমন বাড়লো, স্নায়বিক চাঞ্চল্যজনিত যে-কৌতূহল এতোদিন ধামাচাপা ছিলো তা-ও তেমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। লেখাপড়ায় কথাবার্তায় চিন্তা-ভাবনায় সর্বত্রই প্রসঙ্গটির ছড়াছড়ি এবং বাড়াবাড়ি। সাহিত্য তার আক্রমণ ঠেকাতে পারবে কেন। দ্বিতীয়ত গত মহাযুদ্ধের সর্বনাশা আবর্তনে মানুষের সমস্ত চরমমূল্য গেলো তলিয়ে, এক বিশ্বব্যাপী অনাস্থা ও অবিশ্বাস সারা য়ুরোপের—এবং সারা পৃথিবীর—চিত্ত ভাসিয়ে দিলো। প্রেম ছিলো অন্যতম

প্রধান মূল্য, তার বেলায়ও ব্যতিক্রম ঘটলো না, মানুষের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ সইতে না-পেরে পঞ্চশর তাঁর তূণটি বগলদাবা ক'রে কেটে পড়লেন। বুর্জোয়া মূল্যের বিনাশকে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙনের পূর্বাভাস মনে করা অসঙ্গত নয়। আর্থিক জগতে যার নাম দেওয়া হয় capitalist crisis, মূল্যবোধের উপপ্লবকে তারই আধ্যাত্মিক প্রতিফলন বলতে পারেন। এক সভ্যতার পতন এবং আর-এক সভ্যতার উত্থানের মাঝখানকার সময়টা স্বভাবতই অরাজকতার সময়। এই সময়ে আদিম মানুষের প্রবৃত্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিজ্ঞানে বলে প্রকৃতি নাকি vacuum বরদাস্ত করতে পারে না। সভ্যতার ফাঁক ভরবার জন্য তাই ছুটে আসে মানুষের অবদমিত বর্বরতা। তাই ফাশিস্ট দেশের মাথায় রক্ত চাপে, সংস্কৃতির নাম উঠলে হাত যায় পিস্তলের দিকে। তাই ক্যাপিটালিস্ট দেশে প্রচণ্ড বেগে সেক্সের চর্চা চলে, জন্মায় যৌন-বিকার, মানসিক ব্যাধি এবং ব্যাধির প্রতি আসক্তি।

এই সামাজিক পটভূমিকার উপরই 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের চরিত্রগুলি আঁকা হয়েছে। বইয়ের 'চতুষ্কোণ' নামটিতে বোঝায় সেই শেল্‌ফে-আলমারিতে টেবিল-চেয়ারে এবং রাজকুমারের ভাবনায়-দুর্ভাবনায় স্বপ্নের বিকারে দিবাস্বপ্নের জঞ্জালে ঠাসা ছোটো ঘরটিকে। কিন্তু 'চতুষ্কোণ' বলতে আরও-কিছু বোঝায়। নামকরণে ইঙ্গিত রয়েছে সমাজের সেই সংকীর্ণ কক্ষটির দিকে যা উত্তেজনার উপকরণ-বাহুল্যে ঠাসা, সেখানে বিরাট পৃথিবী ও বৃহৎ সমাজের আলো-বাতাস পৌঁছোয় না, যার বাসিন্দাদের প্রচুর অবসর শুধু নিরানন্দ আমোদের পেছনে ধাবমান এবং বিক্ষুব্ধ। উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার যখন এক চতুষ্কোণে ব'সে-ব'সে বই পড়ে, আর শুয়ে-শুয়ে হাজারো এলোমেলো ভাবনা ভেবে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সে বেরিয়ে যায় অন্য চতুষ্কোণটিতে। সেখানে যাদের সঙ্গে তার সংস্পর্শ তারা

তাকে আঘাত করে কিন্তু জাগিয়ে তুলতে পারে না, উত্তেজিত করে উৎপ্রাণিত করতে পারে না; তাদের ঘোরানো-প্যাঁচানো বাঁকানো-চোরানো জীবন তার জীবনকে জটিলতর ক'রে দেয়, সিদ্ধি বা শান্তির কোনো রাস্তাই বাতলে দিতে পারে না। বিভ্রান্ত রাজকুমার ফিরে আসে তার পূর্ব চতুষ্কোণটিতে। আবার ভাবে, বই পড়ে আর স্বপ্ন দেখে—এমন-সব স্বপ্ন যা ফ্রয়েড, আদ্‌লার, জোন্‌সের বইয়ের সেরা দৃষ্টান্ত হ'তে পারতো। এমন মানুষের মনে বিকার না-এসে পারে না। নারী সম্বন্ধে রাজকুমারের চৈতন্য অস্বাভাবিক প্রখরতা লাভ করে। নারীকে কিন্তু সে ভালোবাসে না, তার আসঙ্গও সে চায় না, সে কেবল তার সুপরিচিতা কোনো মেয়ের নগ্নদেহ একবার চোখ ভ'রে দেখবে। এই বাসনার এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খাড়া ক'রে নিজের মনকে সে চোখ ঠারে। কিন্তু তাতে শান্তি কই। তার জীবন এগিয়ে চলে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে, বিকারের দিকে।

কোনো-কোনো পাঠক অনুযোগ করেছেন যে বইটা যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব নয়। নায়কের মনের গড়ন যেমন সৃষ্টিছাড়া, তার জীবনের ঘটনাগুলিও তেমনি অভূতপূর্ব, আশপাশের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহিত্যের বিচার কি আশপাশের সঙ্গে মিল খুঁজেই করতে হবে? সাহিত্যিক কি দৈনিক কাগজের রিপোর্টার যে বাইরে যা যেমনটি ঘটছে সেটাকে ঠিক তেমনই টুকে এনে সকালবেলা আমাদের চায়ের টেবিলে হাজির করবে? মানিকবাবুর লেখায় বিশেষত 'চতুষ্কোণে' কল্পনার ভাগটা প্রবল স্বীকার করছি, কিন্তু সে-কল্পনা স্বৈরাচারী নয় কাজেই মিথ্যা নয়, তা শিল্পধর্মী অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ। তাছাড়া রাজকুমারের চরিত্র কি সত্যিই খুব উদ্‌ভট বা অস্বাভাবিক? একটু তলিয়ে দেখলেই কি ধরা পড়ে না যে তার মনের গড়নের এমন-কি তার বিকারেরও অস্বাভাবিকতা যতোটা মাত্রাগত ততোটা জাতিগত নয়। তাকে যদি আমরা আকারে

ছোট ক'রে দেখি, তার সুরটাকে একটু খাদে নাবিয়ে নিয়ে আসি, তাহ'লে দেখবো যে রাজকুমারের মনের বৈশিষ্ট্য এবং বিকার তার স্বশ্রেণীর, তারই মতো আধুনিক কালের প্রসাদলালিত অবসরভোগী মধ্যবিত্ত অনেক যুবকের মনের আনাচে-কানাচে বর্তমান। ততোটা দৃষ্টি-গোচর নয় অবশ্য, কারণ একদিকে তার মাত্রা অল্প, এবং অন্যদিকে সাধারণ পর্যবেক্ষকের বিশ্লেষণী শক্তি অপটু। রাজকুমারের মন সর্বতো-ভাবে না-হ'লেও মূলত আর পাঁচজনের মতো, শুধু লেখক তাকে তাঁর মাইক্রস্কোপের সামনে ধ'রে বিরাট ক'রে দেখিয়েছেন। মাইক্রস্কোপে দেখা জিনিষ এক হিসাবে খুবই অস্বাভাবিক, সেই অস্বাভাবিকতা রাজকুমারের চরিত্রাঙ্কণেও পরিলক্ষ্য। তবে কিনা লেখকের উদ্দেশ্য তা-ই ছিলো, সে-কথা ভূমিকাতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই দেখা যায় রাজকুমারের মাথা ধরেছে। সে নিজে স্বীকার না-করলেও তার ডাক্তার-বন্ধু অজিত জানে যে স্বাস্থ্য তার খারাপ, মানসিক ব্যাধিরও একটু ইঙ্গিত করলো বন্ধু, সেটা কিন্তু ঠাট্টাচ্ছলে। তখনও সে বিকারগ্রস্ত নয়, তবে মন তার অনিবার্য-রূপে এগুচ্ছে বিকারের দিকে। আমাদের চোখের সামনে বিকারের চিহ্নগুলি একে-একে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে: উপন্যাসের আকার ক্ষুদ্র এবং লয় দ্রুত ব'লে ৭০/৮০ পৃষ্ঠার মধ্যেই আমরা একটি পুরোপুরি নিউরোটিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। এই নিউরোসিসের উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। জানি না আধুনিক মনোবিকলন তত্ত্ব সম্বন্ধে মানিকবাবু কতোদূর অভিজ্ঞ। যদি তিনি অভিজ্ঞ না-হন, তাহ'লে তাঁর সহজাত গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অবাক করে। যদি হন, তবে তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্যের সংযম ও নিরাড়ম্বর পশ্চাদপসরণ প্রকৃত শিল্পীরই যোগ্য। বহু দেশী ও বিদেশী ঔপন্যাসিক এ-স্থলে libido, repression, regression, sublimation, voyeurism, censorship প্রভৃতি তত্ত্বকথা ও পারিভাষিক

শব্দের পসরা বের ক'রে পাঠকের মনে চমক লাগাতে গিয়ে উপন্যাসটাই মাটি করতেন। আর-একদিক থেকে উপন্যাসের আরও ঘোরতর সর্বনাশ ঘটতে পারতো কাঁচা লেখকের হাতে। বইয়ের যেটাকে ক্লাই-ম্যাক্স বলা যেতে পারে, যেখানে রাজকুমারের বিকৃত মনকে আসন্ন উন্মাদ-রোগের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সরসী তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার পদদলিত ক'রে নিরাবরণ দেহে রাজকুমারের সামনে এসে তার নিউরোটিক খেয়ালের তৃপ্তিসাধন করলো – সেই দৃশ্যটি এতো ক্ষণভঙ্গুর, লেখকের বিন্দুমাত্র অক্ষমতা অসাবধানতার ফলে vulgarity-র দিকে ঝুঁকে পড়তে পারতো এতো সহজেই, যে সমস্ত অধ্যায়টি আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়েছি, প্রতি ছত্রে মনে আশঙ্কা জেগেছে এই বুঝি গেলো সব। কিন্তু শিল্পীর পাকা হাত মুহূর্তের জন্যেও কাঁপেনি, কোনো রেখা বেঁকে যায়নি, কোনো রঙ একটু বেশি বা কম পড়েনি।

১৩৫০

সাধু এবং সজ্জন

কারও চরিত্রের সুখ্যাতি করতে হ'লে আমরা বলি "সাধু সজ্জন ব্যক্তি।" বিশেষণদুটি মানিকজোড়ের মতো পরস্পরের সঙ্গপ্রিয়; একটা উচ্চারণ করলে আর-একটা আপনিই জিভের ডগায় এসে পড়ে। এদের মিত্রভাব বঙ্গভাষীমাত্রেরই খুব পরিচিত কিন্তু আমার প্রবন্ধের অবতারণা তাদের বৈরিভাব নিয়েই।—একই ব্যক্তির পক্ষে সাধু এবং সজ্জন হওয়া কি আদৌ সম্ভবপর?

প্রশ্নটা হেঁয়ালি নয়, খেয়ালীও নয়; একটু ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করলে সে-কথা পরিষ্কার হবে। 'সাধু'র অভিধান-সঙ্গত অর্থ হ'লো ধার্মিক; ধার্মিক বলাতে অবশ্য কোনো সুরাহা হয় না। কারণ বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় "ধর্ম" শব্দটা বড়ো আচারভ্রষ্ট—অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদাহরণ দিই: "ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো, তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করবে না তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে—কেন করব না?" ('কালান্তর') পরপর দুটি বাক্যে একই বাক্যের অর্থ বিপর্যয় লক্ষ করবার বিষয়। তেমনি লক্ষণীয় স্বভাবধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম, ধর্মাধর্ম, বায়ুর ধর্ম—ইত্যাদি ব্যবহার। এই অনভিজাত শব্দটাকে জাতে তুলতে হ'লে তার কিছু অর্থশুদ্ধি প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধের পরিধিতে আমরা ধার্মিক কথাটা একটা সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করবো, ধার্মিক বলতে সেই ব্যক্তিকেই বুঝবো যাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক সর্বশক্তিমান পরম মঙ্গলময় সত্তার অস্তিত্বে অবিচলিত আস্থা।

Religion-এর মর্মার্থ বাংলায় প্রকাশ করতে গেলে যেমন অনেক-গুলি কথা বলতে হয়, কোনো একটি চলতি কথায় কুলোয় না, তেমনি morality-র সঠিক প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় খুঁজে পাওয়া ভার। অনেকে নীতি বা সুনীতি কথাটা সমনামরূপে ব্যবহার ক'রে থাকেন। কিন্তু 'নীতি' শব্দে চিরাচরিত প্রথা ('রীতিনীতি'), কিংবা নিয়ম অর্থাৎ কোনো অনুজ্ঞাপ্রসূত বিধানের ভাবটাই ('সমাজহিতকর বিধান' —'চলন্তিকা') অধিকতর প্রকট, অথচ মর‍্যালিটি বলতে আমরা যে গুণটা বুঝি সেটা অন্তঃকরণমূলক, উপর থেকে চাপানো কিছু নয়। আমার বিবেচনায় বরং 'সজ্জন' শব্দটাকে moralist বা moral person-এর সমার্থবাচক ব'লে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ্য পদে 'সজ্জনতা' খানিকটা বিসদৃশ শোনায় ব'লে অনেকস্থলে তার পরিবর্তে 'চারিত্র' ব্যবহার করেছি।

অর্থাৎ আমাদের প্রশ্ন হ'লো ধর্ম ও চারিত্রের সংঘাতের প্রশ্ন। একটু তাজ্জব প্রশ্ন, স্বীকার করছি। কারণ বাংলায় সাধু এবং সজ্জন যেমন পরস্পারের মিতা, দর্শনশাস্ত্রে তেমনি ধর্ম ও চারিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। চরিত্র নাকি ধর্মের কাছ থেকেই বল ও সম্বল পায় ; এবং অন্তত কাণ্ট্ ভগবৎ-বিশ্বাসকে চারিত্রবোধের সাক্ষ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বিবর্তনবাদী চারিত্র-বিজ্ঞান কেমন ক'রে কাণ্টের চেষ্টার অসারতা প্রতিপন্ন করলো তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। ভগবৎ-বিশ্বাস সজ্জনতা-বিকাশের সহায় কি অন্তরায় সেইটা আপাতত আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ।

[“আমরা বাস্তব সত্তাকে আমাদের আদর্শের ছাঁচে ঢালিতে পারি না, তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি মাত্র। শাঙ্কর মতে দর্শনের কাজ যাহা হওয়া উচিত তাহার সংঘটন নয়, যাহা আছে তাহারই সংবোধি। ব্রহ্মানুভবের মধ্যেই আমরা পাইব চরম শান্তি ও তৃপ্তি।” (রাধাকৃষ্ণণ, 'ভারতীয় দর্শন', ২য় খণ্ড, পৃ ৬১৪)]

("দার্শনিকরা এ-যাবৎ তুনিয়ার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন : আসল কথা হইল তাহাকে পরিবর্তন করা।" (কার্ল মার্কস্, 'ফয়েরবাখ বিষয়ে প্রস্তাব'))

উপরের তুটি উদ্ধৃতিকে ধর্মপরায়ণ এবং সজ্জন-সুলভ—এই তুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভূ হিসেবে ধরা যেতে পারে। তুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ মৌলিক। ধার্মিকের কাছে তার চরম আদর্শ ভবিষ্যতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন নয়, অনাত্তন্তকাল ধ'রে বা কালাতীতরূপে বিশ্বসৃষ্টিতে অভিব্যক্ত। ভগবান স্বয়ং যখন ত্রুটিলেশহীন এবং তাঁর শক্তি অপরিমেয়, তখন তাঁর সৃষ্টিতেও কোনো দোষ স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং জাগতিক পরোৎকর্ষ সাধ্য নয়, চিরসিদ্ধ। চারিদিকে অবশ্য এমন অনেক-কিছু আমরা দেখতে পাই যা পাপবিদ্ধ, যা কদর্য ও ঘৃণ্য; সেটা কিন্তু আমাদের মানুষী দৃষ্টির বিভ্রম, অবিদ্যা-জড়িত মনের একটি ব্যাপারমাত্র। অপরপক্ষে, সজ্জন ব্যক্তির কাছে শ্রেয়স হচ্ছে তার মনোগত আদর্শ, বাইরের বাস্তব অমঙ্গল ও অন্যায়ের সঙ্গে যুঝে যেটাকে ক্রমশ সত্য ক'রে তুলতে হবে। হিতসাধনব্রতী মানুষের জীবন একটি বিরামহীন অন্তহীন সংগ্রাম ; প্রতিতুলনায়, ভগবৎ ভক্তের সঙ্গে তার পরিবেশের প্রকৃত সম্বন্ধ সন্ধির সম্বন্ধ, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্বন্ধ।

অমঙ্গলের সত্যাসত্যকে কেন্দ্র ক'রেই সাধুতা ও সজ্জনতার মধ্যে এই বিরোধ। মানবপ্রেম যার জীবনের মূল প্রেরণা, তার পক্ষে অমঙ্গলের অস্তিত্বকে শাস্ত্রবাক্যচ্ছটায় আচ্ছন্ন ক'রে রাখা অথবা ধর্ম-তত্ত্বের ধূমায়িত তর্কবিতর্কের মধ্যে উবিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রেরণা ছিলো কার্ল মার্কসের জীবনে সবচেয়ে প্রবল প্রেরণা, কাজেই সামাজিক অমঙ্গল ও কদর্যতা ছিলো তাঁর চোখে সবচেয়ে প্রখর বাস্তব। তাঁর সমস্ত ধ্যান, বাক্য ও কর্মকে এই বাস্তবের সঙ্গে আপোষহীন যুদ্ধ মনে করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে ধার্মিকের কাছে সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। শুধু সত্ত্বগুণ নয়, যা কিছু রজঃ বা তমোগুণান্বিত তা-ও সেই

চরম সৎ-এরই প্রকাশ। শুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখলে কুৎসিত কিংবা হেয় কিছু নেই। ব্র্যাডলির ভাষায় "দুরাত্মার কলুষিত কামনাও এক পারমার্থিক পরম কল্যাণময় ইচ্ছার অঙ্গীভূত।" ('সত্তা ও প্রতিভাস', পৃ ৩৯০) সবই যদি শুভ হয়, অনিন্দ্যসুন্দর হয়, তাহ'লে জাগতিক এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া খোদার উপর খোদ্‌কারী। ব্রহ্মের যে অখণ্ড অভিপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের চক্রপথে আপনিই সিদ্ধ হচ্ছে তাতে অকিঞ্চিৎকর মানুষী হিতৈষণার স্থান কোথায়? কোনো-কোনো ধর্মতাত্ত্বিক বলেন যে অক্ষম মানুষের ক্ষুদ্র মঙ্গল-সাধনার মধ্য দিয়েই ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে অনন্ত নিঃশ্রেয়সের পথে নিয়ে চলেছেন। সেইজন্য আমাদের সৎকর্ম-প্রচেষ্টা বৃথা নয়, ব্যর্থও নয়। এর বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি তোলা যেতে পারে। প্রথমত, এ-কথা বললে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় যে বিশ্বজগৎ মঙ্গলের দিকে এগুচ্ছে মাত্র, এখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণ মঙ্গলময় নয়। সেটা অসীম স্রষ্টার প্রতি দোষারোপ, কোনো ভগবৎভক্তের মন তাতে সায় দেবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা যদি আমাদের হিতৈষণাকে ভগবানের হিতসাধনের যন্ত্ররূপে জ্ঞান করি তাহ'লে আমাদের সামাজিক কর্তব্যের চেতনা নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। প্রকৃত দায়িত্ব যন্ত্রচালকের উপর ন্যস্ত থাকলে যন্ত্রের দায়িত্ববোধে মরচে ধরবেই, তাতে সেই ক্ষুরধার এষণা পাওয়া যাবে না যা সামাজিক শোষণ ও স্বার্থসিদ্ধির জগদ্দল পাথরকে কেটে খান-খান করবার জন্য অত্যাবশ্যক। ইতিহাসে তাই দেখা যায় স্থিতস্বার্থের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত বেঁধেছে যতোখানি, সন্ধি হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি ; ধর্মের ধ্বজাধারীরা অল্পেতেই কবুল ক'রে নিয়েছেন : সীজারের ধন সীজারের হাতে প্রত্যর্পণ করো, সে-সীজার অতি জবরদস্ত অত্যাচারী হ'লেও। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে"—এই হ'লো ধার্মিক মনের অভিলাষ। কিন্তু শুধু ঈশ্বরের অশরীরী চরণে নতিস্বীকার নয়, রাজা-মহারাজা মালিক-মহাজন জমিদার-জোৎদারের অত্যন্ত শরীরী

চরণের সামনেও মাথা নিচু ক'রে দাঁড়াবার শিক্ষাই দিয়েছে ধর্ম। অত্যাচার-জর্জরিত মানুষের নতমস্তকে হাত বুলিয়ে উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টান পাদ্রীরা বড়ো সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে বলেছেন : "It is the poor or those who have no care at all for wealth, whose concessiveness or submissiveness knows no limit, and those who takeup the burden of misery most readily, who are to enjoy the blessings of the kingdom." (Bishop Gore.) মার্ক্সও সেই কথা বলেছিলেন একটু রুক্ষ ভাষায় : "The mortgage the peasant has on heavenly goods gives guarantee to the mortgage the bourgeois has on the peasants' earthly goods."

সংগ্রাম-বিমুখতা থেকে এসেছে আত্মরতি, সামাজিক কর্মক্ষেত্রের সর্বাগ্রগণ্য দাবীকে লঘু ক'রে দেখবার পলায়নী মনোভাব। ধর্মের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মন নিয়ে যাঁরা ভক্তজীবনের পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম জেম্‌স্‌ অদ্বিতীয়। জেম্‌স্‌ও স্বীকার না-ক'রে পারেননি যে যে-অক্ষদণ্ডের চারদিকে ধার্মিকের জীবন ঘূর্ণ্যমান তা প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিত্রাণের চিন্তা। "Religion in short is a monumental chapter in the history of human egotism." (*Psychology of Religious Experience*, p 480.) আগেই বলেছি যে এই আত্মরতির মূলে রয়েছে অমঙ্গলের বাস্তবতা সম্বন্ধে ঘোলাটে দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে পূর্ণসত্য ব'লে স্বীকার করায় অনভিরুচি। প্রকৃত ভক্তের এ ছাড়া উপায় নেই। অমঙ্গলকে বাস্তবজ্ঞান করলে ভগবানকে পরমমঙ্গলময় ভাবা যায় না, সৃষ্টির দোষ স্রষ্টার উপরও বর্তায়।* কাজেই অমঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রাম

* এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য থেকে উদ্ভূত ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য। বাস্তবজগতের মাঝখানে তাঁরা কেবল অমঙ্গলকেই অবাস্তব ঠাওরান। ভারতীয়

নয়, অমঙ্গলের মিথ্যাত্বের উপলব্ধিই সাধুর বরেণ্য পন্থা। কর্মের কথা ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সে-কর্ম পরার্থে নয়, স্বার্থে; সেটা আত্মশুদ্ধির উপকরণ, স্বর্গারোহণের সোপানমাত্র। এবংবিধ কর্মমার্গে দান-দক্ষিণা চলে, শৌখীন আত্মনিপীড়নও সম্ভব. কিন্তু তাতে অন্যায়ের বিরাট শক্তিশালী দুর্গগুলো ভাঙ্গে না, সমাজ-বিপ্লব ঘটে না। ধর্মের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে পরাবিদ্যারত্নদের মুখে এমন কথাও শোনা গেলো যে "the very presence of ill in the temporal order is the condition of the perfection of the eternal order." (Royce, *World and the Individual*, p. 385.) তবে আর কী, ইহলোকের অন্যায়ের বোঝা যুগযুগান্তর মানুষের বুকে অক্ষয় হ'য়ে থাক, নইলে পরমার্থ-লোকের অখণ্ড পরিপূর্ণতা চিড় খেয়ে যাবে। স্বভাবতই মার্ক্সের তীক্ষ্ণ চারিত্রবোধ তাঁকে এই কর্মবিমুখ ধর্মাত্মাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করলো : "Criticism of religion is the necessary pre-condition of all criticism. It is at heart a criticism of the vale of misery for which religion is the promisd vision." (Introduction, *Critique of Hegel's Philosophy of Law.*)

মার্ক্সের চব্বিশ শতাব্দী পূর্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থও উৎপীড়িত মানুষের জীবনে দেববন্দনার শূন্যতা অনুভব করেছিলেন। পৈতৃক রাজ্যপাটের সঙ্গে পৈতৃক দেবতা ও ধর্ম প্রত্যাখ্যান ক'রে তিনিও হয়েছিলেন চলতি সমাজ-ব্যবস্থার বিদ্রোহী। সর্বমানুষের দুঃখ ছিলো উভয়ের জীবনের মূল সমস্যা। তাঁদের সমাধানের পথ কিন্তু এক নয়,

ধর্মচিন্তায় problem of evil-এর নিষ্পত্তি আরো গোড়া ঘেঁষে করা হয়েছে। এখানে শুধু অমঙ্গল নয়, সমস্ত দৃশ্য জগৎটাই মায়ার সৃষ্টি, অধ্যাস। সামাজিক অভ্যুত্থানের দিক থেকে কিন্তু ফল প্রায় একই। উভয় ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রতি নিস্পৃহা, সামাজিক দায়িত্বলাঘব, আত্মনিমজ্জন।

কারণ সমস্যা এক হ'লেও তাঁরা সেটাকে দেখেছিলেন প্রায় বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে মার্ক্সের দৃষ্টি পড়লো রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর—শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং একটি ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্ন শ্রেণীর হাতে উৎপাদনযন্ত্রের একচেটিয়া মালিকানা, যার অনিবার্য ফল বিপুল-সংখ্যক বিত্তহীনের উদয়াস্ত শ্রমজাত পণ্যের উপর অত্যল্পসংখ্যক বিত্ত-বানের তস্করবৃত্তি। এবং বুদ্ধের চোখে ব্যক্তিমানুষের বাসনা-বন্ধনই প্রধান অন্তরায় ঠেকলো, তার দুঃখের কারণ তিনি দেখলেন দুর্দান্ত অফুরন্ত তৃষ্ণার দাসত্বে। ফলে তাঁদের পন্থাও বিভিন্ন। মার্ক্সের সমাধান হ'লো শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্র ভেঙে সমসমাজের প্রতিষ্ঠা যাতে "প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ বিকাশ সমস্ত মানবজাতির অবাধ বিকাশের দ্বার মুক্ত ক'রে দেবে।" অপরপক্ষে, বুদ্ধের নির্দেশিত মার্গ হ'লো শীল ও সমাধির পথে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার ফলে বৈরাগ্য এবং পরিশেষে নির্বাণ। নির্বাণ মানে অবশ্য শূন্যে বিলীন হ'য়ে যাওয়া নয়, তা "ইহজীবনের মধ্যেই লভ্য এক বিশেষ মানসিক অবস্থা (অর্হন্তের অবস্থা) যাহাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও সমাহিতি চিত্তে বিরাজ করে।" (হিরণ্ময়।)

এই দুই পন্থা পরস্পরের সংশোধক ও পরিপূরক নয় কি? বুদ্ধের দৃষ্টি ব্যক্তিগত জীবনে বাসনা-শৃঙ্খলের সর্বনাশা শক্তির উপর এতো বেশি নিবিষ্ট ছিলো যে তিনি সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করলেন। এবং মার্ক্সের চোখে সামাজিক, বিশেষত অর্থনৈতিক, অব্যবস্থার বীভৎস ফলাফল এমন সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠেছিলো যে তিনি মানব-চরিত্রের ব্যক্তিগত অক্ষমতাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না। অথচ এ-কথা অনস্বীকার্য যে জীবনধারণের পক্ষে যে-সব সামগ্রী একান্তই আবশ্যক তার অভাব যখন একটা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষ পশুর পর্যায়ে গিয়ে পড়ে, তার পক্ষে আধ্যাত্মিক সাধনার মার্গে আত্মজয় ও চিত্তসমাহিতি লাভ করা অসম্ভব হয়, সে-রকম কোনো অনুপ্রেরণাই তার পাশবীকৃত জীবনে জাগতে পারে না। (দু-চারজন

মহাপুরুষের দৃষ্টান্তে এর ব্যতিক্রম হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু তাঁরা যে মহাপুরুষ। সাধারণ মানুষের সাধ্যাসাধ্যের পরিমাপ তাঁদের অসাধারণ শক্তির মাপকাঠি দিয়ে করা যায় না।) এবং এ-ও আজ কারও অবিদিত নেই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকাংশ লোক আত্মা-বিধ্বংসী দারিদ্র্যের মধ্যে দিনপাত করতে বাধ্য। অবশ্য সমাজতন্ত্রের কথা বুদ্ধদেবের কালে কারও পক্ষে মনে আনা সম্ভব ছিলো না, কারণ সমাজতন্ত্র-স্থাপনের জন্য উৎপাদিকা-শক্তির যে-বিপুল সম্প্রসারণ অপরিহার্য, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার দিকচক্রবাল থেকে তা তখনও বহুদূর ছিলো। টেক্‌নলজি সংস্কৃতি ও ন্যায়াদর্শকে সম্পূর্ণ নিরূপিত না-করলেও যে অনেকখানি সীমায়িত করে তা সর্ববাদী-স্বীকৃত।

মার্ক্স দেখলেন যে অত্যধিক সংখ্যক মানুষের দুঃখের কারণ নিহিত রয়েছে সমাজ-জীবনের হিংস্র প্রতিযোগিতা ও নিরংকুশ ব্যক্তিবাদের মধ্যে। উপরন্তু তিনি ধ'রে নিলেন যে উৎপাদিকা-শক্তির জাতীয়করণ এবং শোষকশ্রেণীর বিলোপের ফলে যে সামাজিক নববিধান রচিত হবে তাতে সর্বমানুষের জৈবিক অভাব ঘুচবে, অতএব সমস্ত দুঃখমোচন হবে। ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যায় এবং সামাজিক সমস্যা-কে সামাজিক সমস্যার পরিভাষায় অনূদিত করা মার্ক্সীয় চিন্তা-প্রকরণের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। এর পিছনে রয়েছে ইতিহাসের নতুন পাঠ, সংস্কৃতিধারা ও মূল্যবিবর্তনের জড়বাদী ব্যাখ্যা। ঐতিহাসিক অগ্রগতির কারণসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু অর্থনীতিই কি মানবিক অভ্যুদয়ের একমাত্র নির্ধারক? যদি তা না-হয় তবে আর্থিক মুক্তির সঙ্গে মানুষের সার্বিক মুক্তির সমীকরণ আমাদের বিপথগামী করবে। আর্থিক সমস্যার নিরসন না-হ'লে অন্য-কোনো সমস্যার নিরসনের দিকে আমরা এগুতে পারি না—এই পর্যন্ত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থান্তরের

ফলে মানব-জীবনের অন্যান্য গভীরতর সমস্যার সমাধান ডায়লেক্‌টিক্‌ জড়প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আপনিই ঘটবে—এ-বিশ্বাস বিজ্ঞান-সম্মত নয়, ভগবৎ-নির্ভরতার অবদমিত ভগ্নাবশেষমাত্র। এঙ্গেল্‌সের ভাষায় "শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগ শেষ হবে, প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হবে।" আমাদের দুঃখ ও সংগ্রাম পাশবিক স্তর থেকে উঠে আসবে মানবিক স্তরে।

পাশবিক স্তরের সংগ্রাম ছিলো জড়প্রকৃতির সঙ্গে—জীবনধারণের জন্য। মাটি কেটে মানুষ ফসল ফলিয়েছে, পাহাড় কেটে রাস্তা বানিয়েছে, বাসভূমির সীমানা সম্প্রসারিত করেছে গহন অরণ্যের মধ্যে, ধরণী ক্ষের গভীরতা থেকে ছিনিয়ে এনেছে শিল্পের উপাদান, শক্তির উপকরণ। জীবিকার অন্বেষণে সে হয়েছে যোদ্ধা। মানবিক স্তরের সংগ্রাম হবে নিজের মগ্নচেতনার প্রাক্‌-সভ্য গৃধ্নু বৃত্তিগুলির সঙ্গে—জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য। সেকালের ধর্মের একমাত্র শিক্ষা ছিলো আত্মজয়ের শিক্ষা ; একালের ধর্মের ঝোঁক কেবল প্রকৃতি-জয়ের দিকেই। এই দুই জয়যাত্রার পথ বস্তুতপক্ষে পৃথক নয়, তারা একই মহাবর্ত্মের দুই শাখা। বলা যায় বৈ-কি যে রিলিজন নির্যাতিত মানুষের অন্তর থেকে উঠে-আসা প্রতিবাদ, কাজেকাজেই যখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সামাজিক নির্যাতন শেষ হবে এবং রিলি-জনের সাহায্যে যে-শ্রেণী নিজের কায়েমী স্বার্থ বলবৎ রেখেছিলো তার অন্তর্ধান ঘটবে, তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে রিলিজনের প্রয়োজনও ঘুচে যাবে। জোসেফ নীড্‌হাম কিন্তু সন্দিহান ; তাঁর মতে মানুষ শুধু সামাজিক নির্যাতনে ভোগে না, বিশ্বজাগতিক নির্যাতনেও ভোগে ; সমাজ-ব্যবস্থা আমরা পাল্‌টাতে পারি কিন্তু জগৎ-ব্যবস্থার পরিবর্তন আমাদের সাধ্যের অতীত। আমরা কেমন ক'রে ভুলবো "What we could call cosmic oppression, or creatureliness, the unescapable inclusion of man in space-

time, subject to pain, sorrow, sadness and death.” (Time, *Refreshing River*, p. 65) এই ‘জাগতিক নির্যাতনে’র গুরুভার অবিচলিত চিত্তে বহন করবার জন্য, ক্ষমতার ব্যসন ও অধিনায়কত্বের স্পর্ধিত বিলাস নিবৃত্ত করবার জন্য, পরের ব্যক্তিস্বরূপকে অক্ষুণ্ণ রাখবার মতো সর্বমানবিক সহিষ্ণুতা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য মনঃশক্তির যে গভীর উৎস আবশ্যক তার সন্ধান আমরা পাবো কোথায়? পাবো আমাদেরই চিত্তের সেইসব দুরধিগম্য স্তবকে যার পথ আমরা আজও জানি না, এ-যুগের ভক্তদের নবতীর্থভূমিতেও যে-পথ কারও জানা আছে ব’লে মনে হয় না। রাধাকৃষ্ণণ প্রচলিত রিলিজনগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: “For the first class, religion is an attitude offaith and conduct directed to a higher power without. For the second, it is an experience, to which the individual attaches supreme value. For it, religion is more a transforming experience than a notion of God.” (*Eastern Religions and Western Thought*, p. 21.) ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্যক্ চারিত্র-বিকাশের অনুকূল নয়—ইতিপূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। মার্ক্সের দুর্নিবার চারিত্র তাঁকে সমস্ত ঈশ্বরবাদী ধর্মের প্রতি খড়্গহস্ত করেছিলো, এবং সেইসব দার্শনিকের প্রতি ক্ষমাহীন যাঁরা পাকেপ্রকারে ধর্মেরই তল্পিবাহক। নিরীশ্বর অধ্যাত্মসাধনার যে-ধারণা উপরের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধেও মার্ক্সের আপত্তি কি সমান প্রবল হ’তো? “Free development of each” কথাটার মধ্যে আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের এই পন্থাও কি অন্তর্ভুক্ত নয়? মার্ক্সের নিজের লেখায় এর স্পষ্ট উত্তর মেলে না।

১৩৫৬

সেকুলারিজম্ ও জওয়াহরলাল নেহরু*

ভারত রাষ্ট্রকে আমরা সেকুলার ব'লে থাকি এবং এক অর্থে কথাটা খুবই সত্য। আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে ধর্ম ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে: কেবলমাত্র বিশেষ কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দরুণ যাতে কাউকে কোনো অসুবিধায় পড়তে না-হয় সে-বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে রিলিজাস লিবার্টি, তা পশ্চিমের প্রাগ্রসর দেশগুলির চেয়ে আমরা একটুও কম ভোগ করি না। তবু পাশ্চাত্য অর্থে আমাদের রাষ্ট্র পুরোপুরি সেকুলার নয়; অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং ধর্মের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়নি এখানে। হ'লে কি ভালো হ'তো? আমাদের সামাজিক প্রথাপদ্ধতিতে এমন অনেক-কিছু গলদ দেখতে পাওয়া যায় যা এখনও সংস্কার-সাপেক্ষ অথচ যা এ-যাবৎ ধর্মেরই শাসন মেনে এসেছে এবং ধর্মের নাম ক'রেই টিঁকে আছে এতোদিন। এ-সব ক্ষেত্রে জনকল্যাণার্থে হস্তক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হ'লেও রাষ্ট্র সেকুলারিজমের দোহাই পেড়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবে, এটা কোনো কাজের কথা নয়। উদাহরণত হিন্দু বিবাহ আইনের কথা বলা যেতে পারে। মুসলিম বিবাহ আইনেরও অনুরূপ সংশোধন অত্যাবশ্যক। প্রাচীন শাস্ত্র যা-ই বলুক, স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিবাহ আধুনিক নীতিবোধকে আঘাত করে। মনুসংহিতায়, শরিয়তে এবং প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই যেখানে নারী-পুরুষের, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, মোমিন-

* 'জওয়াহর' শব্দটি 'জওহর'-এর বহুবচন। হিন্দী ও উর্দুতে তাঁর নাম জওয়াহরলাল; বাংলায় 'জওহরলাল'-এ রূপান্তরিত করার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

কাফিরের, ক্রীশ্চান-হিঁদেনের কথা উঠেছে সেখানে সমদৃষ্টির অভাব দেখা যায়। আধুনিক রাষ্ট্র তো এইধরনের অবিচারকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

এইসব কারণেই বোধহয় আমাদের সংবিধান-রচয়িতারা 'সেকুলার' শব্দটি আদৌ ব্যবহার করেননি। অন্য-একটি কারণও থাকতে পারে। তাঁদের মনে হয়তো ঐ-শব্দের সঙ্গে ধর্মবিরোধ বা ধর্মোচ্ছেদ জাতীয় কোনো অর্থ জড়িত ছিলো। থাকাটা আশ্চর্য নয়, কারণ উনিশ শতকের মধ্যভাগে যখন সেকুলার শব্দের বহুল প্রচার ঘটে তখন সে-শব্দ যে-দৃষ্টিভঙ্গি বহন ক'রে আনতো তা সর্বপ্রকার ধর্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার বিরোধী ছিলো। শুধু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র থেকে নয়, মানুষের সমগ্র জীবন থেকেই ধর্ম নামক ব্যাপারটা দূরে সরিয়ে দিতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলেন সেকুলারিজমের ধ্বজাধারীরা।

এ হেন সেকুলারিজম্ আমাদের দেশের মাটিতে শিকড় গাড়েনি কোনোদিন। গাড়া উচিত কিনা সে-প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। মানবেন্দ্রনাথ রায় সেই অল্পসংখ্যক ভারতবাসীদের চিন্তানায়ক যাঁরা এই চারা গাছটিকে মহীরূহ ক'রে তুলতে প্রযত্নবান। তাঁর ধারণা ছিলো যে, চিরাগত আধ্যাত্মিক ভাবধারার স্থলে সমুন্নত কোনো জড়-বাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করতে না-পারলে এ-দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্ধার সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের কাছে যে-স্বাধীনতা তিনি প্রত্যাশা করতেন তা কেবল বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ বা প্রচার করার সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নয়, বরঞ্চ ধর্মমাত্রের পরিব্যাপ্ত ঊর্ণাতন্তু থেকে নিজেকে এবং সকলকে মুক্ত করার মৌল অধিকার। আমাদের দার্শনিক রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের কাছে অবশ্য সেকুলারিজম্-এর অর্থ একেবারে ভিন্ন। কয়েক মাস পূর্বে তিনি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, সেকুলারিজমের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। ২১ আগস্ট ১৯৬১ তারিখের বক্তৃতায় তিনি আরও স্পষ্ট ক'রে বলে-

ছিলেন : "আমি দৃঢ়কণ্ঠে জানাতে চাই যে, সেকুলারিজমের অর্থ রিলিজনের বিলোপ নয় ; তার অর্থ আমরা সকল ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান। আমাদের রাষ্ট্র অবশ্য কোনো বিশেষ একটি ধর্মমতের সঙ্গে নিজেকে এক করতে চায়নি।" গান্ধিজীর সেকুলারিজম্ এই ভাবেরই বলিষ্ঠতর প্রকাশ। তিনি সকল ধর্মমতকে সত্য ব'লে মানতেন এবং সর্বান্তঃকরণে বলতে পেরেছিলেন, "আমি আমার নিজের ধর্মকে যতোখানি শ্রদ্ধা করি অন্য সব ধর্মকেও ঠিক ততোখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখি।"

গান্ধিজীর ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উক্তির মধ্যে সেকুলারিজমের দুই প্রান্তবর্তী সংজ্ঞা পাওয়া যায়। জওয়াহরলাল নেহরুর মত এই উভয় প্রান্তিক মত থেকে ভিন্ন। তিনি অবশ্য ধর্মের সাম্প্রদায়িক (বা তাঁর ভাষায় সংঘবদ্ধ) রূপের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। 'আত্ম-জীবনী'তে লিখছেন : "ধর্মের, অন্তত‍পক্ষে সংঘবদ্ধ ধর্মের (organised religion), যে-চেহারা ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র আমার চোখে পড়ে তা দেখে আমি শিউরে উঠি ; একে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছি আমি অনেকবার। প্রায় সর্বত্র ধর্ম বলতে বোঝায় শাস্ত্র-বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পশ্চাদ্‌গতি, সামাজিক শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণ।"

কিন্তু ভারতে মানবেন্দ্রনাথ কিংবা ইওরোপে মার্ক্স ও রাসেলের মতো মনীষীরা যে-ভুল করেছিলেন, জওয়াহরলাল সে-ভুল করেননি ; অর্থাৎ ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কেবলমাত্র তার সংঘবদ্ধ রূপটাকেই চোখের সামনে রাখেননি। যদিও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সর্বনাশা শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতেই নেহরুর রাজনৈতিক জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছিলো, তবু যখন তিনি 'রিলিজন' শব্দের সংজ্ঞা-নির্ণয়ের প্রয়াস পেলেন তখন তার বিকট সাম্প্রদায়িক চেহারা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্যক্তির জীবনে তার যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেদিকেই

তাকালেন : "রিলিজনের মতো বিবিধার্থযুক্ত শব্দ প্রয়োগে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে ; তবু যদি কেউ প্রশ্ন করে রিলিজন কী, তবে উত্তরে আমি বলবো — সম্ভবত এর মূল কথাটি হচ্ছে মানুষের আত্মিক বিকাশ, এমন একদিকে তার অভিব্যক্তি যাকে পরম শ্রেয় জ্ঞান করা হয়।" উদ্ধৃতিটি 'আত্মজীবনী' থেকে। পরে 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে সেই দিকটার সম্বন্ধে আরও বিশদ ক'রে তিনি বলছেন : "বাইরের দিকে যেমন আত্মরক্ষার জন্যই অগ্রগতির প্রয়োজন আছে, তেমনি আমরা পেতে চাই অন্তরের শান্তি, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের শান্ত সংযোগ। শুধুমাত্র শারীরিক সুখ ও বৈষয়িক চরিতার্থতা নয়, চাই মনের গভীর-তলের সেইসব প্রেরণা ও উৎকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তি যা মানুষের চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে রেখেছে সভ্যযুগের প্রথম দিন থেকে, যেদিন সে তার দুঃখ-ক্লেশময় অসমসাহসিক যাত্রা শুরু করলো কর্মক্ষেত্রে ও ভাব-লোকে।"

নেহরুর মনের আধ্যাত্মিক গড়নটা আরো-একটু স্পষ্ট হয় যখন তিনি বলেন : জীবনের সম্মুখীন হ'তে হবে "বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞান-নিষ্ঠ দর্শনের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এবং এ-সবের অতীত যা-কিছু তার প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা মনে রেখে।" এই বিজ্ঞানোত্তীর্ণ যা-কিছু সে-বিষয়ে তিনি আরো বলছেন : "জগতের পানে যখন তাকাই তখন আমার মনে রহস্যের ছোঁয়া লাগে, অতল গভীরতার ছোঁয়া। এই রহস্যাবৃত জগৎকে বোঝবার জন্য মন আকুল হ'য়ে ওঠে, তার পূর্ণ স্বরূপটি উপলব্ধি করবার জন্য এবং তার অন্তর্নিহিত সুরের সঙ্গে আমার মনের সুরটি মেলাবার জন্য।" সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য নেহরু যেন নিজেকেই সাবধান ক'রে দেন যে, "একে বোঝবার প্রকৃষ্ট প্রণালী বৈজ্ঞানিকের নৈর্ব্যক্তিক ও তন্নিষ্ঠ বিচারপদ্ধতি।" কিন্তু এটা কি স্পষ্ট নয় যে, বিজ্ঞানের পথ সেই অতল গভীর রহস্যের পূর্ণ স্বরূপটি উপলব্ধি করবার বা তার সুরে সুর মেলাবার পথ নয় ? সে-পথটি আধ্যাত্মিক সাধনার

পথ। তাই যদিচ নেহরু ব্যক্তিস্বরূপ-ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন, তবু আমি না-মনে ক'রে পারি না যে, তাঁর চিত্তের একটি গোপন কক্ষ ভক্তি-ভাবে না-হোক্ তারই সহোদর কোনো ভাবে ভরা ছিলো। উ'নিশ শতকী কালাপাহাড়ী সেকুলারিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারতেন ব'লেও আমার মনে হয় না।

এটা সত্য যে নেহরু বিশ্বাস করতেন আজকের দিনের প্রকৃত দ্বন্দ্ব হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে নয়, বরং উভয়ের সঙ্গে সর্বজয়ী বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির ও বিজ্ঞান-নির্ভর আধুনিক সভ্যতার। এই নবযুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে তিনি কতোখানি আগ্রহী ছিলেন তা-ও সুবিদিত। কিন্তু এ-সবের এমন অর্থ করলে ভুল হবে যে, নেহরুর মতে বিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে একান্ত আবদ্ধ যে-চিন্তা ও দৃষ্টি তা ধর্ম শব্দের অভিধাভুক্ত ভাব-বৈচিত্র্যের সম্পূর্ণতা বা যথোপযুক্ত পদাধিকারী হ'তে পারে। এ-কথার সমর্থনে আমি আরো-একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই: "প্রগতি, আদর্শ, মানুষের অন্তর্নিহিত শ্রেয়বোধ, মানবজাতির অনন্ত ভবিষ্যৎ—এ-সবের প্রতি আমাদের অপরাজেয় আস্থা কি বিধাতার বিধানের প্রতি ভক্ত-মনের যে ঐকান্তিক নির্ভরতা তার খুব কাছাকাছি নয়? কিন্তু এই আস্থার যাথার্থ্য যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণ করতে গেলে গোড়াতেই বাধা পাই। অথচ আমাদের মনের গভীরে এমন-কিছু আছে যা-আশা ও আস্থাকে আঁকতে ধরতে চায়, ছাড়লে যে জীবন এক রুক্ষ মরুভূমি হ'য়ে উঠবে।"

এমনি এক রুক্ষ মরুভূমির আভাস পাই আমরা একজন মহৎ কবির কাব্যে যাঁর জীবন উক্ত আশা ও আস্থা থেকে একেবারে বঞ্চিত ছিলো। জানি না নেহরু বোদ্‌লেয়রের কতোখানি গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু তিনি হপকিন্সের কবিতা ভালোবাসতেন, বিশেষভাবে পছন্দ করতেন সেইসব কবিতা যেখানে ঐ ঋত্বিক কবির মন জগতের রূঢ়

আঘাতে জর্জরিত ও আত্মদ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট হ'য়েও ঈশ্বরকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন করতে পেরেছে :

Wert thou my enemy,
O thou my friend.
How would'st thou worse,
I wonder, than thou dost
Defeat, thwart me ?

ধর্মভাবের একটি অর্থ অনন্তের প্রতি রহস্য, বিস্ময়, আনন্দ ও শ্রদ্ধার ভাব। এই অর্থে নেহরুকে ধার্মিক না-ব'লে উপায় নেই। সঙ্গে-সঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁর কালেজী শিক্ষা ছিলো বিজ্ঞানের, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মেজাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো ঘনিষ্ঠ ; এবং তাঁর একান্ত সাধনা ছিলো যে তাঁর দেশের মধ্যযুগীয় মন ঐ-মেজাজ ও পদ্ধতির সংস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হোক্, নবযুগধর্মে দীক্ষালাভ করুক। আধ্যাত্মিক প্রেরণা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এই শুভ সঙ্গম, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অতীত যা তার প্রতি গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মের শাস্ত্রমানা দলবদ্ধ রূপের বিরুদ্ধে উদ্দীপনাময় বিদ্রোহ — জওয়াহরলাল নেহরুর মনের এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। আমরা তাঁর কাছ থেকে যে বিরাট উত্তরাধিকার পেয়েছি তার মধ্যে এই মনটা সবচেয়ে মূল্যবান, আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, — শুধু এ-দেশের পক্ষে নয়, সব দেশের পক্ষেই।

২

ভারতীয় সংবিধান পরিষৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শটাকেই বরণ করলেন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে মজবুৎ করা। কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধি একটা উল্টো বিপদ ডেকে আনতে পারে। জনগণ যখন তাঁদের সাংবিধানিক অধিকারের রাজনৈতিক প্রয়োগে ক্রমশ অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবেন তখন যে-সব বহু প্রাচীন পরম্পরা-

গত অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির দ্বারা গণচিত্ত অনেকাংশে আজও চালিত তার নানাবিধ রাষ্ট্রিক প্রকাশের সম্ভাবনা কি দেখা দেবে না? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক প্রগতির সূত্রপাত উপরিতলেই ঘ'টে থাকে, কিন্তু সে-প্রগতি অচিরে রুদ্ধ হ'য়ে যাওয়া খুবই সম্ভব যদি-না নিম্নতলবর্তী লোকেদের মনে তা অনুকূল সাড়া জাগাতে পারে। নতুন যুগের আলোকপ্রাপ্ত স্বল্পসংখ্যক নেতৃবর্গ ও সুধীবৃন্দের মধ্যে যে সংস্কার-মুক্তি, পরমতসহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক উদারতা দেখা দিয়েছে তা যদি অধিকাংশের মধ্যে পরিস্ফুত না-হ'তে পারে, তবে অধিকাংশের গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি অদূর ভবিষ্যতে সেকুলার রাষ্ট্রের সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলিকে ব্যর্থ ক'রে দিতে সক্ষম হবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

আমাদের সেকুলার গণতন্ত্রের ভিৎ গড়া হয়েছিলো ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে। আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি ও গর্ব ক'রে থাকি যে, সমস্ত আফ্রো-এশিয়াতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা সফল হয়েছে একমাত্র ভারতবর্ষেই (জাপানকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু ঐ 'হয়তো' পদটা যোগ করতে হয়)। তবু মনে-মনে আমরা সবাই জানি (এবং বিদেশী কেউ উপস্থিত না-থাকলে মুখেও মানি) যে, সেকুলার গণ-তন্ত্রের ইমারৎ তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু ভিৎটা এখনও কাঁচাই র'য়ে গেছে। তার প্রধান কারণ অশিক্ষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক বিচার বর্ণগত ও সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির দ্বারা অনেকটা আচ্ছন্ন, তাদের মনের উপর নানাপ্রকার গোঁড়ামি কুসংস্কারাদির প্রভাব প্রবল—এক কথায় সে-মন এখনও মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসেনি। শুধু জনসাধারণ কেন, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও শতকরা আশিজন আজও দিব্যি দুই নৌকোয় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন প্রভৃতির সময়ে মনে হয়েছিলো যেন আমাদের হাজার বছরের ঘুম অবশেষে ভাঙলো, অন্তত

ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণীর চিত্ত নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত, নতুন ভাবের চিন্তার কর্মের অনুপ্রেরণায় বেগবান হ'য়ে উঠলো। কিন্তু সেটা স্বল্প-কালের ব্যাপার। দু-তিন দশক পার না-হ'তেই উত্তাল স্বাদেশিকতার তোড়ে নবজাগরণের স্রোত গেলো ঘুরে। নতুন যুগকে একেবারে বর্জন না-করলেও তাকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে আমরা চললাম মনু-পরাশর-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমুখে। রবীন্দ্রনাথ, গোখলে, জওয়াহরলাল প্রভৃতি কতিপয় মনীষী এই উল্টো গতি ঠেকাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁদের সাফল্য সীমিতই রইলো। রেনেসাঁসকে কোনঠাসা করলো রিভাইভালিজম্; নবযুগের জন্য যে-আসন পাতা হয়েছিলো তার অনেকখানি জুড়ে বসলো প্রাচীন যুগের প্রেতচ্ছায়ারা। মুসলিম সমাজের অবস্থা তখন আরও শোচনীয়। সৈয়দ আহমদ ইসলাম ধর্মকে সাম্প্রদায়িক অন্ধ বিশ্বাসের স্তর থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তির সাবালক পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির উপর স্থাপিত করার যে শুভ প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন তা অচিরে রুদ্ধ হ'লো; গোঁড়ামির জগদ্দল পাথর নড়লো না। শেষ অবধি আবুল কালাম আজাদের মতো উদারবুদ্ধি ও গভীর জ্ঞানী মানুষকে হার মানতে হ'লো মুহম্মদ আলি জিন্নার মতো ইসলামী শাস্ত্র ও সংস্কৃতি ব্যাপারে অননুরাগী ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কৌশলের কাছে।

সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি ধর্মের চেয়ে ধর্মসম্প্রদায়কে এবং ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীকে বড়ো ক'রে দেখা। যে নিজেকে সবসময়ে হিন্দু বা মুসলমান ব'লে ভাবতে অভ্যস্ত, অন্যের সঙ্গে পরিচিত হ'লে তার চরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ইত্যাদির খোঁজ না-নিয়ে প্রথমেই জানতে চায় লোকটি ব্রাহ্মণ না শূদ্র, হিন্দু না মুসলমান, ইহুদি না খ্রীষ্টান, সে সাম্প্রদায়িক মানুষ। এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শের সবচেয়ে বড়ো হন্তারক। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ইংরেজ সরকারের আদর-আপ্যায়নে পুষ্ট হ'য়ে দু-তিন দশক

ধ'রে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অশুভ শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিলো। ইংরেজদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থান্বেষী দূরদর্শিতা আর হিন্দুদের অদূরদর্শিতার আপতিক দুর্যোগের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে ঐ আসুরিক শক্তি দেশের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হানলো তাতে ক'রে দেশ দু-খণ্ড হ'য়ে গেলো। খণ্ডিত ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার শিঙ ভেঙেছে কিন্তু মেরুদণ্ড ভাঙেনি এখনও। দুঃখের বিষয় এখনও সে আপন অনর্থপাতী ও আত্মঘাতী নির্বুদ্ধিতা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেনি। "হিন্দু মহাসভা" বা "রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সংঘে"র সোচ্চার হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা অবশ্য "মুসলিম লীগ" মার্কা স্থূল সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া ; কিন্তু সূক্ষ্ম, মোলায়েম ও মুদিতচক্ষু কতকটা অবচেতন, কতকটা অবগুণ্ঠিত, এক সাম্প্রদায়িকতা বহুকাল ধ'রেই বিদ্যমান রয়েছে এ-দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে।

মতামতের দিক থেকে হিন্দুরা খুবই সহিষ্ণু ও উদার সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের জাত্যাভিমান তীব্র, নিজেদের বহু প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে গৌরববোধ প্রচণ্ড এবং যারা হিন্দু জাতির গণ্ডীর বাইরে তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য অবজ্ঞা বদ্ধমূল। মাদ্রাজ হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি পি ভি রাজমন্নার আগস্ট ১৯৫৫ সালে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে অসংকোচে বলতে পেরেছিলেন যে তাঁর কাছে ভারতীয় সংস্কৃতি আর হিন্দু সংস্কৃতি শব্দদ্বয় অভিন্নার্থ। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ গান্ধি ও নেহরু অবশ্য হিন্দু সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহাপুরুষ ব'লে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উদারশিক্ষা সত্ত্বেও খুব অল্পসংখ্যক হিন্দুই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের কতকটা আরবী-ফার্সী উপাদান সংবলিত সংস্কৃতিও সুমহান ভারতীয় সংস্কৃতিধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।* তবু উক্ত মহাপুরুষ-

* অধিকাংশ মুসলমান প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিকে আপন ব'লে মেনে নিতে পারেন না, এ-কথাটা আরো সত্য এবং আরো শোচনীয়। তবে

গণের প্রভাব এমনই চিত্তোন্মেষক এবং ব্যক্তিত্ব এতোই ভাস্বর ছিলো যে তার পরিণামে হিন্দুদের কতকটা "রেশাল" বা জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা (প্রতিতুলনায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ডগ্‌মা-নির্ভর) কালক্রমে ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে ভারতীয় রাজনীতির নব-নব বিবর্তন-ধারায় বিলীন হ'য়ে যেতো—যদি-না সম্প্রতি হিন্দুদের মন অত্যন্ত তিক্ত হ'য়ে উঠতো পাকিস্তানের মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক নীতির এমন-কি পাকিস্তানের গ্লানিকর জন্মবৃত্তান্তেরই অভিঘাতে। ফলত, যদিও আমাদের সংবিধান ঔদার্যে, পরমতসহিষ্ণুতায় ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচারে পৃথিবীর আদর্শস্থল, তবু তা এ-দেশে মাঝে-মাঝে সাম্প্রদায়িক হিংসাবৃত্তির বিস্ফোরণ ঠেকাতে পারেনি। ভারতের হিন্দুরা যে (এবং শুধু হিন্দুরাই কেন?) পাকিস্তানী হিন্দুদের প্রাণ, সম্মান বা গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত এলে অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠবেন এটা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশার শোধ তুলবেন ভারতের মুসলমানদের উপর এটাকে স্বাভাবিক বলা যায় না —যদি-না আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকি যে আমাদের সভ্যতায় ট্রাইবল্‌ যুগের কতকগুলো প্রতিহিংসা-মূলক উপাদান—ইংরেজিতে যাকে বলে ব্লাড ফিউড—এখনো বলবৎ আছে।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কে যাঁরা মৈত্রী কামনা করেন তাঁরা সম্মিলন ও সমন্বয়ের উদাহরণগুলি খুঁজে-খুঁজে বার করেন —সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে, সাধু-সন্ত ফকির-দরবেশ আউল-বাউলদের সাধনায়, আকবরের মতন মহান সম্রাটের দূরপ্রসারী উদার বুদ্ধির রাজকীয় প্রকাশে। যাঁরা বিরোধকেই বড়ো করতে বদ্ধপরিকর তাঁদেরও খুব বেশি বেগ পেতে হয় না সংঘর্ষ ও সংঘাতের দৃষ্টান্ত উদ্‌ঘাটন করতে। বিজয়োন্মত্ত ক্ষমতাগর্বিত মাহমুদ গজনবী, আলাউদ্দীন খল্‌জী, ঔরঙ্গজীব,

আশার কথা এই যে, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মন ক্রমশ এ-সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠছে।

নাদির শাহ, আহমদ শাহ-রা যে-সব দানবিক কীর্তি ক'রে গেছেন তা-ও ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত ক'রে আছে। কিন্তু ঠিক এই ব্যাপারে ইতিহাসের উপর এতোটা নির্ভর করার কোনো প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করতে পারি না। ঐতিহাসিক কৌতূহল ভালো, জ্ঞানীগুণী ঐতিহাসিকের রচনা পাঠ ক'রে আনন্দ পাওয়াটা সঙ্গত। কিন্তু কোনো জাতি যদি তার ভবিষ্যৎ পন্থা খোঁজে ইতিহাসের পাতায়, তবে বলতেই হবে যে, এগিয়ে চলবার ইচ্ছা তার এখনও জন্মায়নি। ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সম্পর্কের ইতিহাসও কম নৈরাশ্যজনক নয়, ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির গত একশো বছরের মধ্যে তিন-তিনবার যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, অনেক রক্তপাত, অনাচার অত্যাচারের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু ঐ-সম্প্রদায় বা জাতিগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি সেই কারণে চিরকালের মতো তিক্ত হ'য়ে থাকবে? ইতিহাসের দ্বারা আমরা অনেক সময়ে চালিত হই এটা সত্য কথা, কিন্তু গৌরবের কথা নয়। এই সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করাতেই মনুষ্যত্ব। সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে অতীতকে মাথায় ক'রে বুকে ধ'রে নয় অতীতকে পিছনে ফেলে, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে অতীত জেনেই।

ইতিহাস যা-ই বলুক, ভারতে ও পাকিস্তানে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকসংখ্যক লোকের শিরায়-উপশিরায় ভেদবুদ্ধি এমন নিয়ত প্রবহমান যে যখন তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে ফেটে না-পড়ে তখনও তার নানাপ্রকার সূক্ষ্ম প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া দেখা যায়। উদাহরণত আমরা সাম্প্রদায়িক উপদ্রবকে বন্যা-মহামারী জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুল্য জ্ঞান করি, তারই মতো বেদনাদায়ক কিন্তু তার চেয়ে বেশি ন্যক্কারজনক নয়। অল্প লোকই উপলব্ধি করেন যে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় একটি অসহায় মানুষের প্রাণনাশ বন্যায় বা কলেরায় হাজারটি মৃত্যু অপেক্ষা অনেক বেশি মর্মন্তুদ ব্যাপার—কারণ প্রথমটি নৈতিক অধঃপতন, দ্বিতীয়টি প্রাকৃতিক বিপদ্‌পাত মাত্র। উইলিয়ম

জেম্‌স্‌ ধর্ম বিষয়ে গভীর ও অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ধর্মবিশ্বাস-জনিত অধ্যাত্মশক্তি যেমন অনেককে জনসেবার প্রেরণা যুগিয়েছে তেমনি আবার অনেককে সমাজকর্ম-বিমুখও করেছে। কিন্তু ধর্ম যখন এমনতরো বীভৎস বিরাট এক অমঙ্গলরূপে দেখা দেয় তখন ধর্মের সত্যতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে নতুন ক'রে ভাবতে হবে আমাদের। আমি এ-কথা মানতে প্রস্তুত নই যে, যে-রিলিজনের নামে নিধন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, গৃহদাহাদি সংঘটিত হয়েছে সম্প্রতি এবং হাজার-বছর ধ'রে হ'য়ে এসেছে ইউরোপ-এশিয়া জুড়ে—তা রিলিজনই নয়। রিলিজন তাকে বলতেই হবে, তবে তা রিলিজনের একটি বিশেষ রূপ—তার সংঘবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক রূপ। একে যদি ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইসলাম বা সনাতন হিন্দুধর্মের সত্যরূপ না-বলতে চান তবে আমি আপত্তি করবো না। শুধু জিজ্ঞাসা করবো —খ্রীষ্টীয়, মুহম্মদীয় ও হিন্দুধর্মের সত্যরূপ কী ; ভাষান্তরে, সত্য ধর্ম কাকে বলবো ? মিথ্যা ধর্ম কী সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। একজন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ধর্মসাধকের ভাষাতেই উত্তর দেবো এখানে। আধুনিক যুগের বিচারে রিলিজনের পরতে-পরতে যে বিরাট কলঙ্কের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে তা অনেকাংশে মেনে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "এ-কালিমার মূল কোথায় তা আমাদের দেখতে হবে। এর মূল ধর্মের সত্যপ্রকাশে নয়, আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ও সাধনায় নয় ; মূল খুঁজে পাওয়া যাবে বুদ্ধির আলোককে যেখানে রিলিজন ধূলিমলিন করেছে, মূঢ় ভ্রান্তিবিলাসে মগ্ন হ'য়ে নিজেকে এক ক'রে ফেলেছে বিশেষ একটি মতবিশ্বাস, সম্প্রদায়, আচার-অনুষ্ঠান বা সংস্কার সঙ্গে।"

এই মূঢ় বিভ্রম ("ignorant confusion") ইতিহাসের পাতা জুড়ে অযথা টিঁকে রয়েছে এবং অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছে যুগ-যুগ ধ'রে। এর জন্য কোটি-কোটি মানুষকে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এরই উলটো দিকটা আরও

গ্লানিকর,—যারা ধর্মান্ধতা ও ধর্মবিদ্বেষের কবলে প'ড়ে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর স্তরে নেবে গেছে তাদের সংখ্যাও কম নয়।

ইউরোপে যদি এই তামসিকতারও অবসান ঘ'টে থাকে তবে তা এইজন্য নয় যে ইউরোপের লোকেরা সেই মূঢ়তা থেকে মুক্ত হয়েছে যে-মূঢ়তা সম্প্রদায়ের ধর্মকেই মানুষের ধর্ম ব'লে জানে। বরঞ্চ তার কারণ সেখানে রিলিজনই অনেকের মন থেকে দূরে স'রে গেছে। ধর্ম-শাস্ত্রে অন্ধ বিশ্বাস অবশ্য এখনও কোথাও-কোথাও রয়েছে, এমন-কি আনুষ্ঠানিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও চলছে, তবু মোটামুটি বলা যায় যে ইউরোপীয় মনের, অন্তত পরিশীলিত মনের, প্রবণতা ধর্মক্ষয়ের দিকেই। এ-প্রসঙ্গে ফ্রান্সে নাস্তিক জীবনবাদ (atheistic existentialist) ও মার্কস্‌বাদ এবং ইঙ্গ-মার্কিনী দেশসমূহে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির উচ্ছেদকামী পজিটিভিস্ট ও এম্পিরিসিস্ট দর্শনের মানসিক আধিপত্য লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্যের পক্ষে এটাই হয়তো অগ্রগতির পথ। কিন্তু ঠিক সেই পথে আমরাও এগিয়ে চলবো এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। ভারতীয় মনের অন্তরতম স্তরে রয়েছে এমন এক আধ্যাত্মিকতার আমেজ যাকে মুছে ফেলা আমার মতে সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকা ইতিমধ্যে নগণ্য হ'য়ে এসেছে। সামাজিক জীবনেও দ্রুত হ্রাস পাবে ব'লে আশা করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মের কোনো স্থান থাকবে না যে-দিন সে-দিনের জন্য আমি খুব আগ্রহান্বিত নই।

ধর্মের অবক্ষয় আমি চাই না তবে ধর্মসম্প্রদায়ের অবসান অবশ্যই কামনা করি। হোয়াইটহেডের সংজ্ঞানুযায়ী : "Religion is what the individual does with his own solitariness." সেই নিভৃত ধর্মের আসন পাতা থাক আমাদের মনে-মনে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের দেশজোড়া আসনটি গুটিয়ে নেবার দিন এসেছে। ক্যান্টওয়েল

স্মিথ ঠিকই বলেছেন, "ভারতবর্ষে সেকুলারিজম্ হয় দানা বাঁধবেই না, নয়তো নতুন কোনো রূপে নিজেকে প্রকাশ করবে।" আমার মতে সেই নতুন রূপটি দেখা দেবে যখন আমরা ধর্মকে ধর্মসম্প্রদায় থেকে পৃথক ক'রে বুঝতে শিখবো ; উপলব্ধি করতে পারবো যে আধ্যাত্মিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরস্পর-ব্যতিরেকী।

ধর্মসম্প্রদায় গঠন করবার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিলো একদিন। পৃথিবীর প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মের আদি প্রতিষ্ঠাতারা (হিন্দুধর্ম এ-দিক দিয়ে ব্যতিক্রম) একপ্রকার বিপ্লবী শক্তিরূপেই দেখা দিয়েছিলেন ; তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন চলিত মতবিশ্বাস, নীতিবোধ, প্রথাপদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। কাজেই তাঁদের প্রথম ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যবর্গকে নিতান্ত আত্মরক্ষার গরজে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হয়েছিলো। তেমন সংগঠিত আত্মরক্ষার প্রয়োজন আজ আর নেই। ধর্মের ব্যাপারে নতুন কথা বলতে যাঁরা আসেন তাঁরা শ্রদ্ধা, উপেক্ষা বা পরিহাস-ভাজন হ'তে পারেন। কিন্তু তাঁদের একেবারে সমূলে উৎপাটন করার জন্য আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্র হিংস্র হ'য়ে ওঠে না।

প্রাচীন যুগে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি অনিবার্যভাবে জড়িত ছিলো। রাজনীতির প্রকৃত কর্মক্ষেত্র সমাজের সুষ্ঠু গঠন ও উন্নয়ন ; ধর্মের ক্ষেত্র মনের সৌষ্ঠব ও শান্তি। আজ যখন সর্বত্রই কর্মবিভাগের আবশ্যকতা মেনে নেওয়া হয়েছে তখন এটুকু বুঝতে বাধা কেন যে, মানব-জীবনের সবচেয়ে গুরুতর দুই ক্ষেত্রেও সীমারেখা অস্পষ্ট রাখলে উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আজও রয়েছে, কিন্তু সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা ও বিবর্তনের দায়িত্ব এখন সেকুলার নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মসংস্থা আজ নিষ্প্রয়োজন ; শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, এক মস্ত বড়ো অন্তরায়। জাতীয় জীবনে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের অন্তরায় তো বটেই, ধর্মসাধনার পথেও ধর্মসম্প্রদায়ের দুর্মর অস্তিত্ব রীতিমতো

একটি বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভাববার কোনো কারণ নেই যে চোদ্দশো, দু-হাজার বা তিন হাজার বৎসর পূর্বে ধর্মসাধকরা যে-স্তরে উঠেছিলেন সেখান থেকে শুধু নাবাই সম্ভব, অবনতিই অনিবার্য—যদি-না আমরা সেই দূর অতীতকালের খুঁটি আঁকড়ে আধ্যাত্মিক অধঃপাত থেকে নিজেকে কোনোমতে রক্ষা ক'রে চলি। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাবতীয় বিভাগ যখন এগিয়ে চলেছে, নতুন-নতুন পথ খুঁজে বার করেছে, তখন কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো যে, অধ্যাত্মসাধনার বেলাতেই কেবল আমাদের অভিব্যক্তির সকল সম্ভাবনা ফুরিয়ে গেছে, কোনো-এক অতীত যুগের মন্ত্র আউড়ে আমরা পাথর হ'য়ে গেছি; চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছি?

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা
পথে চলা, সেই তো তোমায় পাওয়া।

কিন্তু এ-পথ একলা পথিকের। বিজ্ঞানের উন্নতি হয় বহু সাধকের মিলিত চেষ্টায়, লক্ষ-লক্ষ মানুষের কর্মশক্তি যুক্ত হ'লে তবেই সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে: কিন্তু ভগবানের আসন হৃদয়ের গোপন কক্ষেই।

ধর্মসম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রকৃত সন্ধানী কিছুই পেতে পারেন না। যাঁদের অন্তরে সাধনা নেই অথচ মুখে ধর্মের বুলি আছে, তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পান গোঁড়ামি আর আনুষ্ঠানিক আচার। অথচ এই দুই প্রকাণ্ড বেড়া ভাঙতে না-পারলে ধর্মের পথে এক পা-ও এগুনো সম্ভব নয়। ধর্মের মধ্যে হয়তো কিছু শাশ্বত সত্য আছে, কিন্তু নিত্য নতুন ক'রে তাকে পেতে হবে, যুগে-যুগে জনে-জনে নব-নব আধারে তাকে ধরতে হবে। ধর্ম শুধু কয়েকটি বুলি নয় যা তোতা পাখির মতো শিখে ফেলা যায়, কসরৎমাত্র নয় যা কয়েক মাসে ডন-বৈঠকের মতো অভ্যাস ক'রে নেওয়া যায়। বহু বৎসরের ব্যাকুল হতাশ অন্বেষণের পর হয়তো পথের ক্ষীণ আভাস দেখতে পাওয়া যাবে। তবু প্রত্যেককে এই আত্মিক অন্ধকারে ক্ষতবিক্ষত চরণে একাই চলতে

হবে। দেড় হাজার দু-হাজার বৎসর পূর্বে কোনো মহাত্মা বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন বা গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন ব'লে আমাদের মতো ক্ষুদ্রাত্মা-মাত্রের পথ চলা শেষ হ'য়ে যায়নি। স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান সাধক ব'লে গেছেন : "বৈচিত্র্য তো থাকবেই কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ। আমি প্রার্থনা করি সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ুক, শেষ পর্যন্ত যতোজন মানুষ ততোগুলি সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠুক এবং প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ধর্মচিন্তা ও সাধনাপদ্ধতি তৈরি হোক্।" সকল সত্যসাধকের অভিজ্ঞতাই অনুরূপ—মুসলিম সুফীদের, ক্রিশ্চান মিস্টিকদের এবং হিন্দু যোগীদের।

আমি জানি যাঁরা ধর্মের মধ্যে শাস্ত্র-বিশ্বাস আর আচার পালনকেই বড়ো ক'রে দেখেন তাঁদের কাছে স্বামিজীর উক্ত অভিজ্ঞতার মূল্য অল্পই। এইসব লোকের নির্মম ধর্মান্ধতা বহু মহান সাধককে হত্যা করেছে অতীতকালে। কিন্তু আজ ধর্মসম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করার প্রস্তাবে সবচেয়ে প্রবল বাধা ধার্মিকদের কাছ থেকে আসবে না, আসবে রাজনৈতিকদের কাছ থেকে, সেইসব ক্ষমতালোলুপ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে যাঁরা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রাজনীতির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত।

গোঁড়ামি আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে এবং পরস্পরকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। দুটোরই মূলে রয়েছে ধর্মশিক্ষাদানের অতিশয় ভ্রান্ত চিরাচরিত প্রথা। শিশুবয়সে যখন ভালোমন্দ সত্যাসত্য বিচার করবার মতো চিৎশক্তি আদৌ তৈরি হয়নি, তখনই আমরা সম্প্রদায়-বিশেষের কতকগুলি অবোধ্য শাস্ত্রবাক্য বা ডগ্‌মা মুখস্থ করাই, কতকগুলি অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান অভ্যাস করাই। তার চেয়েও যেটা সাংঘাতিক, ভিন্ন মত, আচার ও অনুষ্ঠানের প্রতি

অতিশয় অবজ্ঞার ভাব আমরা সেই কাঁচা বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের মনে পাকা করিয়ে রাখি। সব দেশেই এটা কুশিক্ষা, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে—যাকে আমরা বহু দূরদেশাগত মত ও পথের ত্রিবেণী-সঙ্গম ব'লে গর্ববোধ করি—এ-কুশিক্ষার অনিষ্টকারিতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

আমার বিবেচনায় সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের অভিঘাত থেকে শিশুমনকে সযত্নে রক্ষা করা দরকার। ধর্মের সর্বজনীন ও মূল ভাবখানা (মানব-প্রেম এবং অনন্ত বিশ্বের প্রতি গভীর রহস্যবোধ) তারা অবশ্য গ্রহণ করতে পারে শ্রেষ্ঠ শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত থেকে, কিন্তু ইস্কুলে বা তৎপূর্বে এমন-কোনো ধর্মমত বা আচার শেখানো উচিত নয় যা তাদের বুদ্ধির অগম্য বা যা তাদের মনে সেই বয়স থেকে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ভিৎ তৈরি করতে পারে। অবশ্য যদি ঘরে বা বাইরে কোনো ধর্মকথা শুনে অথবা ধর্মাচার লক্ষ ক'রে ছেলেমেয়েদের মনে সে-বিষয়ে কৌতূহল জাগে তবে সে-কৌতূহল নিবৃত্ত করাই ভালো, কিন্তু পিতা-মাতা বা শিক্ষকেরা যা বলবেন তা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। প্রাপ্ত-বয়সে অর্থাৎ ইস্কুল শেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীরা যখন কলেজে প্রবেশ করবে তখনই ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত সময়। তখন প্রধান-প্রধান সব ধর্মেরই মূল কথা এবং সেই কথাগুলির মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য দুই-ই তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার; আদিম বর্বরাবস্থা থেকে ধর্মভাব ও চিন্তা কোন্ পথে এগিয়ে গেছে আর কোথায়-বা অতি প্রাচীন কুসংস্কারে আটকে প'ড়ে আছে, তা-ও তাদের বোঝানো উচিত।

কেউ-কেউ হয়তো এখানে প্রশ্ন করবেন—শৈশবেই যখন নানা-প্রকার ঐহিক বিদ্যা শেখাতে আমাদের আপত্তি নেই তখন ধর্মশিক্ষা-দানই বা ঐ-বয়স থেকে আরম্ভ করবো না কেন? উত্তরে বলবো, ছোটোদের শিক্ষা-ব্যাপারে আমরা দুটি নীতি মেনে চলি—এমন-কিছু

শেখাই না যা তাদের বুদ্ধিগম্য নয় অথবা যে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও গুরুতর মতভেদ রয়েছে। ধর্মশিক্ষার বেলা এই সর্বসম্মত নীতিদ্বয় লঙ্ঘন করার কোনো কারণ দেখি না।

গড্, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আল্লা ইত্যাদি শব্দ শুনলে আমাদের মনে কী ধারণা বা প্রত্যয় জন্মায়? ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে যে-ইয়েহোভার কথা আছে তিনি এক সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজ যাঁর বজ্রকঠিন বিধানে ন্যায়বিচার আছে কিন্তু করুণা বা ক্ষমার স্থান সঙ্কুচিত; নিউ টেস্টামেণ্টে পাই অশেষ করুণাময় পিতাকে যিনি পাপী-তাপীর দিকে স্নেহার্দ্র ক্ষমায় হাত বাড়িয়ে আছেন; উপনিষদে যে পরম-একের কথা বলা হয়েছে তিনি সকল ভাবনা ও ধারণার অতীত, নির্গুণ ও নিরুপাধিক; অথবা ঈশ্বর কি এক চিরদুর্ভেদ্য অনন্ত রহস্যেরই নাম, নাকি আমাদেরই মনের মধ্যে অধরা সুন্দরের, অসাধ্য শ্রেয়সের ভাবচ্ছবি? পাপ-পুণ্য কি জাগতিক নিয়মেই কর্মফলপ্রসূ, অথবা এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বিচার-পতির নিকট যথোপযুক্ত শাস্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়? এ-সব প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাত্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিশারদরা একমত নন, এবং এর কিছুই ছোটো ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। ধর্মের মধ্যে যা-কিছু সত্য ও মহান তা গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ, আজীবন সাধনা-সাপেক্ষ। যখন দেখি যে আমাদের শাস্ত্রনিষ্ঠ ও আচারবদ্ধ ধার্মিকরা মনে করেন ধর্মশিক্ষা কেবল ধরতাই বুলি মুখস্থ এবং চিরাচরিত আচার অভ্যাস করানোর ব্যাপার আর তা অল্প বয়সেই বেশ সুসম্পন্ন হ'তে পারে, তখন সত্যধর্মের প্রতি তাঁদের এই গভীর অশ্রদ্ধা আমাকে অবাক করে।

উপসংহারে আরও-একটি ব্যাপারে আমার বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করি। ভারতবর্ষের মতো দেশে—যেখানে ধর্মের বালভাষিত স্ফুরণ থেকে মহীয়ান পরিণতি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত, যেখানে সবক'টি মুখ্য ধর্মের লক্ষ-লক্ষ প্রতিনিধির সঙ্গে আমরা দেশাত্মবোধের সূত্রে বদ্ধ, যেখানে এই বিংশ শতাব্দীতেও

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, শ্রীঅরবিন্দ, রমণ মহর্ষি ও সুফী সফীউল্লার মতো ব্যক্তিতে ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, এবং যারা ছোরা বোমা ও পেট্রল হাতে আর আল্লাহু আকবর কিংবা বন্দে মাতরমের জিগির মুখে মনুষ্যত্বের হানি ঘটায় তাদের মধ্যে ধর্মের জঘন্যতম রূপ খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ উপস্থিত—সেখানে প্রধান-প্রধান ধর্মসমূহের গতি-প্রগতি ইতিহাস মনস্তত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে শিক্ষালাভের কোনো সুব্যবস্থা নেই। আমরা হিন্দুধর্মচর্চা করতে পারি কাশীতে, ইসলাম দেওবন্দে, ক্রিশ্চিয়ানিটি ডিভিনিটি কলেজে, কিন্তু এগুলির একত্র অনুধাবন, তাদের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান ঘাতপ্রতিঘাত সমন্বয় ও ও বিরোধ বিষয়ে অনুসন্ধান করবো কোথায়? মানুষের মন বুঝতে হ'লে (একই সমাজে একই রাষ্ট্রে সার্থক সহযোগিতায় বাস করতে গেলে বুঝতে হবে বৈ-কি) যা তাদের দেবতুল্য এবং পশুর অধম ক'রে তোলে—অর্থাৎ তাদের ধর্মচিন্তা, আচার ও অনুভূতি—সে-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া একান্ত আবশ্যক। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্বন্ধে আমরা অল্প-স্বল্প যদি-বা কিছু জানি, অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা নিটোল, সুতরাং অবজ্ঞা নিরেট। শিক্ষার এই সর্বজনীন অভাব দূর হবে তখনই যখন আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টার সঙ্গে সরকারী চেষ্টাও যোগ দেবে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের (comparative religion-এর) পুরোদস্তুর এক-একটি বিভাগ কেন্দ্রাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অচিরে স্থাপিত হোক্, পরে অন্য-সব বিশ্ববিদ্যালয়ও সে-দৃষ্টান্তে উদ্‌বুদ্ধ ও কর্মতৎপর হবে আশা করা যেতে পারে।

১৩৭২

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'বিসর্জন'

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

বাইশ বছর বয়সে লেখা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই যা আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নাটক হিসাবে এই রচনার সার্থকতা বিষয়ে যদিও দ্বিমতের অবকাশ আছে, তবু কবির হৃদয়মনের সম্যক্ পরিচয়লাভের জন্য এটির গুরুত্ব তর্কাতীত। আসলে বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের সংঘাতে গ'ড়ে-ওঠা নাটক এটি নয়, এ-নাটক সৃষ্টি হয়েছে বিপরীত ভাবের সংঘাতে। পঞ্চাশ বছর বয়সে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে ব'সে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই উচ্চাভিলাষী কৈশোরিক নাটিকাটিই তাঁর পরবর্তী সমগ্র সাহিত্যকর্মের মুখবন্ধ।

মৈথিলী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে লেখা 'ভানুসিংহের পদাবলী' ছাড়াও আরও দুটি কবিতার সঙ্কলন এবং তিনটি নাটক ইতিপূর্বেই প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে সে-সব রচনায় অপরিণত কৈশোরের লক্ষণ সুস্পষ্ট। 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি বাঙালী পাঠকমাত্রের কাছেই সুপরিচিত। কিন্তু এই অযথা দীর্ঘ কবিতার গুরুত্ব কাব্যগুণের জন্য ততো নয়, যতোটা কবির একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার সোচ্ছ্বাস স্বাক্ষর হিসাবে। কবির অন্তর্মুখী বালক বয়সটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছিলো ব'লে তিনি খানিকটা নির্জনতাবিলাসী হ'য়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া অন্তরে একটা বিষণ্ণতা সযত্নে লালন করতেন তিনি যার কোনো সঙ্গত কারণ তাঁর বাস্তব পরিবেশে পাই না। তাঁর প্রথম কাব্যসঙ্কলন 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' অধিকাংশ কবিতাই তো বলতে গেলে বায়রণ-সদৃশ দুঃখবিলাসে অবগাহন। ব্যক্তিগত দুঃখের সঙ্গে এসে মিশেছে, জর্মানরা

যাকে বলেন, বিশ্ববেদনা (weltschmerz)।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" উল্লাসের কাব্য। হঠাৎ যেন একটি যবনিকা স'রে যাওয়ায় কিংবা একটি প্রাচীর ধ্ব'সে পড়ায় কবির বন্দী হৃদয় বিশ্বের সান্নিধ্যলাভ করলো, তাই এই উল্লাস। যে-সব রাহসিক অভিজ্ঞতার কথা আমরা মরমিয়া সাধকদের লেখায় এবং বাণীতে পেয়ে থাকি, রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতা তাদেরই সগোত্র। যদিও রবীন্দ্রনাথকে মরমিয়া কবি ব'লে বর্ণনা করা হয় এবং কবীর ও কোনো-কোনো খ্রীষ্টান মিস্টিকের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাঁকে, তবু সত্যি বলতে কি জীবনে এই একবারই তাঁর সেই রাহসিক অভিজ্ঞতা ঘটেছিলো যাকে 'দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হওয়া' বলা যায়; অন্তত এই একটিবারের কথাই তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। কিন্তু এই বিশেষ অভিজ্ঞতাটিকে তিনি অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নানা লেখায় বার-বার এর উল্লেখ করেছেন। শেষবার সম্ভবত করেছিলেন তাঁর 'হিবার্ট লেকচার্স'-এ। তবে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি নিয়েছি 'জীবনস্মৃতি' থেকে: "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনও যবনিকা

পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।”

‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’কে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই নাট্যরূপ ব’লে গ্রহণ করা চলতে পারে। অবশ্য নাট্যরূপ দেবার প্রক্রিয়ায় ক্যানভাসটি বিস্তৃত হয়েছে এবং রঙের বৈচিত্র্যও বেড়েছে অনেকখানি। ইতিমধ্যে লেখক অবশ্য ‘প্রভাতসঙ্গীতে’র কৈশোরিক উচ্ছ্বাস কাটিয়ে উঠেছেন এবং অন্তত পক্ষে একটা মোটামুটিরকমের বিশ্বচেতনা আর পুরুষার্থের ধারণাও গ’ড়ে নিয়েছেন মনের মধ্যে।

নাটকে মুখ্য চরিত্র একটিই। অহঙ্কারী আর উদ্ধত এই সন্ন্যাসী নিঃসন্দেহে সেই নিঃসঙ্গ তরুণটির প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করতেন, যিনি তাঁর কৈশোরিক দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলিকে সে-সময়ে ততোধিক দীর্ঘ আর অপরিণত কিছু কবিতায় প্রকাশ ক’রে চলেছিলেন। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীতে’র কবি আর ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে’র সন্ন্যাসী, দু-জনেই তাঁদের কষ্টে অর্জিত নির্জনতায় আত্মমগ্ন ছিলেন বটে। কিন্তু দু-জনের সাদৃশ্য ঐ-টুকুইমাত্র। কবিটি ছিলেন বিষণ্ণ এবং নিঃসঙ্গ আর সেইজন্য আত্ম-করুণায় আপ্লুত; সন্ন্যাসীটি কিন্তু ছিলেন নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিষয়ে অহঙ্কারী এবং উল্লসিত। ক্ষুদ্রাকার এই নাটিকাটি শুরু হয় আত্মপ্রসন্ন সন্ন্যাসীর একটি স্বগতোক্তিতে। বিশ্বচরাচরকে বহুকষ্টে আপন অনুভূতির জগৎ থেকে বিসর্জন দিতে কৃতকার্য হওয়ায় সন্ন্যাসীর আত্মসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে এই উক্তিতে। জাগতিক কোনো দৃশ্য, কোনো শব্দ আর তাঁকে স্পর্শ করে না, কোনো লোভ তাঁকে আন্দোলিত করে না, কোনো দুঃখ বা শোক তাঁকে অভিভূত করে না। একসময়ে আর-সবার মতো তিনিও প্রকৃতির দাস ছিলেন, বাসনায় ও আশা-নিরাশায় আবদ্ধ ছিলেন; সেইসময়ে তিনিও অনুধাবন করতেন সেইসব পার্থিব সুখ, যা আস্বাদমাত্রই অন্তর্হিত হয় এবং পিছনে ফেলে যায় অনন্ত তিক্ততা। কিন্তু এখন যখন সন্ন্যাসী তাঁর অন্ধকার গুহা থেকে

বার হ'য়ে আসেন, তখন চরাচর প্রকৃতি নিষ্প্রভ ক্লান্তিকর মনে হয়, মনে হয় যেন তিনি সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ থেকে নীচে তাকিয়ে ক্ষুদ্র মানব-মানবীর নির্বোধ অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রা দেখে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ গৌতম বুদ্ধকে চিরকাল অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, নয়তো তিন পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে সন্ন্যাসীর উল্লসিত উক্তিটিকে কেউ অনায়াসে মনে করতে পারতো কাব্যের ভাষায় বুদ্ধেরই ঘোষণা :

সব কিছু আমি দমন করেছি, আমি এখন সর্বজ্ঞ।
সর্ববিষয়ে আমি অনাসক্ত, এবং সব কিছু ত্যাগ করে
অবশেষে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হওয়ায় আমি মুক্ত।
নিজেই জেনেছি তা, আর কাকে দেব কৃতিত্বের গৌরব ?
আমার কোনো উপদেষ্টা নেই, নন কেউ আমার তুল্য।
নরলোকে বা দেবলোকে নেই কেউ আমার সমকক্ষ ;
আমিই যথার্থ সম্মানের যোগ্য, অনতিক্রান্ত কীর্তি শিক্ষক আমি,
কেবল আমিই এক সর্বোত্তম বুদ্ধ, অবিচল অবিক্ষুব্ধ

অন্ধকারে আবৃত বিশ্বে আমিই শুধু অমৃত বাণীর ঘোষক।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে যখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তখন "বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে" এই ঘোষণাটি প্রায় বুদ্ধের সমান উৎসাহেই তাঁকেও করতে দেখি। কিন্তু সাংসারিক মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও অন্ধকারাবৃত পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা আরও তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। পরবর্তী দৃশ্যে দেখি গ্রাম্য লোকেরা নানারকম চপল আমোদ-প্রমোদে মগ্ন। এই দৃশ্যের গোড়াতেই আমাদের নায়ক যেহেতু দুটি পঙক্তিতে জানিয়েছেন :

আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে।
দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।

তাই আমাদের ধারণা হয় যে এই দৃশ্যে নিরপেক্ষভাবে গ্রাম্যজীবনের কোনো একটা দিক তুলে ধরা হয়নি। বরং স্বেচ্ছানির্বাসিত সন্ন্যাসীর বিচ্ছিন্ন ভূমি থেকে তাঁর চোখে যা পড়ছে তাই শুধু দেখানো হচ্ছে। বস্তুত নাটকের এই অংশে লক্ষ করি যে, জগতের প্রতি ঘৃণায় বিমুখ এবং জীবন-বিতৃষ্ণ গুহাবাসীটি সেইসব দৃশ্যেই বিভোর হ'য়ে আছেন যার সঙ্গে বোদলেয়রও আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন :

পৃথিবীটা বিশাল এক মৃতদেহ, তোমরা সবাই তার কৃমি,
ঐ শব আহার করে তোমরা পরগাছার মতো বেঁচে আছ ;
আর কয়েক মুহূর্তেই তোমাদের কিলবিল করা থেমে যাবে
এবং ঐ মৃতদেহই তোমাদের গ্রাস করবে।

কিন্তু ঐ ফরাসি কবিটি তখন পর্যন্ত আমাদের বাঙলাদেশে অপরিচিত ছিলেন এবং যতোদূর মনে হয় তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাছেও অজ্ঞাত।

ক্রমরূপান্তরিত মনোপ্রতিন্যাসের নাটক এটি। ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে এগিয়ে, কখনও-বা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চ'লে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর সেই প্রাথমিক সর্বব্যাপী অবজ্ঞা অপরিসীম ভালোবাসায় পরিণত হ'লো। অন্তিমে এমন একটি পরিণতিতে এসে দাঁড়ালো যেখান থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব শেক্‌স্‌পীয়রীয় সেই বাক্য : "Ripeness is all"। সন্ন্যাসীর এই পরিণতি সম্ভব হ'লো একটি ক্ষুদ্র অনাথা সমাজচ্যুতা বালিকার মাধ্যমে। মেয়েটি তখন দ্বারে-দ্বারে আশ্রয়ভিক্ষা করছে, আশ্রয়ভিক্ষা করছে এমন-কি পথের পথিকের কাছেও। কিন্তু সবাই তাকে দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায় বালিকাটির সাক্ষাৎ হ'লো সন্ন্যাসীর সঙ্গে, তাঁর কাছেই সে ছুটে গেলো সাহায্যের আশায়। সন্ন্যাসী তার প্রতি সদয় হলেন। বালিকাটিও পিতা ব'লে সম্বোধন ক'রে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। হৃদয়ের বিশেষ একটি তন্ত্রী স্পর্শ করায় স্নেহের সুর বেজে উঠলো। কিন্তু তবু সন্ন্যাসী নিজের প্রতি বিরক্তি

বোধ করতে লাগলেন। এইসব মানুষী দুর্বলতা কি তিনি ইতিপূর্বেই জয় ক'রে ফেলেননি? তাই তিনিও মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কন্যাটি তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁর সঙ্গ ছাড়তে চায় না। এইভাবেই সন্ন্যাসীর অন্তর্বিরোধের সূত্রপাত; উষ্ণ স্নেহ আর শীতল বৈরাগ্যের দুই বিপরীত বিন্দুর মধ্যে দোদুল্যমান হয় তাঁর চিত্ত। নাটকটির যা-কিছু নান্দনিক সৌন্দর্য তার উৎস এখানেই।

লক্ষ করতে হবে যে বালিকাটিকে ভালোবাসতে শেখার সঙ্গে-সঙ্গেই সন্ন্যাসী এই পৃথিবীর প্রতিও আকৃষ্ট হচ্ছেন, একেও ভালোবাসছেন। আবার নিজের প্রাক্তন বৈরাগ্য ফিরে পাবার জন্য যখন কাতর হয়েছেন তখন তাঁর মনে হচ্ছে, বালিকাটির ঐ মোহন হাসির ভিতর দিয়েই প্রকৃতি তাঁকে পরিহাস করছে। কিন্তু অল্প পরেই আবার সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিমূর্তি হ'য়ে ওঠে বালিকাটি; তখন আর সে প্রকৃতির পরিহাস নয়, প্রকৃতির আনন্দের দূতী।

সন্ন্যাসীর এই হৃদয়-পরিবর্তনের একটি অন্তর্বর্তী অধ্যায় রয়েছে যখন তিনি পৃথিবীকে আগের মতো আর ঘৃণা করছেন না, কিন্তু ভালোওবাসতে পারছেন না। তাঁর সেই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য স্বগতোক্তির প্রতিধ্বনি পরে বার-বার রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় ও নাটকে শোনা গেছে। নিচে উদ্ধৃত এই স্বগতোক্তির শেষ পঙক্তিটিতে যে শান্ত সমাহিতি দেখতে পাই তার সঙ্গে তুলনা করুন পূর্বে উদ্ধৃত পঙক্তি দুটিতে ("আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে / দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা") বিতৃষ্ণার সুর:

রুদ্রতালে নৃত্য করে এ মহাপ্রকৃতি।
আলোক আঁধার ছায়া, জীবন মরণ,
রাত্রি দিন, আশা ভয়, উত্থান পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।

শত গ্রহ শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর,
তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া!

সন্ন্যাসী তাঁর মনের এই নির্লিপ্ত অবস্থা অতিক্রম ক'রে যান, বুঝি তাঁর জীবনের করুণতম অভিজ্ঞতার পর এখানেই আবার ফিরে আসবেন ব'লে। একে বিশুদ্ধ কাব্যিক অনুভূতির অবস্থা মনে করা যেতে পারে, যেখান থেকে বিশ্বকে শান্ত বৈরাগ্য ও নান্দনিক দূরত্বের সঙ্গে ধ্যান করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাযুজ্য রয়েছে। তাঁর জীবনের করুণতম মুহূর্ত এসেছিলো 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার মাত্র দু-বছর পর। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ও উৎসাহদাত্রী বৌঠাকরুণ কাদম্বরী দেবী, যাঁর সাহচর্যে তিনি জীবনের সতেরোটি অবিস্মরণীয় বৎসর কাটিয়েছিলেন, এইসময়ে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। চব্বিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথের তখন মনে হয়েছিলো যেন সমস্ত বিশ্বই আত্মহত্যা করেছে, আর পিছনে প'ড়ে রয়েছে তাঁকে ঘিরে দিগন্ত থেকে দিগন্তব্যাপী এক নিঃসীম অন্ধকার। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে লিখেছেন, "নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। যাহা আছে আর যাহা রহিল না এই উভয়ের মধ্যে কোনো মতে মিল করিব কেমন করিয়া।" কবি তাঁর মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাবার পরে আবিষ্কার করলেন যে এই বিশ্বলোপী শোক তাঁকে এক নতুন উপলব্ধি দিয়েছে কিংবা বলা যায় পৃথিবীকে বোধ করার আর-একটা নতুন পথ ক'রে দিয়েছে। শোকের অব্যবহিত পরবর্তী সেই বীভৎস শূন্যতা থেকে যখন পৃথিবী আর-একবার ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হয় তখন তাঁর মনে হ'তে থাকে পৃথিবী যেন কিছুটা

দূরে স'রে গেছে : আগে তিনি ছিলেন এই বিশ্ব-নাটকের একজন আবেগ-বিক্ষুব্ধ নট, এখন হ'য়ে গেছেন নির্লিপ্ত আত্মসমাহিত দর্শক। "জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।" এমন শান্ত নান্দনিক দৃষ্টিতে বিশ্বের ভাঙাগড়া ধ্যান করার ক্ষমতা বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বেড়েছিলো এবং বৃদ্ধ বয়সে এই উপলব্ধিই যেন তাঁর ধর্মচিন্তায় পরিণত হয়েছিলো।

সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক্। তিনি বেশিক্ষণ এই মধ্যবর্তী নান্দনিক পর্যায়ে থাকেননি। বারকয়েক তিনি সেই সমাজ-পরিত্যক্তা বালিকাকে কাঁদিয়ে তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, আবার সে যখন তাঁকে খুঁজে বার করতে সক্ষম হয় তখন তাকে সাদরে আহ্বানও জানান। শেষবারের মতো তাঁর চ'লে যাওয়া আর ফিরে-আসাটিই এই নাটকের সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত। সকলের ঘৃণা আর অবজ্ঞার পাত্রী এই কন্যাটিকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন ব'লে তাঁর কাছে সকৃতজ্ঞ আনন্দ ব্যক্ত ক'রে সে একবার বলেছিলো, "যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে রব।" তখন সন্ন্যাসী নিজের মনে ভেবেছিলেন, "হায় হায় এ কী ভ্রম! জানে না সরলা। নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।" নাটক যতো এগিয়ে চলে এই ভ্রম ততোই সত্য হ'য়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী এই বালিকাটির প্রতি গভীর মমতা বোধ করতে থাকেন এবং এই ভালোবাসা ক্রমে প্রকৃতি ও মানব-সমাজেও প্রসারিত হওয়ায় সব-কিছুকেই মূল্য দিতে শেখেন। আবার নিজের হৃদয়ের এই পরিণতি দেখে তিনি আতঙ্কিতও বোধ করেন, ক্রুদ্ধ হন বালিকাটির প্রতি— সে-ই কি তাঁর এই পরাজয়ের কারণ নয়? তাঁর মধ্যে মানবিক আবেগ আর চিত্তদৌর্বল্য যা-কিছু ছিলো সব জয় ক'রে দেবতাদের মতো স্ব-তন্ত্র হ'য়ে তিনি নির্লিপ্তির যে-গিরিশৃঙ্গে উঠে গিয়েছিলেন সেখান

থেকে পতনের মূলেও কি এই বালিকাই নয়? তাঁর সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনি চিরকালের মতো চ'লে যেতে চান নির্জন গুহায় যেখানে কেউ আর তাঁকে আবেগে চঞ্চল ক'রে তুলতে পারবে না।

কিন্তু সে তো আর এখন সম্ভব নয়, জনহীন অরণ্যে যতো দূরেই তিনি আজ যান-না কেন আর যে একা হ'তে পারেন না। ক্ষুদ্র বালিকাটির মুখ, তার কণ্ঠস্বর, তার হাসি সর্বত্র তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলে। তাঁর জীবনের যে শূন্য গহ্বর এতোকাল পূর্ণ হবার জন্য আকুল প্রতীক্ষায় ছিলো সেই শূন্যতা ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। যে-জগৎকে এই বালিকা টেনে এনেছিলো তাঁর কাছে, সেই জগৎ থেকেও তো তাঁর স'রে যাওয়া সহজ নয়। বালিকার প্রতি যে-স্নেহ তাঁর হৃদয়ে জেগেছে সেই স্নেহের দৃষ্টি দিয়েই তিনি এখন বিশ্বচরাচরকেও দেখতে শুরু করেছেন ব'লে বিশ্বের রূপও তো সম্পূর্ণ পালটে গেছে তাঁর চোখে। তিনি একটি নূতন সত্য, মহৎ সত্য আবিষ্কার করেছেন। সে-সত্য এই যে, ভালোবাসা শুধু একজন ব্যক্তির জীবনটাই পালটে দেয় না, সমস্ত বিশ্বকেও পালটে দেয়। উদাসীন চোখে যা অত্যন্ত তুচ্ছ বা ক্লান্তিকর মনে হয় ভালোবাসার চোখে তা-ই অনন্ত রহস্যে আর সৌন্দর্যে ভ'রে ওঠে।

ঈশ্বর অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবেই অনুপস্থিত এই নাটক থেকে। অবশ্য এই নাটকের ধার্মিক তাৎপর্য আমাদের চোখে স্পষ্টই ধরা পড়ে। সন্তেরা, মরমিয়া সাধকেরা কখনও সংসারের ভিতর দিয়েই আবার কখনও এর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়েও ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন, দুর্গম অরণ্যে, নির্জন গুহায়। মরমিয়া সাধকদের কেউ-বা পৃথিবীকে ভালো-বেসেছেন, কেউ পৃথিবীকে ঘৃণা করেছেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই ঈশ্বর-প্রেমী। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী প্রচলিত অর্থে মরমিয়া সাধক নন, কারণ ঐ ক্ষুদ্র বালিকাটি তাঁর জীবনে না-এসে পড়া পর্যন্ত তিনি কোনো-কিছুই ভালোবাসতেন না। যেহেতু মানুষ এবং প্রকৃতি

উভয়কেই তিনি ঘৃণা করতেন তাই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন অন্ধকার গুহায়। তিনি অমূর্ত অনন্তকে ধ্যান করতেন, ভালোবাসতেন না। বালিকাটি তাঁর বক্ষে যে-ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে ক্রমে তা উপচে প'ড়ে ছড়িয়ে যায় সমস্ত মানব-সমাজে এবং প্রকৃতিতেও। শেষবার যখন বালিকাটির প্রতি আকর্ষণে সন্ন্যাসী আবার গ্রামে ফিরে আসেন তখন কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশেষে তাকে আবিষ্কার করেন তাঁর নিজেরই গুহার সামনে, মৃত। তখন বৃথাই আর্তনাদ ক'রে ওঠেন, "হায় হায় এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ?"

কে নিলো এই প্রতিশোধ তাঁর উপর? নাটকের শিরোনাম ঘোষণা করছে এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। কিন্তু কোন প্রকৃতি? এ কি সেই তুচ্ছ অবজ্ঞেয় প্রকৃতি যার সীমিত রূপ আগেই দেখেছিলেন সন্ন্যাসী? না কি এ সেই আশ্চর্য মহিমময় প্রকৃতি যার সীমাহীন আয়তন তিনি হৃদয়ে উপলব্ধি করেছিলেন কন্যাটির মৃতদেহ আবিষ্কার করার পূর্ব-মুহূর্তে? আধিভৌতিক জড়প্রকৃতি তো প্রতিশোধ নিতে পারে না। যদি-না অবশ্য কবিকল্পনায় আমরা প্রকৃতির মধ্যেও মানবিক অনুভূতি-গুলি আরোপ করি। আর আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে কি প্রতিশোধ-পরায়ণা ব'লে কল্পনা করা সঙ্গত? বালিকার এই মৃত্যুকে ভাগ্যের লীলাই মনে করা হোক্ কিংবা আর-কিছু, নাটকটি যখন চরম পরি-ণতিতে পৌঁছায় তখন এ-ঘটনাকে কিছুতেই শাস্তি ব'লে ব্যাখ্যা করা যায় না। যদি অবশ্য প্রতিশোধ বলতে এখানে তা-ই মনে হ'য়ে থাকে। কারণ যে-ব্যক্তি ইতিমধ্যে তার অপরাধ ও প্রমাদ থেকে মুক্ত হয়েছে তাকে কি কেউ শাস্তি দেয়! সন্ন্যাসী তো ইতিপূর্বেই মালিন্যমুক্ত হয়ে-ছেন। অথবা এর অর্থ কি এই যে, প্রকৃতিকে প্রেমের চোখে দেখে অসীম সুন্দর মনে হ'লেও সন্ন্যাসী কিংবা আমাদের কারুরই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে প্রকৃতি আসলে কঠিন এবং আমাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি নিতান্ত উদাসীন। আমাকে বরং এর অতি-নাটকীয় পরিণতিই কিছুটা

বিভ্রান্ত করে এবং মনে হয় কবি নিজেও যেন অল্প-একটু ভ্রমে পড়েছিলেন। কারণ বহু বৎসর পর এই নাটকের ইংরিজি রূপান্তর করতে গিয়ে এই শেষ অংশটি নিজেই অনেকটা বদ্‌লে দিয়েছিলেন। ইংরিজি নাটকে সন্ন্যাসী স্বচক্ষে দেখেননি যে কন্যাটির মৃত্যু ঘটেছে, হঠাৎ পথ-চলতি এক স্ত্রীলোকের কাছে দুঃসংবাদটি শুনতে পান। স্বভাবতই কথাটা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে। তবু যখন স্ত্রীলোকটি সেই সংবাদ পুনরাবৃত্তি করে তখন সন্ন্যাসী দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "তার মৃত্যু হতেই পারে না।" ইংরিজি নাটকে এটাই শেষ পঙক্তি। আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হ'তে পারি না যে, সংবাদটি যথার্থ না গুজব মাত্র।

এ কি কবিজনোচিত ন্যায়বিচার? সেজন্যেই কি ইংরিজি নাটকের চরম এবং শেষ মুহূর্তে বালিকাটিকে এভাবে মরতে দেওয়া সম্ভব হয় না? নাকি এতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ইতিমধ্যে পরিণত ধর্মবোধ, যার ফলে তিনি নাটকটির শেষ ক'টি পঙক্তি পাল্‌টে দিয়ে সমস্ত নাটকটিই পাল্‌টে ফেলেছেন। মূল নাটকটি লেখা হয়েছিলো যৌবনের প্রারম্ভে আর তার অনুবাদ করেছিলেন প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, গীতাঞ্জলি পর্যায়ে। এই দুই দশক কালের মধ্যেই তাঁর ধর্মচিন্তা বহুদূর পরিক্রমা করেছে। নাটকটি ট্র্যাজিক—পুরোপুরি ট্র্যাজিডি যদি একে না-ও বলি। কারণ বালিকাটির মৃত্যুতে সব-কিছু বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। ইংরিজি নাটকে দেখি সন্ন্যাসী বলছেন, "এতে (বালিকার মৃত্যুতে) সব কিছুরই মৃত্যু ঘটে"—"whose death will be death to all"। অর্থাৎ বিশ্ব-বিতৃষ্ণ সন্ন্যাসীর বিশ্ব-প্রেমিকে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি আবার সংশয়াচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো বালিকার মৃত্যুতে। কারণ সন্ন্যাসীর বিশ্বপ্রেম তো সেই প্রেমেরই প্রসার যা একদা তাঁর শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করেছিলো, এই পঙ্কজের আবির্ভাবে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র শেষ দৃশ্য আমাদের কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে এনে ফেলে, কারণ আমরা ভেবে পাই না যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত

এবং অবোধ্য এই মৃত্যুর ("যে মৃত্যুতে সব কিছুরই বিনাশ ঘটে") কী প্রভাব হবে এই সন্ন্যাসীর উপর, যিনি শাঙ্কর ভাবনা থেকে ক্রমে রাবীন্দ্রিক ভাবনায় উত্তীর্ণ হচ্ছিলেন। যা-ই হোক্ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে বাংলা নাটকটির 'বাণী' (অবশ্যই এর একটি 'বাণী' আছে) আমার এইভাবে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা করে : যা-কিছু বঞ্চনা এবং সর্বনাশ মানবিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে-সমস্তকেই স্বীকার ক'রেও বিশ্বকে ভালোবাসতে পারি আমরা। যখন নাটকটির ইংরিজি রূপান্তর করছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখন তিনি ব্যক্তি-স্বরূপ-ঈশ্বরে আত্মনিবেদন ক'রে আছেন। এ-জাতীয় ঈশ্বর-ভাবনার সঙ্গে অমন বিয়োগান্ত চিন্তা খাপ খায় না। গীতাঞ্জলি পর্যায়ে বিশ্ব-জাগতিক নিষ্ঠুরতার ছবিটা রবীন্দ্রনাথের চোখে আবছা হ'য়ে গিয়েছিলো। ঈশ্বর কখনও-কখনও 'নিষ্ঠুর' হন বটে তবে সে তাঁর প্রেম-লীলারই অঙ্গ। কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' এবং তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতাতেও যা অনাবৃত হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে সে হ'লো বিশ্বের উদাসীনতা, যদি তাকে নির্মমতা না-ও বলি।

সন্ন্যাসীর যে-চিত্র এই নাটকে আঁকা হয়েছে তার আদল 'গীতা' থেকে নেওয়া নয়, ইনি বীতরাগভয়ক্রোধ নন। যখন আমরা প্রথম সন্ন্যাসীকে দেখি তখন তিনি অহঙ্কারী এবং (সে-জন্যেই কি ?) এই বিশ্বের প্রতি অবজ্ঞায় পূর্ণ। তখন তিনি চোখ মেলে যা দেখতে পান তা হ'লো :

> বিশ্ব মহা মৃতদেহ, তারি কীট তোরা
> মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস বেঁচে —
> দুদণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি,
> আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া।

এ-দৃশ্য সত্য নয়। নাটকের উপান্ত পর্যায়ে যখন সন্ন্যাসী মানুষের সংসারে ফিরে আসেন স্নেহ-মমতার দীপ হাতে নিয়ে, যা ঐ-বালিকার

হাতেই জ্ব'লে উঠেছিলো, তখন আবার প্রকৃতির সব-কিছুই তাঁর চোখে জ্যোতির্ময় ঠেকে। গ্রাম্য মানুষগুলিকেও মনে হয় সহৃদয়, নির্দোষ আনন্দে উচ্ছল। এ-ও কি আর-একটা ভ্রান্ত চিত্র নয়? এই ভ্রান্তির নিরসন করা প্রয়োজন ছিলো বালিকার নিষ্প্রাণ বিবর্ণ মৃতদেহ আবিষ্কার ক'রে। মৃত্যু ঘটেছিলো সম্ভবত অনাহারে অবহেলায়। এই মৃত্যুর আঘাত সন্ন্যাসীর হৃদয়ে ফিরিয়ে আনবে সেই নান্দনিক নির্লিপ্তি, যাতে ক'রে তিনি মোহমুক্ত চোখে দেখতে পাবেন যে এই জীবন, এই বিশ্ব-বিভীষিকা আর আনন্দ উভয়ের সমন্বয়। হয়তো এই সামগ্রিক চিত্রটিতেই সন্ন্যাসী আবিষ্কার করবেন কোনো নান্দনিক রস এবং একেও ভালোবাসতে পারবেন, যেমন তাঁর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথও জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে বলতে পেরেছিলেন: "সত্য যে কঠিন, / কঠিনেরে ভালো-বাসিলাম।" না, আমি পরের কথা আগে টেনে আনছি। তাঁর বয়স বিশ পার হবার কয়েক বছরের মধ্যেই লেখা এই নাটকটিতে কখনও ঋজু কখনও-বা তির্যক ইঙ্গিত রয়েছে পরবর্তীকালের সেই শেক্‌স্‌-পীয়রীয় পরিণমনের, যার প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রূপক নাটকগুলিতে। এবং সত্তর পার হবার পরে রচিত গীতি-কবিতায়ও।

'বিসর্জন'

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন যে বিশ্বের নানা কঠিন নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার আঘাতে ভেঙে-পড়া তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের মাঝখানেও তিনি মানুষে বিশ্বাস হারাননি। আশি বৎসর বয়সে তিনি যে শেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন ('সভ্যতার সংকট') তাতে তিনি আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছিলেন, "মানুষে বিশ্বাস হারান পাপ।" এই বিশ্বাসের প্রথম আবেগোচ্ছল প্রকাশ আমরা পাই 'বিসর্জন' নাটকে। মূল বাংলা এবং ইংরিজি রূপান্তরে নামদুটির তাৎপর্যে যে প্রভেদ ঘ'টে গেছে তা

লক্ষ করার মতো। *Sacrifice* অর্থাৎ বলি বলতে পশুবলিও বোঝায় আবার আত্ম-বলিদানও বোঝায়। 'বিসর্জন' শব্দটিতে আত্ম-বিসর্জন এবং প্রতিমা-বিসর্জন দুই-ই বোঝায়। এই দুটি শব্দের যে তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ পাওয়া গেলো, ঐ-তিনটি অর্থ ই এই নাটকের তিনটি বিষয়। আমার বাংলা নামটিই বেশি পছন্দ। কারণ, যদিও পশুবলি নিয়ে এক বিরোধকে কেন্দ্র ক'রেই এই নাটকটি শুরু হয়, তবু অপ্রতিরোধ্য বেগে নাটক এগিয়ে চলে সেই বেদনাঘন পরিণতির দিকে যাতে ক'রে বিসর্জনের দ্বিতীয় অর্থটি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। প্রায় শেষ অংশে নাটকের নায়ক পুরোহিত রঘুপতি মন্দিরের কালীমূর্তিটি টেনে এনে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেন ক্রোধে ও ঘৃণায়। সাধারণত যে-শ্রদ্ধার সঙ্গে সুন্দর-ভাবে প্রতিমা-নিরঞ্জন হয় এই বিসর্জন সে-জাতীয় নয়।

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন: "*Visarjan* is a forthright denunciation of a meaningless and superstitious rite of our religion." ('বিসর্জন' নাটকে আমাদের ধর্মের একটি অর্থ-হীন ও কুসংস্কারপূর্ণ আচারের নিন্দা করা হয়েছে জোরালো ভাষায়।)

নাটকের দুই নায়িকার মধ্যে একটি অপর্ণা। মেয়েটি গৃহহীনা ভিখারিণী। তার একমাত্র সম্পদ একটি ছাগ-শিশু, সেটিকে মাতৃস্নেহে সে লালন করেছে। দেবী কালীর কাছে বলি দেবার জন্য তার এই ছাগ-শিশুটি কেড়ে নেওয়া হয়। শোকার্ত মর্মাহত বালিকা রাজার কাছে আসে ন্যায়ভিক্ষা করার জন্য। কালীকে সম্বোধন ক'রে তার অভিযোগ উদ্বেল হ'য়ে ওঠে:

মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি আছে জগতের
রাজা—তুমি যদি চুরি করো, কে তোমারে
করিবে বিচার!

রাজা এতো গভীরভাবে বিচলিত হন এই আবেদনে যে তিনি তখনই তাঁর রাজ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ ঘোষণা ক'রে দেন। অনুমান করা যায় যে ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই তিনি এই ধার্মিক আচারের অধার্মিকতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন ভাব দেখালেন যে মা কালী স্বয়ং ঐ-বালিকার বেশে রাজদ্বারে এসে প্রার্থনা করেছেন যেন পশুবলি বন্ধ করা হয়।

মন্দিরের আত্মম্ভরী পুরোহিত বিদ্রোহ করেন, ধর্মের ব্যাপারে রাজা হস্তক্ষেপ করবার কে? রাজার তো সারা রাজ্যই প'ড়ে আছে শাসন করবার জন্য, মন্দিরের ভিতরে রঘুপতির কথাই শেষ কথা। রাজ-প্রাসাদের ভিতরে সন্তানহীনা রাণীও বিদ্রোহ করেন কারণ রঘুপতিকে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন,

> করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
> বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে এক শো মহিষ,
> তিন শত ছাগ।

এভাবে সংঘাত শুরু হ'লো রাজার সঙ্গে পুরোহিতের, রাণীর সঙ্গে রাজার। আরো-কিছু জটিলতারও সৃষ্টি হ'লো যার সঙ্গে আমাদের মূল বক্তব্যের সম্পর্ক নেই।

রঘুপতির একটি বিশ্বস্ত তরুণ ভক্ত ছিলো, জয়সিংহ। তাকে তিনি পুত্রস্নেহে মানুষ করেছেন। ক্রূর পুরোহিত প্রথমে রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করলেন রাজার অনুজের সঙ্গে। তার বুদ্ধির স্বল্পতা-হেতু সহজেই রঘুপতি তাকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারলেন। স্থির হ'লো যে প্রাসাদের ভিতরেই একটি বিদ্রোহ ঘটিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে ফেলবেন তিনি। এতেও সন্তুষ্ট না-হ'য়ে পুরোহিত আবার জয়সিংহকেও বোঝালেন যে মা কালী রাজরক্ত চান এবং এই রাজরক্ত সংগ্রহ ক'রে আনতে হবে জয়সিংহকেই। সেই ভিখারী কন্যা অপর্ণা আর জয়সিংহের মধ্যে একটি মধুর সখ্য গ'ড়ে উঠেছিলো। তাই অপর্ণা

এই সমস্ত কুটিল ষড়যন্ত্র থেকে বহুদূরে, রঘুপতির মন্দপ্রভাব থেকেও বহুদূরে সরিয়ে জয়সিংহকে নিয়ে যেতে চাইছিলো তার গ্রামের কুটীরে। নিষ্পাপ যুবকের বিবেকও তাকে এই জঘন্য কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করছিলো। কিন্তু রঘুপতির প্রতি তার আনুগত্যের মূল ছিলো এতো গভীরে যে তাকে উপড়ে ফেলা সহজ নয়।

জয়সিংহের ঈশ্বর-বিশ্বাসে চিড় ধরলো, গুরুর প্রতি আস্থা শিথিল হবার আগেই। বরং বলা উচিত উভয়েরই প্রতি তার আনুগত্যে এবার আঘাত লাগলো। তবু রাজাকে মন্দিরে ফুল দেবার জন্য আসতে দেখে জয়সিংহের মনে হ'লো, এইবার দেবীর আদেশ পালন করার সময় উপস্থিত। কিন্তু তার আগে সে মা কালীর স্বকণ্ঠে শুনে নিশ্চিন্ত হ'তে চায় যে তিনি সত্যই রাজরক্ত চান।

বল চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল, বল নিজ মুখে, বল্
মানব ভাষায়…

নেপথ্য থেকে উত্তর আসে, "চাই"। জয়সিংহ মেনে নিতে চায় দেবী তাঁর ভয়ানক বাসনা নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছেন। রাজা কিন্তু তাঁর ভুল ধরিয়ে দিলেন,

দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ শোকার্ত হ'য়ে বলে,

যখনি কূলের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস-দৈত্য!

সক্ষোভে সে যখন ছুরি ফেলে দিয়েছে, রঘুপতি এসে উপস্থিত হন মূর্তির পিছন থেকে। দেবীমূর্তির পাদস্পর্শ করিয়ে এবার জয়সিংহকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন,

আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

এবার আদেশ আর দেবীর কণ্ঠে নয়, পুরোহিতের স্বকণ্ঠে।

কিন্তু অপর্ণার অনুনয় আর নিজের বিবেকের শাসন এখনও তাকে দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে রাখে। এই যন্ত্রণাময় সংশয়ে প'ড়ে সে মনে-মনে ভাবে, সে নিজেও তো রাজবংশের ছেলে, তার রক্তেও নিশ্চয়ই নিষ্ঠুরা দেবী তৃপ্ত হবেন। অন্তত এভাবে আত্মবিসর্জন দিয়েও সে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু এতে রঘুপতির যে কী অবস্থা হবে সে-কথা সে একবারও ভেবে দেখে না। অথবা রঘুপতির উপরে সে কি প্রতিশোধ নিতে চায় এভাবে? মনে হয় পশুবলির সপক্ষে রঘুপতির উপদেশ এবং পশুবলি নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ব'লে রাজার প্রতি রঘুপতির বিষোদ্গার ইতিপূর্বেই জয়সিংহের কানে বেসুরো বেজেছিলো। এই ক্রুর ষড়যন্ত্র যতো জটিল হ'তে থাকে, জয়সিংহের মন ততোই বিতৃষ্ণায় আর অবিশ্বাসে ভ'রে ওঠে।

মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই।
... ...
আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই?—এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ! সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য,
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য মাঝে?

সে অপর্ণাকে অনুনয় ক'রে বলে,

দেবতায়
কোন্ আবশ্যক, কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটখাট সুখের সংসারে?

তার চেয়ে বরং,

আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।

কারণ মানুষে-মানুষে স্নেহপ্রীতি আর স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসারই শুধু অর্থ আছে এ-জগতে। এই ভালোবাসাকে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করা শূন্যে নিবেদন করারই তুল্য। এমনতরো নিবেদন শুধু জীবনকেই শূন্য করে, অনন্তকেও ভ'রে তোলে না। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে যতোটুকু সুখ পাওয়া সম্ভব সে কেবল প্রিয়জনের সান্নিধ্যে। অবশেষে তাই পাষাণীর দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে মানবীকে সে বলে :

হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস,
তুই যদি বুঝিতিস এই অন্তর্দাহ।

অল্প পরেই এক নাটকীয় মুহূর্তে নিজের বুকে ছুরিকাবিদ্ধ ক'রে জয়সিংহ আত্মবিসর্জন দেয় প্রতিমার পদতলে। রঘুপতির সঙ্গে এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস, অথবা রঘুপতির প্রতি জয়সিংহের প্রতিশোধ। এই পালিত-পুত্রকে রঘুপতি তাঁর রুদ্ধ হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ দিয়েছিলেন। রাজাকে হত্যা করার জন্য তিনি যে জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন তারই এই মর্মান্তিক পরিণাম দাম্ভিক পুরোহিতকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ক'রে দেয়। এবার তাঁর সবটুকু ক্রোধ গিয়ে পড়ে সেই দেবীর উপর যিনি রঘুপতির কুটিল পরিকল্পনাকে এভাবে বানচাল ক'রে দিয়ে তাঁকেই পরাজিত করেছেন। তখন তাঁর নিশ্চিত ধারণা জন্মায় যে পৃথিবীতে কোথাও যদি কোনো ঈশ্বর থাকতেন তবে কখনই এই পাষাণ-প্রতিমাকে এতো পাপ, এতো দুঃখ ঘটাতে দিতেন না। এরপর অপর্ণা যখন এসে তাঁকে ডাকে, "পিতা চলে এস" তখন রঘুপতিও তাঁর যথার্থ দেবীকে খুঁজে পান : "পাষাণ ভাঙিয়া গেল জননী আমার / এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।" এই তাঁর শেষ কথা, শেষ ঈশ্বরোপলব্ধি, নাকি বলবো তাঁর প্রথম যথার্থ ঈশ্বরোপলব্ধি ? এতোদিন তো তিনি কেবল মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, ধর্ম-ব্যবসায়ী ছিলেন ; ধর্মের অর্থ

কী তা-ই বোঝেননি যতোদিন-না ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করলেন অপর্ণার মধ্যে। আর রাজা এসেছিলেন মন্দিরের দেবীকে ফুল দিতে, দিলেন মানুষকে, সত্বোমৃত কিন্তু অমর জয়সিংহকে শেষ পর্যন্ত রাজা ও রাণী উভয়েই উপলব্ধি করেন যে মন্দিরে নয়, শাস্ত্রে নয়, পরস্পরের মধ্যেই ঈশ্বরকে সন্ধান করতে হবে।

উপসংহার

প্রথম যুগের এই-যে দুটি নাটকের গভীরতর তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করছিলাম এতোক্ষণ, এতে দু-রকম ধর্মভাবনার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। তাঁর নিয়ত পরিবর্তমান কবিজীবনের শেষ পাদে, সত্তর-উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মনকে অধিকার ক'রে রেখেছিলো এই দুটি ভাবনা। এতোদিনে তিনি ক্রমে বৈদিক অর্থেও কবি অর্থাৎ দ্রষ্টা বা দার্শনিক হ'য়ে উঠেছেন, স্বর্গ ও মর্তকে স্পর্শ করেছেন দুই বাহু প্রসারিত ক'রে। সুখ দুঃখ পার হ'য়ে চিত্তের যে-প্রশান্তি তাকে আয়ত্ত করার জন্য আকুলতাই তাঁর এই পর্যায়ের ধর্মীয় ও নান্দনিক অনুসন্ধানের একটি বৈশিষ্ট্য। এই প্রশান্তি লাভ হ'লে তবেই উপলব্ধি করা সম্ভব সেই সুমহান নাটকের মহিমা যা বিশ্ব জুড়ে অভিনীত হ'য়ে চলেছে। মহাকাশের প্রান্তে যখন নেবুলার সঙ্গে নেবুলার সংঘর্ষ ঘটে কিংবা ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতে কোনো মানুষের হৃদয়ে অথবা সমাজে শুভ আর অশুভের দ্বন্দ্ব চলে যখন, তখনও সর্বত্র সেই একই নাটকের অভিনয়। স্পিনোজার মতো এই কবিরও অভিলাষ ছিলো নিজের জীবনের ট্র্যাজিডিকে দ্রষ্টার মতো দর্শন করবেন। এবং ঐ ঈশ্বর-মাতাল নিরীশ্বরবাদী দার্শনিকের মতো তিনিও অনুভব করতেন, "...the truth is cruel, but it can be loved, and it makes free those who have loved it." (সত্য বড়ো নিষ্ঠুর, তবু তাকে ভালোবাসা যায়; যারা সত্যকে ভালোবাসতে পেরেছে সত্য তাদের মুক্তি দিয়েছে।)

তাঁর অপর সাধনা ছিলো, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান করা। অবশ্য লোভী, আত্মকেন্দ্রিক, নির্বোধ যে-সব মানুষকে তিনি চতুর্দিকে দেখতে পেয়েছেন তাদের মধ্যে নয়, বরং যে অনাগত মানবের মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা আর অপার শক্তি, তারই মধ্যে। 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বর নিভৃতলোকের ঈশ্বর, তিনি তাঁর ভূমিকাটুকু সেরে নিয়ে এবার চলেছেন নেপথ্যের দিকে। এখন রবীন্দ্রনাথের আত্মনিবেদিত প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু হলেন 'মনের মানুষ' বা 'চিরমানব'। আমরা সহজ ক'রে তাঁকে 'আদর্শ মানুষ' আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এই 'মনের মানুষ' তাঁর নিজস্ব কাল্পনিক আদর্শ নন। ইনি অত্যন্ত বাস্তব একটি সত্য এই অর্থে যে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালো-মন্দের উপর এঁর সুনিশ্চিত প্রভাব লক্ষ করা যায়, যদিও অবশ্য সর্বশক্তিমান ইনি নন। 'মানুষের ধর্মে'র এই ঈশ্বর যদি সত্যিই সর্বশক্তিমান হতেন তবে তো ষাট লক্ষ নিরপরাধ ইহুদী বর্বর নাৎসীদের হাতে নির্যাতিত হ'য়ে মরতো না।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের ধর্মসাধনার এই দুটি লক্ষ্য ছাড়াও আরো-একটি বিষয় ছিলো। এই তৃতীয় ভাবনাটি তাঁকে মাঝে-মাঝে নিরাশার প্রান্তে নিয়ে গেছে। এ হ'লো কর্মী মানুষের ধর্মসাধনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা। মানুষের সমাজে যতো অবিচার ওতপ্রোত হ'য়ে আছে সে-সবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সাধনা কর্মের সাধনা। কর্মযোগীর পক্ষে মত বিশ্বাস কিংবা সূক্ষ্মচিন্তার প্রয়োজন ততো বড়ো নয়। তবু এ-যুগের কর্মযোগীদের মধ্যেও নানা বিচিত্র মতের এক বিরাট সমারোহ দেখা যায়। মার্কসীয় গোঁড়া বস্তুবাদ থেকে শুরু ক'রে গান্ধির উদার হিন্দুধর্ম পর্যন্ত অসংখ্য কর্মাদর্শ রয়েছে। কিন্তু তাঁদের পক্ষে আসল কথা হ'লো কর্ম। প্রচণ্ড বিরুদ্ধশক্তির সামনে, এমনকি পরাজয়ের মুখেও যে-বিশ্বাস কর্মযোগীকে তাঁর কর্মপথে অবিচল রাখে, তা-ই তাঁর পক্ষে সত্য বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে এ-ও

এক মহৎ ধর্ম, কিন্তু এই ধর্মাচরণে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ অনেকটা সীমিত। যদিও অন্য কবিদের তুলনায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে কাজের মানুষ তিনি, তবু গান্ধি কি লেনিনের মতো নৈতিক বীরত্বের ভূমিকা নেবার জন্য তাঁর জন্ম নয়। নিজের ব্যক্তিত্বের এই 'দৈন্য' রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিতো এবং এই বেদনাময় উপলব্ধি তাঁর বেশ-কয়েকটি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বোধ করি 'পত্রপুটে'র বারো-সংখ্যক কবিতায়।

১৩৮২

Visva-Bharati Quarterly, Vol. 40, No. 1-এ প্রকাশিত '*Nature's Revenge* and *Sacrifice*' শীর্ষক প্রবন্ধটির গৌরী আইয়ুব-কৃত অনুবাদ।

পথের শেষ কোথায়

আমি কেমন করিয়া জানাবো
 আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে
আমি কেমন করিয়া জানাবো
 আমার পরাণ কী নিধি কুড়ালো
 ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।

অনেক দিনের খোঁজার পর এ-নিধি পেয়েছিলেন: তবু হয়তো ঠিকমতো পাননি, কোথায় যেন বাধা ছিলো গোপন, একটা খটকা লুকানো ছিলো মনের কোণে। সন্ধান শুরু হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের প্রায় গোড়ার দিকেই।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ অবশ্য তরুণ কবি ছিলেন বড়ো বেশি আত্মকেন্দ্রিক, নিজের ঈষৎ-ভগ্ন হৃদয়ের চতুঃসীমায় বড়ো বেশি আবদ্ধ। কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রিকতা অকস্মাৎ ভেঙে গেলো এক স্মরণীয় প্রভাতে আশ্চর্যভাবে, রহস্যিকভাবে; রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ একাত্মতা বোধ করলেন আশপাশের সামান্যতম মানুষের সঙ্গে, ক্ষুদ্রতম তৃণখণ্ডের সঙ্গে। সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের কথা লিপিবদ্ধ করলেন একটি বহু পরিচিত কবিতার অতি-উচ্ছ্বসিত তরল তারুণিক ভাষায়, এবং পরবর্তী অনেক গদ্যরচনায়। কিন্তু এ-ও গেলো ভেসে, স্বপ্নের চেয়ে স্বপ্নভঙ্গ আরো দ্রুতবিলয়ী সাব্যস্ত হ'লো এই মন্থরগতি চির-পরিণতিশীল কবির হৃদয়পটে। তারপরে এক প্রচণ্ড শোকের ধাক্কায়

সব-কিছু ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো ; তিনি অনুভব করলেন তাঁর পরমাত্মীয়া বাল্যসহচরী ও তাঁর এতোদিনকার সমূহ সাধনার প্রেরণা-স্বরূপিনী কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত জগৎ যেন আত্মহত্যা করেছে। সামনে দেখা দিলো এক অপার সূচিভেদ্য অন্ধকার গহ্বর। একে নাস্তিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা ("encounter with nothing-ness") ছাড়া আর কী বলা যায় ?

জানি না ঠিক ক'মাস, হয়তো বৎসরাধিক কাল, কাটালেন তিনি এই মিশকালো গহ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কিন্তু এ অপার গহ্বরও পার হলেন তিনি আপন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে। পার হ'য়েই রবীন্দ্রনাথ মহৎ কবি এবং বিরাট পুরুষ হ'তে পারলেন। "জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।"

নান্দনিক দূরত্ব

যে-দূরত্বের (নিশ্চয়ই নান্দনিক দূরত্ব, aesthetic distance) কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জীবনস্মৃতি'র শেষ অধ্যায়ে তার প্রথম প্রকাশ দেখি ১৩০২ সালে রচিত একটি গানে। গানটির শব্দৈশ্বর্য ও ধ্বনিগরিমা যেমন অসাধারণ তেমনি অসাধারণ কথা ও সুরের মিতালি :

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
জলে স্থলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা।

বিশ্ববীণারবে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছিলেন সেই music of the spheres যা পাইথাগরাস শুনেছিলেন আড়াই হাজার বছর পূর্বে।

এ-গানে বসন্তের মধুর এবং বর্ষার ভৈরব রূপের চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর-একটি জনপ্রিয় গানে বর্ষার মধ্যেই পাশাপাশি দেখেছেন দুই রূপ—মধুর এবং ভয়ঙ্কর। শেষ দুটি পঙক্তি উদ্ধৃত করি :

সবুজ সুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়
বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্যা মরণ-ঢালা।

এ হেন নির্লিপ্ত দৃষ্টির সবচেয়ে জোরালো প্রকাশ অতি অপ্রত্যাশিত-ভাবে, প্রায় বেখাপভাবে, এসে পড়েছে 'গীতাঞ্জলি'রই একটি গানে। গানটি এতোই চমকপ্রদ যে প্রায় সমস্তটি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

আজ বরষার রূপ,হেরি মানবের মাঝে ,
চলেছে গরজি চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে
জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘন ঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন-মরণ রাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

গীতাঞ্জলি পর্বের শতাধিক গানে উল্লসিত স্বরে নন্দিত ও বন্দিত প্রেমকরুণাময় ঈশ্বরের কোনো আভাস পর্যন্ত নেই এই নগ্ন সত্যদৃষ্টি-নির্ভর গানটিতে।

শেষ পর্বের অনেক কবিতায় পাই এই নান্দনিক দূরত্ব-জনিত ভাবনার প্রকাশ। নিরাভরণ, স্বচ্ছ, প্রায় গদ্যের মতো ঋজু প্রকাশ বোধহয় 'রোগশয্যায়'-এর ২১-সংখ্যক কবিতায়।

'রোগশয্যায়'-এরই অন্য একটি কবিতায় (৯-সংখ্যক) যেন নিজেকে সংশোধন ক'রে বলছেন: যদিও আকাশে-আকাশে দেখা যায় 'প্রকাণ্ড সুষমা', তবু ঠিক এই মুহূর্তেই যে বিশ্বজগৎ অশীতিপ্রায় কবির অনুভব বা মানসনেত্রের সম্মুখে একটি বিরাট গোলাপের মতন ফুটে রয়েছে তা নয়; বিশ্বজগৎকে দেখতে হবে শুধু মহাদেশের নয়, মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে। এই মুহূর্তে তো অনেক কিছু আছে অনেক জায়গায়, অন্তত আমাদের এই বসুন্ধরার কোলে তার লক্ষ কোটি সন্তানের জীবনে, যা কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ, ক্রমশ লক্ষ-লক্ষ বৎসরের পর্বে-পর্বে তা সম্পূর্ণ হবে, সৌষ্ঠবমণ্ডিত হবে।

আদি মহার্ণব গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে—
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

অতি-অতি সুদূর ভবিষ্যতে যদি উদ্ঘাটিত হয়ও বিধাতার অন্তর্গূঢ় অভিপ্রায়, ইতিমধ্যে লক্ষ কোটি ব্যক্তিমানুষের দুঃখ-ভারনত পঙ্গু জীবনের ব্যর্থতা কি কবির সংবেদনশীল হৃদয়কে পীড়িত করবে না ?

কঁৎ-এর মানবিকতাবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ খুবই পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁর দার্শনিক মন অনেকটা সাড়াও দিয়েছিলো তাতে। এই মানবিকতাবাদে কিন্তু ব্যক্তিমানুষের স্থান খুবই সংকুচিত, অনন্ত প্রগতিশীল ও প্রগতিক্ষম মনুষ্যজাতির প্রত্যঙ্গরূপেই তার সার্থকতা—ঠিক যেমন জীবদেহের শত লক্ষ জীবকোষ স্বতন্ত্রভাবে নগণ্য, সমগ্র জীবদেহের ধারক ও বাহক-রূপেই তাদের যতোটুকু মূল্য। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ কঁৎ-এর মানবিকতাবাদের দিকে আকৃষ্ট হ'লেও কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্তই রইলেন। ব্যক্তিমানুষের এমন নিদারুণ অবমূল্যায়ন এবং স্বল্পকালিকতা তাঁকে বরাবরই দুর্ভাবিত ও ব্যথিত করেছে, তার বিবিধ ঋজু তীব্র প্রকাশ আমরা পাবো শেষ পর্বের অনেক কবিতায়। কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতার ভাষায়, রূপকের ভাষায়, তা ব্যক্ত হয়েছে "সোনার তরী" শীর্ষক বহুবিখ্যাত এবং বহুব্যাখ্যাত কবিতাটিতে। আমার সারাজীবনের কৃষিকার্যের যেটুকু ফসল আমি তুলে দিতে পারলাম মনুষ্যজাতির অনন্ত প্রগতিধারায় সেটুকুরই মূল্য আছে, আমার আমিত্বের কোনোই কদর নেই নিখিলের মাধুরীরুচিতে, আমি শুকনো পাতার মতো ঝ'রে পড়বো, নিঃশেষে বিলীন হ'য়ে যাবো পঞ্চভূতে চিরতরে।

একেও একপ্রকার কর্মফলবাদ বলা যায়—যদিও প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের কর্মফলবাদ থেকে এ একেবারেই ভিন্ন। আমার মনে হয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩য় অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ) যে-কর্মবাদের কথা বলা হয়েছে তা-ই ব্যঞ্জিত হয়েছে "সোনার তরী" কবিতাটিতে। তবে ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য যেন এই অতি নিগূঢ় সত্যটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, এবং কোনো গুরুতর নিগূঢ় সত্যের আবিষ্কর্তাসুলভ বিস্ময়ে

ও আনন্দে বলছেন। কিন্তু বলতে আরম্ভ ক'রেই থেমে যাচ্ছেন, আর্তভাগকে হাত ধ'রে একটি নিভৃত কক্ষে নিয়ে যাচ্ছেন। স্পষ্টতই তাঁর ধারণা ছিলো যে এই মহাসত্যটি সাধারণ লোকের কানে গেলে সামাজিক স্থিতি বিপন্ন হবে, সমাজব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য (গীতার ভাষায় 'লোক সংগ্রহের' জন্য) সাধারণ লোকের মনে প্রচলিত জন্মান্তর ও কর্মফলবাদে আস্থা থাকাই ভালো। "সোনার তরী"তে কিন্তু এই কর্মবাদ ব্যক্ত হয়েছে গভীর বিষাদ ও বেদনার ভাষায়। কারণ কোনো মানুষই তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার কৃতকর্মের একীকরণ মেনে নিতে পারে না, মেনে নিতে পারে না যে তার সমূহ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্ফূরণের সম্ভাবনা তার কৃতকর্মের মধ্যে পরিসমাপ্ত। সকল মানুষের এ-বেদনা রবীন্দ্রনাথের মনে বরাবরই বেজেছে এবং এর থেকে পরিত্রাণ না-হোক্ একে গ্রহণ করবার নানা পন্থা তিনি খুঁজেছেন।

আগেই বলেছি যে একটি পথ দুঃসহ মৃত্যুশোকের মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলেন – 'নান্দনিক দূরত্ব'। কিন্তু এই নান্দনিক দূরত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা দার্শনিক পাইথাগোরাস বা স্পিনোজার পক্ষে যতোটা সহজ ছিলো, কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ততোটা সহজ হয়নি। ভাগ্যহত ও সমাজ-নিপীড়িত অসহায় মানুষের হাহাকার সর্বদাই তাঁর মর্মে আঘাত করে বিশ্ববীণার সঙ্গীতের মাঝখানে, সুর-বেসুরের যেন দ্বন্দ্ব বেধে যায়। তাই তো রবীন্দ্রনাথ মহাকাল বা নটরাজ শিবের মতো সম্পূর্ণ উদাসীন নির্মম দেবতার কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন শেষ পর্বে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে দেখে যে নটরাজ শিবের নির্মমতম স্বরূপ তিনি ব্যক্ত করেছেন বালক-বালিকাদের জন্য রচিত 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থের প্রথম বা ভূমিকা-প্রতিম কবিতাটিতে।

যে-দেবতার কাছে “কিছুরি তো কোনো মূল্য নাই” তাঁরই কাছে একটি শিশুপাঠ্য কাব্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ “মোরে ভক্ত ব'লে / নেরে তোর তাণ্ডবের দলে” — সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁর মূল্যবোধ এতো তীক্ষ্ণ, সজাগ ও পরিব্যাপ্ত যে মনে হয় তিনি বনের প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা ফুল পাখীকে ভালোবাসেন, নাম ধ'রে ডাকেন, ভালোবাসেন কতো বিচিত্র রকমের মানুষকে — “পরের ঘরে মানুষ” ছোটো জাতের লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা থেকে, বিজ্ঞানগৌরব জগদীশচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধি পর্যন্ত; খোঁজেন এবং বহু বৎসরের খোঁজার শেষে আবিষ্কার করেন নিজের অন্তরের ভালোবাসার মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'র করুণাস্নিগ্ধ প্রেমসিক্ত ভগবানকে।

আসলে রবীন্দ্র-মানসে বহু বিচিত্র ভাবধারা পাশাপাশি চলেছে, ত্রিবেণী বা পঞ্চবেণী সঙ্গম ঘটেছে বলা যায় না, কখনো এটা প্রাধান্য লাভ করেছে, কখনো অন্যটা, কখনো দুটো-তিনটে পরস্পরকে সমর্থন করেছে, কখনো একটার সঙ্গে আরেকটার সংঘাত অনিবার্য ও বেদনা-দায়ক হ'য়ে উঠেছে।

মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথকে দান করেছিলো সেই বহুদূরের উদাসীন নির্মম দৃষ্টি যাতে তিনি সৃষ্টির যেমন প্রলয়েরও তেমনি আনন্দস্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন।

('শিশু ভোলানাথ'-এর ভূমিকায় তিনি ধ্বংস থেকে ধ্বংসের মাঝে চক্রগতির কথা বলেছেন। এই অর্থহীন, লক্ষ্যহীন চক্রগতি ঠিক ট্র্যাজেডি নয়, তবে তার উপলব্ধি ট্র্যাজিক চেতনার খুব কাছাকাছি।)

অথচ কাদম্বরী দেবীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-সংকলন 'কড়ি ও কোমল'-এ দেখি রবীন্দ্রনাথ মাটি এবং মানুষের খুব কাছাকাছি চ'লে এসেছেন, প্রথম কবিতাটিতেই ঘোষণা করছেন:

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

ভূমিকাতে খানিকটা জোর দিয়ে বলেছেন যে এই কথাটি "পরবর্তীকালে আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে, যা নৈবেদ্যতে আর একভাবে প্রকাশিত হয়েছে—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষের প্রতি, নারী ও প্রকৃতির প্রতি, নিবিড় অনুরাগ সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূল ধারা। এই ভূমিকারই পরের অনুচ্ছেদে তিনি যোগ করেছেন "আর একটি প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।" এই উপলব্ধির মধ্যে কিন্তু বৈরাগ্যের, উদাসীনতার, এমন-কি নটরাজ-সুলভ নির্মমতার সুর শোনা যায়।

'কড়ি ও কোমল'-এর ভূমিকায় যে দুটি প্রবর্তনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যরচনার মূল ভাব বলেছেন—মানবপ্রেম এবং নান্দনিক দূরত্ব ও নির্লিপ্তির সাধনা—তার গুরুত্ব সকল রবীন্দ্রানুরাগী সমালোচক ও পাঠক যথোপযুক্ত পরিমাণে উপলব্ধি করেননি ব'লে আমার মনে হয়, তাই আমি এই ঘোষণার উপর একটু জোর দিতে চাই। তুলনায় গীতাঞ্জলি পর্বের ঈশ্বর-নিমগ্নতা বহু-আলোচিত ও সর্বজনবিদিত হ'লেও সাময়িক ব্যাপার।

'কড়ি ও কোমল'-এর এই উদ্ধৃতিজীর্ণ সনেটটি আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগায়। হঠাৎ কী প্রয়োজন ঘটলো ঘোষণা করবার "মরিতে চাহি না আমি?" শত দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা-বঞ্চনাময় জীর্ণ যাদের জীবন তারাও তো মরতে চায় না, হাজারে একজনও না। তবে কি তিনি মৃত্যুশোকের কালো গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মঘাতী হবার কথা ভেবেছিলেন কোনো ধাবমান মুহূর্তে? সম্ভবত। তাই বোধহয় সে-ইচ্ছা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন, এ-কথা ঘোষণা করবার তাগিদ অনুভব করলেন রবীন্দ্রনাথ। সন্দেহ জাগে, এই আত্মঘোষণার মধ্যে কিঞ্চিৎ আত্ম-ভর্ৎসনাও লুকানো ছিলো। একদিন বিরহিনী রাধাকে তিনি "ছিয়ে ছিয়ে" ব'লে ধিক্কার দিয়েছিলেন সে তার জীবনবল্লভের অবহেলার

জ্বালা সহ্য করতে না-পেরে মরণের শান্ত শীতল কোলে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলো দেখে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রথম পঙক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ভুবনকে সুন্দর বলেছেন, 'ভুবন' বলতে কি শুধু বিশ্বপ্রকৃতি বোঝাতে চেয়েছেন, নাকি সমস্ত মানুষ ও মানব-সমাজও 'ভুবন'-এর অভিধাভুক্ত? মানুষের মাঝে বাঁচতে চান তিনি তাঁর এতোদিনকার লালিত একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বর্জন ক'রে। কিন্তু মানব-সমাজেও কি তিনি সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন যা প্রকৃতির রঙে রূপে ছন্দে গানে ব্যক্ত? সম্ভবত এই চতুর্দশপদীতে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যজাতি কিংবা মানব-সমাজের কথা ভাবেননি, ভাবছিলেন আশপাশের অল্প-বিস্তর পরিচিত মানুষের কথাই, বলতে চেয়েছিলেন, আমি তাদের ভালোবাসি ব'লেই তাদের মাঝখানে থাকতে চাই, সন্ন্যাসীর মতন দূরে স'রে গিয়ে মুক্তির সাধনা করতে চাই না। তাদের মধ্যে নানারকমের দোষত্রুটি এমন-কি দুর্নীতিপরায়ণতাও থাকতে পারে, সে-সব মেনে নিয়ে কি তাদের ভালোবাসা যায় না? যায়, কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত।

তাঁর মহত্তম সৃষ্টি 'শ্যামা' গীতিনাট্যের নায়ক "মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি, উন্নতদর্শন" বজ্রসেনও শ্যামাকে বলেছিলো, ভালোবাসা ভালো-মন্দ সব-কিছু মেনে নিতে পারে :

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে
জেনো, প্রিয়ে॥
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণ শোধ করে সে
জেনো, প্রিয়ে॥
কলঙ্ক যাহা আছে দূর হয় তার কাছে
কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে॥

কিন্তু সে নিজে মেনে নিতে পারেনি। শ্যামা যখন অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বীকার করলো যে তার প্ররোচনায় তারই প্রেমে আত্মহারা

১২৬/ব

কিশোর উত্তীয় আত্ম-বলিদান করে বজ্রসেনকে কারামুক্ত করেছিলো, তখন সে-কথা শোনা মাত্রই বজ্রসেন একেবারে অসহিষ্ণু হ'য়ে শ্যামাকে কলঙ্কিনী, পাপিষ্ঠা ইত্যাদি ব'লে ধিক্কার দিলো। শ্যামা দুঃখে ক্ষোভে অন্তিম হতাশায় চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে বলে উঠলো : "তোমা লাগি পাপ নাথ, তুমি করো মর্মাঘাত।" নীতিবিশুদ্ধতায় নিষ্ঠুর বজ্রসেন শ্যামার বুকে এমন মর্মান্তিক আঘাত করলো যে শ্যামা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।* তাকে মৃত জেনেই সে ওখান থেকে চ'লে গেলো।

অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি অবিস্মরণীয় কবিতায় প্রশ্ন করেছিলেন স্বয়ং ভগবানকে :

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিবাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছো ভালো ?

এ-প্রশ্ন এবং প্রশ্নের বিমূঢ় বেদনা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি 'কড়ি ও কোমল'-এর লেখকের মনে, কোনো প্রকার উত্তর তো নয়ই।

বিষাদের ঘনায়মান ছায়া

পরবর্তী কাব্য 'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথ একজন পরিণত শিল্পী। 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত ঘন বিষাদের ছায়া প্রমথ চৌধুরীকে অনুসরণ ক'রে অনেকেই লক্ষ করেছেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন বইখানির উৎসর্গ বা 'উপহার' পত্রে : "সেই আনন্দ মুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি / সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।" কিন্তু এ-আনন্দ শিল্পীর আত্মপ্রকাশের আনন্দ। ভূমিকায় পড়ি, "কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল···মানসীতে ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।" কোনো সন্দেহ নেই যে এই খেয়াল বা রচনাশক্তির পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন,

পরিতৃপ্তি স্বাভাবিক। চরিতার্থ অভিব্যক্তির তো একটা আনন্দ আছে —অভিব্যক্ত ভাব যতোই বিষাদঘন হোক্-না কেন। 'মানসী'র মোটের উপর বিষণ্ণ সুরের অন্যতম এবং সবচেয়ে গুরুতর কারণ এই সময়কার রবীন্দ্র-মানসে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও অসহায়তার গভীর চেতনা।

আমার রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় 'মানসী' কাব্যের বিশেষ একটি গুরুত্ব আছে। এইখানে আমরা প্রথম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাহ্মসমাজ থেকে এবং পিতৃদেবের কাছ থেকে পাওয়া স্নেহকরুণাময় মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরে আর তাঁর মন ভরছে না ("অনেক কথা বলেছি সে মিথ্যা বলা / অনেক চলা চলেছি সে মিথ্যা চলা"), স্বকীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে সে-বিশ্বাসকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারছেন না। এই অভিজ্ঞতা আশপাশের মানুষের এবং তাঁর নিজের ভাগ্যহত জীবনের অভিজ্ঞতা।

নিজের শূন্যীভূত জীবনের কথা তিনি বেশ অনাবৃত ভাষায় বলেছেন "শূন্য গৃহে" শীর্ষক কবিতাটিতে :

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে আজ কাছে নাই
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে
কোথাও কি আছে, প্রভু, হেন বজ্রপাত ?
... .
এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চিরনীরবতা ?
সমস্ত মানব প্রাণ বেদনায় কম্পমান,
নিয়মের লৌহ বক্ষে বাজিবে না ব্যথা ?

এ-কবিতায় 'নিয়মের লৌহবক্ষে'র কথা বলা হয়েছে, অন্য একটি কবিতায় ("নিষ্ঠুর সৃষ্টি") বলছেন আপাতবিপরীত কথা : "মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে / আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা", কিন্তু বলছেন আসলে একই কথা।

এখানে natural order এবং moral order-এর মধ্যে

ভেদরেখা টানা দরকার। জড়জগতে লৌহকঠিন নিয়মের রাজত্ব অবশ্যই পরিদৃশ্যমান, এক তিল এ-দিক ও-দিক হবার জো নেই। "সিন্ধুতরঙ্গ"-এ বলছেন, "নাই তুমি ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ / জড়ের বিলাস।" 'বিলাস' শব্দটা এখানে 'আধিপত্য' অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। এ-উক্তিটি কিন্তু নাস্তিকের উক্তি নয়, নাস্তিকের মুখে এ হেন বিলাপ বা অনুযোগ অর্থহীন।

ঠিক কী ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলা আমরা মানব-জগতে প্রত্যাশা করতে পারি? যেহেতু মানুষের মনে স্বাধীন ইচ্ছা ব'লে একটা ব্যাপার আছে, আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করি না যে সে-ও গ্রহনক্ষত্রের মতো পদার্থ-বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকবে। তাতে তো তার মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তবে?

আমরা প্রত্যাশা করি নিয়মগত নয়, নীতিগত শৃঙ্খলা। Moral order বলতে কী বোঝায় সেটা এক কথায় বলা যায় না: তবে একটি কথা বলা যায়। আমরা দুষ্টের দুর্ভোগ দেখে খুব বিচলিত হই না। কিন্তু যখন দেখি নিরীহ মানুষ, বিশেষত একটি শিশু কিংবা যিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছেন এমন মানুষ বছরের পর বছর কুষ্ঠরোগে বা কর্কটরোগের যন্ত্রণায় ভুগছেন, তখন না-ব'লে পারি না—ভগবান তুমি নাই, আছে শুধু জড়ের বিলাস: অথবা ভাবি যে মানব-জীবন নিয়ে শুভের দেবতার সঙ্গে অশুভের দেবতার দ্যূতখেলা চলছে, এবং শুভের দেবতাই যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন এমন অঙ্গীকার নেই কোথাও।

সাতশোজন তীর্থযাত্রী অত্যন্ত নিরীহ বালবৃদ্ধবনিতার পুরীর কাছে ঘূর্ণিঝড়ে জাহাজডুবি হ'য়ে সকরুণ মৃত্যুর সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত ও বেদনার্ত হ'য়ে "সিন্ধুতরঙ্গ" কবিতাটি লিখেছিলেন। এই কবিতা কি তিনি লিখতে পারতেন যদি শুনতেন যে তিরিশজন জলদস্যু যারা বছরের পর বছর গোলাবারুদ পিস্তলবন্দুক নিয়ে যাত্রী-জাহাজের

উপর হামলা ক'রে অনেককে খুন জখম ক'রে সকলের সর্বস্ব অপহরণ ক'রে বেশ সুখে কাল কাটাচ্ছিলো তারা ঘূর্ণিঝড়ে প'ড়ে জাহাজডুবি হ'য়ে মারা গেছে ? অসম্ভব। সম্ভবত তিনি বলতেন : ওরা প্রাপ্য দণ্ডই পেয়েছে ; এমনি ক'রে বিধাতা সৃষ্টিরক্ষা করেন। অথবা ঐ-গোছের কিছু।

অপরাধীর দুঃখ-কষ্ট অমঙ্গল নয়, নিরপরাধের দুঃখ-কষ্টই অমঙ্গল। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি সে-অমঙ্গল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। দেখে আমাদের ধর্মবিশ্বাসে, ভগবৎ-বিশ্বাসে, ঈশ্বর-প্রেমে চিড় ধরে। রবীন্দ্রনাথের এই চিড়-ধরা মনের প্রকাশ রয়েছে 'মানসী'র কয়েকটি স্মরণীয় কবিতায়।

'মানসী' কাব্যের বৈশিষ্ট্য কিন্তু তার প্রেমের কবিতা, এবং ঐ-সব প্রেমের কবিতার বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রেম কিংবা চরিতার্থ প্রেমের অবক্ষয় ও স্বল্পায়ুতা। প্রথম দুটি কবিতার শিরোনামই সুর ধরিয়ে দেয় : "ভুলে" ও "ভুলভাঙা" ("বুঝেছি আমার নিশার স্বপন / হয়েছে ভোর")। ভাবটা বড়ো সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে 'মানসী'র সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ কবিতার প্রথম স্তবকে :

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

যৌবন যায়, যৌবন যাওয়ার অনেক আগে থেকেই অনেক ক্ষেত্রে প্রেমশিখা স্তিমিত হয়, নির্বাপিত হয়। কিন্তু প্রেম যতো স্বল্পায়ুই হোক্, তবু অমূল্য সে-প্রেম, অমূল্য তার স্মৃতি। "দূরস্মৃত কাহিনী" সম্পূর্ণ বিস্মৃতির কালিমার চেয়ে গতগুণে ভালো : সে অবশিষ্ট স্মৃতিটুকু বেঁচে থাক্. দীর্ঘজীবী হোক্, উদ্ভাসিত করুক জীবনের অনেক বছর, অনেক দশক ; তবু মনে রেখো, তবু মনে রেখো।

'মানসী'র "নারীর উক্তি" কবিতাটিতে নারীর ক্ষোভ :

এখন হয়েছে বহু কাজ, সতত রয়েছ অন্যমনে
সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে

পুরুষের উত্তর : আমি তোমাকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি যে পূজার অন্তরালে বাসনা লুকানো ছিলো। বাসনার তৃপ্তি এবং ক্লান্তি সহজেই আসে। বাসনা দিয়ে আমি তোমার মূর্তি রচনা করেছিলাম এবং সেই মূর্তির চরণে আমার সমস্ত হৃদয়মনপ্রাণ অর্পণ করেছিলাম। ক্লান্ত বাসনায় আজ দেখছি : "তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।"

'মানসী'র আর-একটি বিখ্যাত কবিতায়ও ("নিষ্ফল কামনা") প্রিয়াকে "সুতীব্র বাসনার ছুরি দিয়ে" ছিঁড়ে নেওয়ার নিন্দা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু এই কবিতায় সুখে-দুঃখে ঘর বাঁধা তাঁর অন্বিষ্ট নয় ; তিনি সন্ধান করেছেন প্রিয়ার চোখে চোখ রেখে আত্মার সেই রহস্য-শিখা যা "ওই নয়নের নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে।" অথচ সন্ধান করছেন অদ্ভুতভাবে—"প্রাণমন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি / অতল আকাঙ্ক্ষা পারাবারে।" আমাদের বুঝতে দেরী হয় না যে তিনি শুধু প্রিয়ার ব্যক্তিগত মন বা আত্মার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাইছেন না, পৌঁছতে চান অনন্ত রহস্যের দ্বারে। স্বভাবতই কবিতার উপান্তে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন যে যার "দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে / চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে" সেই পরমাসুন্দরীকে বাসনার ডোরে বাঁধা যাবে না, সে "বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে / শতদল উঠিতেছে ফুটি।" এইসব কবিতায় দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বাসনা-কলুষিত প্রেমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং তার আশুবিলীয়মানতা বিষয়ে নিশ্চিত। প্রশ্ন উঠতে পারে : নারী-প্রেম কি কখনো কামনা-মুক্ত হ'তে পারে, নাকি তা অবশ্যতই কামনাস্পৃষ্ট, "রাহুগ্রস্ত" ?

য়েট্‌স্‌-এর একটি দ্বিরালাপী কবিতায় ("For Anne Gregory") পড়ি, সুন্দরী বলছেন : আমি খুঁজছি সেই প্রেমিককে যে আমার রূপকে নয়, আমার আত্মাকে ভালোবাসবে। কবি-প্রেমিকের প্রত্যুত্তর :

I heard an old religious man
But yesternight declare
That he had found a text to prove
That only God, my dear,
Could love you for your self alone
And not for your yellow hair.

এ কি ইংরেজি কাব্যনাট্য 'Chitra'-র নাতিপ্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ?

রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা অবশ্য বিপরীতমুখীন। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ প্রেমের পাত্র ভগবানই হ'তে পারেন, নারী নয়—এই উপলব্ধি তাঁকে অনুপ্রাণিত করলো ঈশ্বর-সন্ধানী হ'তে। 'কল্পনা' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত তাঁর কাব্যের গতিতে সেটা স্পষ্ট।

তবে 'কল্পনা'তে তিনি একটু উন্নীত ধরনের নারী-প্রেমের কথা বলেছেন একটি সুপরিচিত গানে :

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে
করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি।

এখানে ঠিক সেই দাবী করা হচ্ছে ("তুমি আমারি") যেটা করতে তিনি 'মানসী'র "নিষ্ফল কামনা"তে প্রেমিককে নিষেধ করেছিলেন। কামনার ঘোরে যে-কোনো লোকের মনে নানাপ্রকার মোহ অর্থাৎ কাম্য নারীর বাস্তব রূপগুণ-নিরপেক্ষ অলীক ধারণা জন্মাতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তার কথা বলছেন না এই কবিতায়। "মনের মাধুরী" বলতে খুব সম্ভব বোঝাতে চেয়েছেন এক ধরনের নান্দনিক

সৃজনশীলতা যার সাহায্যে শিল্পীরা প্রস্তরখণ্ডের মতো তুচ্ছ উপাদান থেকেও অপূর্ব সুন্দর মূর্তি গড়েন।

এই কবিতার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে লেখা এক পত্রে ('দেশ', ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য) এই ক'টি পঙক্তি নিজ মত সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। শরৎচন্দ্রের মতো হৃদয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কথাসাহিত্যিক বলছেন : "অকৃত্রিম ভালোবাসা পাত্রের দোষগুণ-নিরপেক্ষ হয়। সে তার প্রিয় ব্যক্তির সব কিছুই সুন্দর দেখে, আশ্চর্য দেখে, মহৎ ও মাধুর্যময় দেখে। এই দেখার দৃষ্টি এক আশ্চর্য দৃষ্টি।...ভালোবাসা যখন হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখন সে চায় আধার বা আশ্রয়।...ভালোবাসা আপনিই আপন হৃদয়রসে রচনা করে নেয় তার পাত্রকে। ভালোবাসার প্রতিমা রচনায় পাত্রটি খড়-বাঁশ-দড়ি মাত্র।"

ভালোবাসা জাগ্রত হয়েছে অথচ তার পাত্র নেই, মনের এমন অবস্থা ঘটতে পারে তা আমি মানি, তরুণ বয়সে ঘ'টে থাকে—বিশেষত রোম্যান্টিক সাহিত্যের আবহাওয়ায় যাদের মন লালিত হয়েছে। এমন প্রেমিক খোঁজে তার ব্যাকুল প্রেমানুভূতির উপযুক্ত পাত্র। অন্তত আংশিক উপযুক্ত (অর্থাৎ objectively উপযুক্ত) পাত্রের সাক্ষাৎ পেলে তবেই তার মন সৃষ্টিশীল হ'য়ে উঠতে পারে। রাস্তায় বেরিয়ে প্রথম যে-মেয়েটির মুখের উপর তার চোখ পড়ে তার পায়েই সে আপন মনের সঞ্চিত ভালোবাসা ঢেলে দেবে—এটা আমার কাছে অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঠেকে। বাস্তব প্রেমে দৃষ্টি এবং সৃষ্টির সমাবেশ ঘটে : প্রেমিক কিছু দেখতে পায় রক্তমাংসের নারীর রূপে-গুণে, কিছু সে সৃষ্টি করে মনের উদ্বেলিত মাধুরী মিশিয়ে।

শরৎচন্দ্র হয়তো লক্ষ করেননি যে যে-গান থেকে তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তার শিরোনাম "মানস প্রতিমা" ইংরেজিতে যাকে বলে ideal image। কবি তাঁর

চোখে দেখা ভিন্ন-ভিন্ন মেয়ের রূপ-গুণ থেকে তিল-তিল চয়ন ক'রে তার সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এমন মানস প্রতিমা রচনা করেছেন যা তিলোত্তমা-তুল্য। স্বভাবতই সে কেবল কবির "শূন্য-গগন-বিহারী" "অসীম-গগন-বিহারী"; এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে সে কাছে বা দূরে কোথাও বিহার করছে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি কোথাও এ-গানে; কাজেই নিঃসন্দেহে এবং একশোবার "তুমি আমারি যে তুমি আমারি।" আরো একটি কথা শরৎচন্দ্রের এবং অনেক সমালোচকের নজর এড়িয়ে গেছে—'কল্পনা' কাব্যে এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং চব্বিশ ঘণ্টা বা তার চেয়ে কম সময়ের ব্যবধানে রচিত গানের শিরোনাম "কাল্পনিক"। তাতে মানস প্রতিমা এবং রক্ত-মাংসের প্রেয়সীর সম্পর্কের কথা বেহাগ রাগিণীতে বলা হয়েছে। আমার মতে দুটি গান পরস্পর-সম্পূরক এবং একত্রে বিচার্য।

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।

'স্বপন' এখানে 'মানস প্রতিমা'রই ভাষান্তর। মানস প্রতিমার কাছে কী চেয়েছিলেন কবি, যা না-পেয়ে এমন হতাশা! "মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে"—এই উপলব্ধি এতো গভীর বেদনা জাগায় কেন? 'কাল্পনিক' গানে কবির মনে একটি বিরাট প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে—তিনি খুঁজছিলেন এমন রক্ত-মাংসের নারী যে রূপে-গুণে ঐ-মানস প্রতিমার সমুপযুক্ত পাত্রী হ'তে পারে। স্বভাবতই সে-খোঁজা ব্যর্থ হয়েছে, "কেহ নাহি দিল ধরা শুধু সুদূর সাধনে।"

একেবারেই কি ব্যর্থ হ'লো? না। এই খোঁজা রবীন্দ্রনাথকে মহত্তর এবং তাঁর কাব্যরচনার পক্ষে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ খোঁজার পথ দেখিয়ে দিলো। ইতিপূর্বে প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে

লিখেছিলেন : "একেই বলো ভালোবাসা? আমার ভালোবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু 'মানসী'তে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?"

অতুলনীয় সৌন্দর্য ও চারিত্র্যের সমাবেশে আমরা প্রেয়সীর প্রতিমা রচনা করতে পারি এবং রচনা ক'রে শিল্পী-সুলভ তৃপ্তি বোধ করতে পারি এ-কথা জেনেও যে "সে মানসেই আছে"। তেমনি পরম শুভ, পরম সুন্দর ও পরম শক্তির সমাবেশে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমা রচনা করতে পারি। তবে তা অবশ্যতই অসম্পূর্ণ হবে। সম্পূর্ণ হ'তে গেলে সেই প্রতিমার আর-একটি ভিন্ন পর্যায়ের কিন্তু অপরিহার্য গুণ থাকা চাই। সে-গুণটি হচ্ছে যাথার্থ্য (যথা + অর্থ), বাস্তবানুগত্য। যা শুধু মানসেই আছে তা ঈশ্বরের প্রতিমা নয়, কাল্পনিক ঈশ্বর ঈশ্বরই নন: ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় তাঁকে মায়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ গদ্যে-পদ্যে বার-বার মায়াবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন, কখনো হাল্‌কা সুরে, কখনো গম্ভীর কণ্ঠে। যথার্থই বলেছেন, বেশ একটু জোর দিয়ে বলেছেন, যে তাঁর জীবনের এবং কাব্যের অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি
হে বিচিত্ররূপিনী।

ঈশ্বরের যে-মানস প্রতিমা আমরা রচনা করি, তার যাথার্থ্য বা বাস্তবিকতার উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করেছি। যাথার্থ্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু তা সম্পূর্ণত যথার্থ না-হ'লেও ঈশ্বর-প্রেমাকুল-হৃদয় হার মানে না। নারী-প্রেমের বেলা যেমন ঈশ্বর-প্রেমের বেলাতেও তেমনি বাস্তব ও কল্পনার, দৃষ্টি ও সৃষ্টির সমাবেশ ঘটতে পারে। 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বর-প্রেমে তা-ই ঘটেছিলো।

জগতের মাঝে প্রকৃতির রূপে ও নারীর ব্যক্তিস্বরূপে রবীন্দ্রনাথ

ঈশ্বরের স্বাক্ষর দেখেছিলেন। কিন্তু জগৎময় সর্বত্র কি দেখতে পেয়েছিলেন? পাননি ব'লে মানব-জগৎ থেকে স'রে গিয়ে নির্জনতার তীরের দিকে পাড়ি জমাতে হয়েছিলো, বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর খেয়া পার হ'তে হয়েছিলো তাঁকে। নির্জনে নিভৃতে ধ্যানাসনে ব'সে তিনি শিল্পীর হাতে-গড়া ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ মানস প্রতিমাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

এ-কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে আমার প্রিয় আর-একজন ঈশ্বর-প্রেমিকের কথা যাঁর ঈশ্বর-প্রেমের রস ও রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঈশ্বর-প্রেমের দুই ভিন্ন রূপ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানেও প্রকাশ পেয়েছে। এক, 'রাজা' নাটকে ঠাকুরদার ঈশ্বর-প্রেম—যিনি তাঁর বন্ধুকে একাধারে ভয়ংকর ও মধুর ব'লে জানেন, এবং জেনেও ভালোবাসেন অনেকটা স্পিনোজার মতো। তবে স্পিনোজা তাঁর ঈশ্বর-প্রেমকে "intellectual love of God" আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রতি-তুলনায় গীতাঞ্জলি পর্বের রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-প্রেমকে emotional love of God বলা যায়—যে-প্রেমের পরিধিতে "মধুর তোমার শেষ যে না পাই", কঠোরতার স্বীকৃতি যতোটুকু আছে তা পিতৃপ্রতিম স্নেহসিক্ত; নির্মম উদাসীন কঠোরতা নয়; কল্যাণসাধনেরই অঙ্গস্বরূপ সে-কঠোরতা।

স্পিনোজার ঈশ্বর-ভাবনায় সত্যের (সর্বজনীন সত্যের) এবং কাজে-কাজেই বিষয়ানুগত্যের দাবী ছিলো মৌলিক। সে-সত্য অংশত যতো নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর হোক্ তার সমগ্র রূপটি এই 'ঈশ্বর-মাতাল অনীশ্বর বাদী'র চোখে সুন্দর ঠেকেছিলো; সেই বিশ্বজাগতিক নির্মম সত্যকে স্পিনোজা ভালোবেসেছিলেন, তাতেই তিনি 'human bondage' থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন; পেয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে গীতাঞ্জলি পর্বের গানগুলিতে ব্যক্ত ঈশ্বর-প্রেম নিভৃত নির্জন কক্ষের ব্যক্তিগত রসানন্দে ভরপুর ব্যাপার, অনুভূতির সত্যতা

এবং পূর্ণতাই সেখানে বড়ো কথা, অনুভূত বিষয়ের ঐকান্তিক সত্য গৌণ। এই হৃদয়গত ঈশ্বর-প্রেমে নারী-প্রেমের মতো রয়েছে বাস্তব ও কল্পনার, দৃষ্টি ও সৃষ্টির সমন্বয়।

নারী-প্রেম, প্রকৃতি-প্রেম ও ঈশ্বর-প্রেমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্কে। কিন্তু ঐ-সময়ে ('মানসী' থেকে 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত) আর-এক প্রেম রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে প্রবল ছিলো। তার সঙ্গে ঈশ্বর-প্রেমের সম্পর্ক 'বিক্ষোভ' ও 'সংঘাত'-এর। সে-কথা একটু পরে আলোচ্য।

বই ছাপা শেষ হওয়ার পর দেখা গেলো, "পথের শেষ কোথায়" প্রবন্ধের প্রথম দুটি পর্বাধ্যায় অভাবনীয়ভাবে বাদ পড়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য সেই পৃষ্ঠা সংখ্যার (১২৬) সঙ্গে ক, খ ইত্যাদি যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে প্রকাশক, লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলে মার্জনাপ্রার্থী।

পথের শেষ কোথায়

'মানসী'তে যেমন নারী-প্রেম ও মানব-প্রেম অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, 'চিত্রা' কাব্যে তেমনি 'জীবনদেবতা' প্রত্যয়ের স্থান বিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য-সাধনায় ও জীবনচর্যায় উৎকর্ষের যে আসংজ্ঞাত (semi-conscious) প্রেরণা অনুভব করতেন তাকেই তাঁর 'জীবন-দেবতা' আখ্যা দিয়েছেন। 'জীবনদেবতা' সাধারণত পুরুষ-রূপে ক্বচিৎ-কখনো নারীরূপে কল্পিত। 'জীবনদেবতা' কি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে পরমোৎকর্ষ বা ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন ? সে-কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে 'সোনার তরী'র শেষ এবং সবচেয়ে সুন্দর কবিতা "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য়।

'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'কল্পনা' কাব্যের তিনটি শ্রেষ্ঠ কবিতা যথাক্রমে "নিরুদ্দেশ যাত্রা", "সন্ধ্যা" ও "দুঃসময়"—বলা বাহুল্য আমার রুচিতে ও বিচারে। "নিরুদ্দেশ যাত্রা" ও "দুঃসময়" তুলনীয় এবং প্রতিতুলনীয়। দুটি কবিতারই কাল ঘনায়মান সন্ধ্যা ও আসন্ন রাত্রি, দুটিতেই অকূল সাগরে পাড়ি দেবার কথা বলা হয়েছে ; প্রথম-টিতে কবি চলেছেন তরীতে, দ্বিতীয়টিতে কবি তাদাত্ম্যবোধ করছেন সেইসব সাগরপারে উড়ে যাওয়ার মতো সক্ষম ডানাওয়ালা পাখির সঙ্গে যারা এ-কুল ছেড়ে ও-কুলে আশ্রয় খোঁজে। তবে দুটি কবিতার অনুভূতি ও মনোপ্রতিন্যাস ভিন্ন। প্রথমটিতে আশঙ্কা প্রবল কিন্তু আশঙ্কা বিধৃত রয়েছে আশার মধ্যে এবং সে-আশা অত্যন্ত ক্ষীণ নয়। দ্বিতীয়টিতে নৈরাশ্য গভীর ও দুর্ভেদ্য, তবু এতোটা দুর্ভেদ্য নয় যাকে আতঙ্ক বলা যায়। দুটিতেই ভাবী স্বর্ণযুগের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়নি সে-দিকে ; বরঞ্চ আমার মনে হয় দুটি-

তেই কবি পৌঁছতে চান সেই মানব-ভাগ্যবিধাতার কাছাকাছি যিনি সকল স্বর্গের ও স্বর্ণযুগের অঙ্গীকারস্বরূপ।

"নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় কবি চলেছেন একা সোনার তরীতে ব'সে। হাল ধ'রে অবশ্য সামনেই রয়েছেন তাঁর জীবনদেবতা। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ আমি সোনার তরীর কর্ণধারকে মানসসুন্দরী (Muse) বলেছিলাম। এখন আট বছর পরে আবার ঐ-কবিতা বিষয়ে কিছু লিখতে গিয়ে মনে হ'লো জীবনদেবতাকেই কর্ণধাররূপে কল্পনা করলে কবিতাটির ভাবসঙ্গতি আরও স্পষ্ট হয়, ভাবচ্ছবিগুলি আরও সুবিন্যস্ত হয়। তাঁর জীবনদেবতা কি নৌকোর হাল ধ'রে কবিকে পৌঁছিয়ে দেবেন ঈশ্বরের কূলে?

ঈশ্বরের ব্যাকুল সন্ধান 'মানসী' কাব্য থেকেই লক্ষ করা যায়। তবে সে-ব্যাকুলতা স্পষ্ট ভাষা পেয়েছে 'চিত্রা'র "জ্যোৎস্নারাত্রে" শীর্ষক কবিতায়:

আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্যনিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তরমন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা-লাগি, বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত-যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা।

অর্ঘ্যভার জ'মে উঠেছে কিন্তু দেবতা তখনো অজ্ঞাত, অনুপলব্ধ। কার চরণে তিনি নিবেদন করবেন এই অর্ঘ্য?

ইতিপূর্বে 'মনের মাধুরী মিশায়ে' প্রেয়সীর মানস-প্রতিমা বা ideal image গড়বার কথা আলোচনা করেছি। "কাল্পনিক" কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করেছিলেন এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে রক্ত-মাংসে গড়া এমন মেয়েকে যে ঐ "মম শূন্যগগনবিহারী" প্রতিমার

সমুপযুক্ত আধার হ'তে পারে। সে-সন্ধান তাঁর ব্যর্থ হয়েছিলো। উদ্ধৃত পঙক্তিগুলিতে তিনি সন্ধান করছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বা বিশ্বোত্তীর্ণ পরলোকে এমন-কোনো সত্তার যা তাঁর আপন হৃদয় ভেঙে মনের বাসনা ও মাধুরী মিশিয়ে গড়া মানস-প্রতিমার সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাবে। এ-সন্ধানও কি ব্যর্থ হবে? এই সন্ধানের সাময়িক সাফল্যের আনন্দ এবং অন্তিম ব্যর্থতাবোধের বেদনাই আমার প্রবন্ধের মৌলিক প্রসঙ্গ।

প্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছনোর পথ খুব বন্ধুর নয়, খুব বেশি দীর্ঘও নয়। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে কিংবা মানব-সমাজের মধ্যে পরম প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতিকৃতি আবিষ্কার করা মোটেই সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কিনা সে-সন্দেহও জাগে মনে। কারণ সেখানে বহু লোকের ঘৃণ্য পাপের এবং দুঃসহ যন্ত্রণার অস্তিত্ব ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছবার পথকে অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল ক'রে রেখেছে। ঈশ্বর-প্রেমিক কবি নিজের দুঃখকে ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করতে পারেন; যতোই ব্যথা বাজুক বুকে ভাবতে পারেন দুঃখের অনলেই জ্বলবে তাঁর মঙ্গল আলোক। কিন্তু যে-বিধবার একমাত্র তরুণ পুত্র রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে অথচ কোনোরূপ চিকিৎসা করাবার সঙ্গতিও নেই যার, তার কাছে গিয়ে ঐ-সব ললিত বাক্য উচ্চারণ করা একটু নিষ্ঠুর শোনাবে না কি?

স্বকীয় ঈশ্বরভাবনায় পরের দুঃখের চ্যালেঞ্জকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন-প্রকারে গ্রহণ করেছেন—ভাবের সামঞ্জস্যের মধ্যে নয়, কর্মের আহ্বানের মধ্যে:

"এর ("এবার ফিরাও মোরে" রচনার) পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের কেবল মাধুর্যের তাহা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়। এ আহ্বান তো

শক্তিকেই আহ্বান ; কর্ম-ক্ষেত্রেই এর ডাক ; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।...

"এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে-শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল। এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।"*

অনুরূপ ভাব রবীন্দ্রনাথ বার-বার প্রকাশ করেছেন গদ্যে ও পদ্যে। উদাহরণত :

> দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
> সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
> সেথায় উত্তরি ফেলি পরি বর্ম,
> সেথায় নির্মম কর্ম ;

'নির্মম' বিশেষণটা লক্ষণীয়।

কিন্তু ধ্যানের চোখে কি দুঃখ ও পাপের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না? বিশ্বজাগতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কি মানব-সমাজের কোনো স্থান নেই? সামঞ্জস্য কি একেবারে অসাধ্য, নাকি শুধু অত্যন্ত কঠিন? অত্যন্ত কঠিন ব'লে কি জগতের এই বিরাট (পরিমাণগত নয়, গুণগত বিরাট) অংশটাকে কবি ধামা-চাপা দিয়ে রাখবেন, অথবা কাঁচি চালিয়ে ছাটাই ক'রে ফেলবেন?

> বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ
> কেমনে দিই ফাঁকি,
> আধেক ধরা পড়েছি গো
> আধেক আছে বাকি।

*'কল্পনা' (১৩৫৬), পৃ ১২৫

ফাঁদ কি সত্যিই বিশ্বজুড়ে পাতা আছে, আমি যে ধরা পড়ছি না সেটা আমারই হৃদয়ের বা দৃষ্টির অনবধানী অনাগ্রহবশত? নাকি বিশ্বের একটি প্রধান অংশে, আমাদের পক্ষে প্রধানতম অংশে, ফাঁদ আদৌ পেতে রাখেননি ভগবান; মানব-সমাজে দুঃখ ও পাপের 'অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ' কি জাগতিক সৌন্দর্যের চিত্রে তথা ঈশ্বরের প্রেমকল্যাণময় মূর্তিতে একটা বিরাট কলঙ্কস্বরূপ নয়? রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা এবং মানব-দরদ যে ঐ-সময়ে কতোখানি তীব্র ছিলো তার অত্যন্ত জোরালো এবং অতিশয় রসোত্তীর্ণ প্রকাশ 'কল্পনা'র অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্য 'চিত্রা'র "এবার ফিরাও মোরে" ও "সন্ধ্যা"তে যথাক্রমে।

'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিষাদের সবচেয়ে ঘনীভূত রূপ আমরা দেখি "দুঃসময়" কবিতাটি। দুঃসময় বললে মনে হয় যে সুসময় ছিলো; যে-কোনো কারণে হোক্ সেটা কেটে গিয়ে দুঃসময় নেমে আসছে 'মন্দ মন্থরে', তারও অবসান হবে, সুখের দিন আবার আসবে মানব-ভাগ্যে। কী ব্যক্তির জীবনে, কী মনুষ্য জাতির ইতিবৃত্তে এমন ঋতুরঙ্গ-সুলভ চক্রগতির কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক, বলা প্রত্যাশিত। বলেছেনও একাধিকবার। কিন্তু এই কবিতাটিতে তার চেয়ে বেশি বলতে চাইছেন।

দিন শেষ হ'য়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মূল্যবান কিছু হারানোর বেদনা অপেক্ষা অশুভ কিছু যে আসন্নপ্রায় তারই মহা আশঙ্কা স্পষ্টতর রূপ পেয়েছে এই কবিতায়; কবিও যেন চরাচরের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সেই আশঙ্কা 'জপিছে মৌন মন্তরে'। কবিতাটি মন্ত্রোচ্চারণধর্মী। কারো-কারো মতে শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই তা-ই।

'সঙ্গীত' বলতে এখানে মানব-জগতের কোলাহল এবং হাহাকার বোঝাতে চাইছেন না রবীন্দ্রনাথ, চাইতে পারেন না। গালিব অবশ্য দুঃখের হাহাকারকেও সঙ্গীতরূপে ভাবতে পেরেছিলেন: "দুঃখের

রাগরাগিণীর মূল্যও বুঝতে শেখো, হৃদয় আমার,/অস্তিত্বের এই বিচিত্র বীণাটি একদিন একেবারে নিঃশব্দ হ'য়ে যাবে।" সম্ভবত এ-সঙ্গীতের অর্থ বিশ্বজাগতিক সঙ্গীত (music of the spheres)। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলো কোন্ অপদেবতার ইঙ্গিতে? না, থেমে ঠিক যায়নি, তবে তাতে কবি আর তৃপ্তি বোধ করছেন না, মনোযোগ দিতে পারছেন না। 'গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া'র অর্থ কি এই যে সেই অপূর্ণ সঙ্গীত একটি পূর্ণতর সঙ্গীতের ইঙ্গিতে পরিণত হয়েছে? হয়তো-বা কবির মনে সন্দেহ জাগছে যে বিশ্বসঙ্গীত এখনো রচিত হয়নি, কেবল একটি গর্জন শোনা যাচ্ছে: "এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে", জগৎবাসীরা "নিঃশ্বাস-বায়ু সম্বরি/স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।" সকলের যখন একই দশা তখন আবার বিরলে কেন? ঐ-শব্দটা কি অনভ্যুদিত ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষমান জগতের বেদনা ব্যক্ত করছে?

"দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা" বলা হয়েছে বটে প্রথম স্তবকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একেবারে ঢাকা নয়, অথবা অবগুণ্ঠনটি খুব পুরু নয়, উর্ধ্ব-আকাশে তারাগুলি দেখতে পাচ্ছে বিহঙ্গ, যদিও তাদের ইঙ্গিতময় ভাষা ঠিক বুঝতে পারছে না; "ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা"ও দূর-দিগন্তে দৃশ্যমান। যেটুকু আলো অবশিষ্ট তাকে অগ্রাহ্য ক'রে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে পূর্বদিগন্তে; আকাশ উষা-দিশাহারা ব'লেই সমস্ত আশঙ্কা ও আকুলতা, এমন-কি গভীর নৈরাশ্যও। তৎসত্ত্বেও নিজের কবি-পুরুষকে বলছেন, এখনি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লে চলবে না, "এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।" 'অন্ধ' কেন? যে-বিহঙ্গ উর্ধ্বে তারা-ভরা আকাশ, বাঁকা চাঁদ, এবং নিম্নে "গভীর অধীর মরণ"-এর ধাবমান তরঙ্গের পরে তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছে সে তো "অন্ধ" নয়।

'কল্পনা'র "দুঃসময়" এবং 'উৎসর্গ'-এর ৩১-সংখ্যক কবিতা পাশা-পাশি রেখে পড়লে বোঝা যায় যে রবীন্দ্র-মানসে তথা রবীন্দ্র-কাব্যে পালাবদল ঘটেছে; আমরা এক পর্যায় সমাপ্ত ক'রে অন্য পর্যায়ে

পৌঁছেছি। 'উৎসর্গ'-এর কবিতায় কালিমা আরও গভীর এবং দুর্ভেদ্য, তবু নৈরাশ্য মোটেই গভীর নয়।

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্-দিগন্ত ঢাকি
... ...
আজি দেখ ঐ পূর্ব অচলে চাহিয়া, হোথা,
কিছুই না যায় দেখা—
. ...
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন, আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি আমরা খাঁচার পাখি।

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিত্বকে বিশ্লিষ্ট ক'রে খাঁচার পাখি ও মুক্ত পাখির রূপক দ্বারা সেটি ব্যঞ্জিত করেছেন। খাঁচার পাখি হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের গ্লানিতে ভরা, দুঃখভারনত মানুষ, যার দৃষ্টি স্বভাবতই সঙ্কুচিত ও ক্ষণকালের মধ্যে আবদ্ধ। মুক্ত পাখি হচ্ছে রবীন্দ্র-মানসের অন্তস্তলে গোপন কবিপুরুষ, যে ক্ষণকালকে মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখে, ডানা মেলে সকল মেঘের ঊর্ধ্বে উড়ে যেতে পারে এবং সেখান থেকে বিমল প্রাণে গাইতে পারে :

'নেবে নি নেবে নি প্রভাতের রবি' কহো আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান আমরা খাঁচার পাখি।

রাত্রির কালিমা যতোই নিশ্বাসরোধকারী হোক্, সকল কালো মেঘের ঊর্ধ্বে উঠে আসন্ন উষার আলো দেখতে পাচ্ছে মুক্ত পাখি—তাই তো সে কবি, ঔপনিষদিক অর্থে কবি। এই কবিতাটি পরবর্তী পর্বের সূচনা।

'খেয়া' কাব্যে আমরা পাই কবির বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব (split personality) নয়, পাই একজন দ্বিধাগ্রস্ত কবিকে—যিনি মনস্থির করতে পারছেন না খেয়া পারাপারের নৌকায় উঠে অন্য পারে যাবেন কিনা। 'খেয়া' মোটের উপর দ্বিধার কাব্য।

এর পরেই 'গীতাঞ্জলি'। সকল বিষাদ কেটে গেছে, দ্বিধা ঘুচে গেছে, কবি পৌঁছেছেন মিলনকুঞ্জের আনন্দদ্বারে, শুনতে পাচ্ছেন প্রেমিক ঈশ্বরের বাঁশি; সেই বাঁশির সুরে সাধছেন নিজের বাঁশিটিকে। সকল দুঃখের অবশ্য অবসান ঘটেনি, কারণ প্রেমের মধ্যে তীব্র বেদনার পালা আছে; তবে সে-বেদনাও আনন্দ-সিঞ্চিত। প্রেমের সুখদুঃখময় গভীর আনন্দের গান রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন তাঁর তিনখানি অবিস্মরণীয় গীতাখ্য কাব্যে। পরবর্তী কাব্যে আর পারেননি শত চেষ্টা সত্ত্বেও; বারে-বারেই সুর কেটে গেছে, ছন্দপতন ঘটেছে। "সুরহারা প্রাণ সে বিষম বাধা" ('বৈকালী')।

'কল্পনা'র "দুঃসময়" কবিতাটিতে একটিমাত্র বিহঙ্গের কথা শুনি আমরা; সে-বিহঙ্গ কবি-পুরুষেরই প্রতীক। সারাদিন ওড়ার পর তার সর্বাঙ্গ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, তবু তাকে এখনও উড়তেই হবে--যদিচ মহানভ-অঙ্গনে উষার দিশা দেখতে পাচ্ছে না, নিবিড় তিমির ভেদ ক'রে আশার আলোর ক্ষীণতম আভাস নেই কোথাও যার বার্তা সে শোনাতে পারে!

আমার প্রশ্ন হচ্ছে: সারাদিন উড়ে কবি-বিহঙ্গ তো অনেক-কিছুই দেখেছে, সে-সব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে বিহঙ্গকে অর্থাৎ নিজেকে 'অন্ধ' বলছেন কেন? 'অন্ধ'-এর অর্থ যদি করা হয় (যেমন কেউ-কেউ করেছেন) ঈশ্বর-দর্শনের অক্ষমতা, তবে কবি-বিহঙ্গ কি অদ্যাবধি বরাবরই অন্ধ ছিলো, 'খেয়া'-'গীতাঞ্জলি' পর্বে এসে কি সে প্রথমবার দৃষ্টি-শক্তি লাভ করলো? এটা তো আকস্মিক ব্যাপার হ'তে পারে না, পিছনে নিশ্চয় কতকগুলি কারণ সক্রিয় ছিলো। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'অন্ধ' শব্দের অর্থ-জিজ্ঞাসা আমার কাছে প্রয়োজনীয় বোধ হ'লো।

'অন্ধ'-এর অর্থ কি তবে এই যে জন্মসূত্রে পাওয়া পশুসুলভ অন্ধ প্রবৃত্তিগুলি মনুষ্য দেহমনকে এখনও আঁকড়ে রেখেছে, আমরা তা ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি বেশি দূর? দ্বিতীয়ত, জাগতিক নিয়মকে

ন্যায়ের রাজ্য বলা যায় না এখনও। কোনোদিনই বলা যাবে না হয়তো, কারণ নিয়মের রাজ্য (natural order) এবং নীতির রাজ্য (moral order) ভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপার, পরস্পর বিরোধী না-হ'লেও পরস্পর-নিরপেক্ষ। বরঞ্চ বলা উচিত যে বিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক সাধনার ফলে নিয়মের রাজ্য যতোই আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে এবং পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করছে, আমরা ততোই নীতির রাজ্যের খণ্ডিত প্রকাশ দেখে ক্লিষ্ট হচ্ছি, হতাশায় ভেঙে পড়ছি।

কবিতাটির আরম্ভ সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে। কিন্তু সন্ধ্যা তো একটি দিনের সমাপ্তি, তার পূর্বে অনেকগুলি প্রহর কেটে গেছে—উষা, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ। বিহঙ্গটি নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী উষার আলো দেখে পাখা মেলে আকাশে উড়তে শুরু করেছিলো, এবং প্রহরের পর প্রহর দিবালোকে অনেক-কিছু দেখেছে সে। তার কোনো মূল্যবোধ বা তাকে হারানোর বেদনা পাই না কবিতাটিতে। কেন? কবি-বিহঙ্গের বিগতদিনের ওড়া অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে এবং ক্লান্তিই এনেছে; সে শুধু নিয়মের রাজ্যই দেখতে পেয়েছে, নীতির রাজ্য দেখতে পায়নি। তাইতো সে এখনো "অন্ধ"। নিয়মের এবং নীতির রাজ্য পাশাপাশি উপলব্ধ হ'লে তাকেই ঈশ্বরোপলব্ধি বলা যায়। এই উপলব্ধি যখন হবে তখনই তার অন্ধতা ঘুচবে।

উষা থেকে বিকাল পর্যন্ত বিহঙ্গ যে-দিন পেরিয়ে এলো সেটা ছিলো জ্ঞানের যুগ। তার স্বাশ্রয়ী (intrinsic) মূল্য এবং বিশুদ্ধ আনন্দময়তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করছেন না। তবে হতাশ বোধ করছেন জ্ঞানের সঙ্গে সার্বিক কল্যাণের অতি অপূর্ণ অন্বয় দেখে। সমন্বয় পূর্ণ হবে যে-উষায় তারই প্রতি চেয়ে আছেন সব ক্লান্তিকে উপেক্ষা ক'রে। উষা-দিশাহারা আকাশের ঘনীভূত তিমির যেন শ্বাস-রোধ করছে কবির।

কিন্তু মানুষের জ্ঞান কোনোদিন পূর্ণ হবে না, পরহিতৈষণাও

সীমিতই থাকবে। জড়বুদ্ধি ও স্বার্থপরতা মানবত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে অতি মন্থর গতিতে উত্থানপতন-বন্ধুর পথে এগিয়ে চলবে, এর বেশি কিছু আশা করা যায় না।

পশুত্ব যেমন মানুষকে নিচের দিকে ঠেলছে বা আটকে রাখছে, দেবত্ব তেমনি উপরের দিকে টানছে। উপরের দিকে টানছে যে-শক্তি তাকে রবীন্দ্রনাথ পরে "মনের মানুষ" বা "চিরমানব" ব'লে অভিহিত করবেন। এই দেবতা সত্য, কেবল মন-গড়া আদর্শ নন, কারণ টানটা সত্য। কিন্তু এই সত্য দেবতা সর্বশক্তিমান নন। সর্বশক্তিমান যিনি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যিনি "বিশ্বজাগতিক দেবতা"—তিনি সংখ্যাতীত নীহারিকাখচিত সীমাহীন দেশকালকে বেঁধে রেখেছেন কঠিন নিয়মের জালে। সে-নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। এই শক্তির দেবতা নির্মম, উদাসীন; তাঁকে শুভ বা অশুভ কিছুই বলা যায় না।

শক্তির সঙ্গে কল্যাণের যোগ বহির্বিশ্বে অখণ্ডিত নয়; মানব-মনেও হয়তো পূর্ণ হবে না কোনোদিন। তবু হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না "তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, / এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।"

কী সে আশ্চর্য গতিবেগ যা মাত্র কয়েকটি প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে প্রায় সমভাবে আকাশময় ছড়ানো আলো ও বিদ্যুৎকণাগুলির মধ্যে এমন এক মহা-আলোড়ন জাগিয়ে তুললো যার ফলে কোটি-কোটি বায়বীয় নীহারিকার সৃষ্টি হ'লো, বায়বীয় নীহারিকাগুলির অনেক ক'টি পরিণত হ'লো লক্ষ-লক্ষ তারকাপুঞ্জে, অল্প কয়েকটি তারকার ছিটকানো অংশগুলি ঘুরতে লাগলো গ্রহরূপে, তাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্ঘট ও অসম্ভাব্য রাসায়নিক যোগাযোগ তবু ঘ'টে গেলো যাতে এককোষী প্রাণীর বিকাশ সম্ভব হ'লো। এককোষ-গুলির সমন্বয়ে বহুকোষী প্রাণীর জন্ম, অসংখ্য শাখায়-প্রশাখায় তাদের বিবর্তনের গতি, প্রগতি, অধোগতি ও বিলোপের পর আজও যারা অবশিষ্ট—virus কণা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়া থেকে বৃহদাকার

হস্তী, উষ্ট্র, হিপোপটেমস্ ও তিমি, এবং সর্বোপরি আমাদের গর্বের ও লজ্জার মনুষ্যজাতি—তাদের সংখ্যাও আজ গণনার অতীত। এরই মাঝখানে অভ্যুদিত (নাকি আবির্ভূত?) হ'লো 'মন' নামক এক অত্যাশ্চর্য পদার্থ যা দেহের সঙ্গে, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পৃক্ত হ'য়েও দেহের ব্যাপার মাত্র (function মাত্র) নয়; যা অন্তর্দর্শী, অনুব্যবসায়ী (introspective), হিতাহিত বোধ-সম্পন্ন, বিজ্ঞানান্বেষী, ব্রহ্মজ্ঞান-প্রয়াসী।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে,
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে,
ভ্রমি বিস্ময়ে।

জাগতিক অবক্ষয়ের বিপুল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভাঁটার স্রোতোধারাকে যেন স্পর্ধাপূর্বক অগ্রাহ্য ক'রে থার্মোডাইনামিক্সের বহুবিঘোষিত দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে উজান বেয়ে চলেছে প্রাণের উপলবন্ধুর বিচিত্র বিকাশ ও বিবর্তন। যে-শক্তিবেগে প্রাণের এই ধৃষ্টতা, বের্গসঁ তাকে আখ্যায়িত করেছেন 'এলাঁ ভিতাল' নামে। যে-নামই দিই-না কেন, এ-সব কথা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যাই; মাথা আপনিই নত হয়। ভগবৎ-ভক্তিতে? কথাটা বেখাপ লাগে।

'ভগবান' শব্দটা অবশ্য ধর্মে ও দর্শনে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্পিনোজা 'ভগবান' এবং 'ভগবৎ-প্রেম' যে-অর্থে প্রয়োগ করেছেন তাতে বেখাপ লাগার কিছু নেই। কিন্তু ঠিক এই ঈশ্বরের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে, সে-ঈশ্বরের উপলব্ধি ঘটেনি গীতাঞ্জলি পর্বে। স্পিনোজার ঈশ্বরের ভাবনা এবং 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বরে ফিরে যাওয়ার কিংবা তাঁকে আপন সমৃদ্ধতর হৃদয়-মনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার ব্যর্থপ্রায় প্রয়াসের বেদনা আমরা পাবো শেষ পর্বের কাব্যে।

'চিত্রা'র "সন্ধ্যা" এবং 'কল্পনা'র "দুঃসময়"-এর পর যে-কবিতাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি 'খেয়া'র "দিনশেষে"। প্রসঙ্গত ব'লে রাখতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের সমূহ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'খেয়া' আমার মতে সবচেয়ে অমূল্য। এতোগুলি অর্থঘন মর্মস্পর্শী কবিতা বোধ-করি আর-কোনো একখানা বইতে পাওয়া যাবে না। এই রত্নভাণ্ডারে "শুভক্ষণ", "আত্মত্যাগ"ই সবচেয়ে মহার্ঘ রত্ন। তবে "দিনশেষে"ও অতীব সুন্দর কবিতা।

মধ্যবর্তী দুটি বই সম্পর্কে এখানে বিশেষ-কিছু বলতে চাই না, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। "দুঃসময়"-এর ক্লান্ত বিষাদ ও ঘনান্ধকার থেকে নিষ্ক্রমণের পথ এ দু-খানি কাব্যে নির্দেশিত হয়েছে। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের পথ নয়, এটা তিনি অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন। 'নৈবেদ্য' বড়ো বেশি পরাশ্রয়ী, ঔপনিষদিক ভাবে ভাবিত এবং পিতৃদেবের দ্বারা প্রভাবিত। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে-"রাজার রাজা"র, যে-"সুন্দর"-এর, যে-"পরাণ-সখা বঁধুর" সন্ধানে বেরিয়েছেন সে-সন্ধান তাঁকে নিজের মতন ক'রে একান্ত নিজস্ব পথ কেটে নিজেই করতে হবে।

'ক্ষণিকা'তে যেন তিনি নিজেকে বলছেন: অভিলাষ সম্বৃত করো, তোমার আশেপাশে কতো নরনারীর ছোটো-বড়ো সুখ-দুঃখের কথা তোমার চোখে পড়ে, কানে পৌঁছয়, মর্মে বাজে। সেই সব কথার মূল্য কি কম? তাই কবিতাতে ফুটিয়ে তোলো; তোমার কবিসত্তা তাতেই সার্থক হবে। সার্থক হ'লো, কিন্তু তৃপ্ত হ'লো না; আরো পথ তাঁকে কাটতে হবে, বিক্ষত পায়ে আরো দীর্ঘ দুর্গম পথ হাঁটতে হবে।

হয়তো সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে তিনি পৌঁছবেন কোনো পান্থ-শালায়, কিছু আতিথ্য, কিছু বিশ্রাম পাবেন আশা ক'রে। দিনশেষে পৌঁছলেন তিনি ঠিকই, কিন্তু,

ভাঙা অতিথশালা,
ফাটা ভিতে অশথ-বটে
মেলেছে ডালপালা ;

… … …

আমি যেদিন এলেম, সেদিন
দীপ জ্বলে না ঘরে,
বহুদিনের শিখার কালি
আঁকা ভিতের পরে।

অতএব কবিবিহঙ্গ যেমন পাখা বন্ধ করতে পারেন না, নিচে কোনো আশ্রয়শাখা নেই যেখানে তিনি নামতে পারেন, আছে শুধু মৃত্যুগর্জমান অকূল সমুদ্র ; তেমনি কবি-পথিকও কোথাও থামতে পারেন না :

হায়রে বিজন দীর্ঘরাত্রি
হায়রে ক্লান্ত কায়া।

প্রায় অবিকল এই পরিস্থিতি ব্যক্ত হয়েছে অতি সুন্দরভাবে একটি গানে :

দীর্ঘ পথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে
খোলো খোলো খোলো দ্বার
জানিনা কে আছে কিনা
সাড়া তো না পাই তার।

একটি কেন, বহু সুন্দর গানেই এই পরিস্থিতির ব্যঞ্জনা রয়েছে। স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে কয়েকটি গানের—প্রাসঙ্গিক পঙক্তি এখানে তুলে ধরি :

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে
আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।

… … …

সহসা দারুণ দুঃখতাপে
সকল ভুবন যবে কাঁপে

সকল পথের ঘোচে চিহ্ন
সকল বাঁধন যবে ছিন্ন
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে—
... ...
সারা পথের ক্লান্তি আমার সারাদিনের তৃষা
কেমন করে মেটাবো যে খুঁজে না পাই দিশা।
... .
পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে
আমি সে কোন্ আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে।

বছর পনেরো আগে একটি সেমিনার ডেকেছিলেন খুব সম্ভব বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, যার বিষয় ছিলো এই ধরনের প্রশ্ন : "তোমার ভাষাব সাহিত্যকে টয়েনবির পরিভাষায় চ্যালেঞ্জ এবং রেস্‌পন্‌সের কাঠামোয় ফেলে ব্যাখ্যা করা যায় কি?"

সাহিত্যিকের মনের উপর বহির্জগতের অভিঘাত তো একটা চ্যালেঞ্জ বটেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যকেও এ-কাঠামোয় ফেলা যেতে পারে। কবি রবীন্দ্রনাথ তথা মানুষ রবীন্দ্রনাথের রেস্‌পন্‌স বা প্রতিক্রিয়া মোটামুটি তিন শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে একটা কথা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া ভালো। বহির্জগৎ বলতে প্রাকৃতিক ও মানবিক জগৎ দুই-ই বোঝায়। এ দুটি জগৎকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে রবীন্দ্র-মানসের প্রতিক্রিয়াও সহজে বিভক্ত হ'য়ে যায়: প্রাকৃতিক জগতের অভিঘাত নিয়ে যায় ভাবের বিস্তারের দিকে; দ্বিতীয়টি কর্মের আহ্বান বহন ক'রে আনে—সে-কথা আগেই বলেছি। মুশকিল বাধে দুটিকে মিলিয়ে দেখতে গেলে।

বহির্জগতের অভিঘাতে রবীন্দ্র-মানসের তথা রবীন্দ্র-কাব্যের ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে : (১) আশায় উজ্জ্বল এবং মোটের উপর প্রসন্ন; (২) আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান, আলো-আঁধারে আকুল; (৩) গভীর তিমিরে দিশাহারা, হতাশায় ভেঙে-পড়া।

প্রথম শ্রেণীর উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যায় যে-গানে রয়েছে, "সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, / সকল বাঁধন যবে ছিন্ন", তারই শেষে পাই "তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।" কিংবা যে-গানে আছে: "আমি সে কোন্ আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে", তার শেষ পঙক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে পরিপূর্ণ ভরসার ভাব: "দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে।" যে-গানে বলা হয়েছে: "সারা পথের ক্লান্তি আমার, সারা দিনের তৃষা / কেমন করে মেটাবো যে, খুঁজে না পাই দিশা।" সেই গানের উপান্তে আছে একটি আব্দার-পূর্ণ প্রার্থনা: "হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ: যে-গানে শুনি, "যে-পথ দিয়ে যেতে-ছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে", তার শেষে রয়েছে: "বুঝি-বা এই বজ্ররবে নূতন পথের বার্তা কবে/কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি।" 'বুঝি-বা' শব্দে-একটু দ্বিধা প্রকাশ পায়। 'বজ্ররব' শব্দটাও লক্ষণীয়। 'গীতাঞ্জলি'র পিতৃপ্রতিম পরাণসখা বজ্ররবে কথা বলেন না; বজ্ররবে কথা বলেন 'রাজা' নাটকের ভগবান যিনি একাধারে মধুর এবং অবি-চলিত নিষ্ঠুর।

যাকে বলেছি রবীন্দ্র-মানসের প্রতিক্রিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ভাব তার দৃষ্টান্তস্বরূপ আরো-কয়েকটি গান বা কবিতা পেশ করা যায়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ভাবটি উত্তীর্ণ-সত্তর রবীন্দ্র-কাব্যের সামগ্রিক রূপের বৈশিষ্ট্য। আরো ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে এই দোদুল্যমানতা সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যেই লক্ষণীয়।

'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত পর্বটি ছিলো মোটের উপর বিষাদ-ঘন; তার পরে 'খেয়া' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত একটি আনন্দবিভোর পর্ব পাই আমরা। এই ভাবান্তরকে দুঃখ থেকে আনন্দে উত্তরণ বলা যেতে পারে। কিন্তু এমনতরো উত্তরণ বারবার ঘটেনি। রবীন্দ্র-

কাব্যের ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ও বহুবর্ণ, বিবিধ টানাপোড়েনে (যথা — কর্ম ও ধ্যান, প্রেমিক ভগবান ও উদাসীন নির্মম মহাকাল) সংক্ষুব্ধ তথা সমৃদ্ধ ; এবং বিস্তারিত দৃষ্টিতে দেখলে ডায়-লেক্‌টিক্ গতিসম্পন্ন।

'বলাকা'তে রবীন্দ্র-কাব্য মোড় নিয়েছে, ভাবের দিক থেকে এবং ভঙ্গির দিক থেকে। তারপরে আমরা পৌঁছই শেষ পর্বে — যে-পর্বের কথা পূর্ববর্তী দুখানা বইতে আমি সবিস্তারে আলোচনা করেছি, বর্তমান নিবন্ধেও আরো-কিছু বলবো।

'তারপরে' মানে অব্যবহিত পরে নয় — মাঝখানে রয়েছে 'শিশু ভোলানাথ', 'পূরবী' ও 'মহুয়া'। তবে এ-তিনখানি বইকে প্রথম পর্বের পুনরাবর্তন বলা যেতে পারে — আরো পরিমার্জিত ভাষায় ও পরিণত ভঙ্গিতে।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত রেস্‌পন্‌সের উপর আমার লেখায় একটু এম্‌-ফ্যাসিস পড়েছে বোধ করি। তার কারণ এই দিকটা আমার পূর্বসূরী রবীন্দ্রানুরাগীদের রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় অবহেলিত।

গভীর তিমিরে দিশাহারা, নৈরাশ্যে ভেঙে-পড়া কবি-মনের মর্ম-স্পর্শী প্রকাশ পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের বেশ-কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গানে। এখানে শুধু দুটি গানের কথা বলি।

"অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে" — কিসের এই বেদনা যার হাহাকার চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে ? "করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা !" এতো কোনো ব্যক্তিবিশেষের বেদনা বা সাধনা নয়, সারা দুনিয়ার, অন্তত মানবিক দুনিয়ার, বেদনা ও সাধনা ব্যক্ত এই গানে। মানবিক জগৎ ঈশ্বর-বিরহে ব্যাকুল। কিন্তু সাধনা এখন পর্যন্ত বিফল হয়েছে, ঈশ্বর এখনও অনাবির্ভূত, জগৎ মঙ্গলময় অর্থাৎ ঈশ্বরময় হ'য়ে ওঠেনি ; এখনও ঈশ্বরের রাজ্য (kingdom or heaven) এ-পৃথিবীতে সংস্থাপিত হয়নি, আমাদের নৈতিক মূল্যবিচারে —

অরাজকতা এখনো চারিদিকে ব্যাপ্ত। এ-গানে বিষাদ অতল, গভীর, ঘন তিমির ভেদ ক'রে পরপারের আলোর ক্ষীণতম আভাস দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

"রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান" শীর্ষক প্রবন্ধের ('পান্থজনের সখা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম এই গান দিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করি সেই আশ্চর্য গানে যার প্রথম তিনটি শব্দে এ-বইয়ের নামকরণ।

বহু বৎসর পরে জীবনের শেষ লগ্নে সারাজীবন ধ'রে পথ চলার পর তিনি হতাশায় মুহ্যমান হ'য়ে প্রশ্ন করেছিলেন—"পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে"; শুনতে পেয়েছিলেন, শুধু নিজের বুকে "ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার"; অথচ তখনো "সম্মুখে ঘন আঁধার"। তারপরে একটি আশ্চর্য পঙক্তি; "পার আছে গো পার আছে"। মনে হয় কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে 'ক্ষীণ ভরসা'র আভাস দিচ্ছেন, আমরা আশা করি তারপরে সংযুক্ত হবে "নিশ্চয়ই কোনো দেশে পার আছে"। কিন্তু সংযুক্ত হয় আবারও একটি প্রশ্ন "পার আছে কোন্ দেশে", যার উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই নাতিপ্রচ্ছন্ন—কোনো দেশেই পার নেই, কোনো দেশে কোনো কালে পথ শেষ হবে না। মনে-মনে ভাবছেন, সারাটা জীবন মরীচিকার অন্বেষণ ক'রেই কাটিয়ে দিলাম। অথচ তাঁর পরম অন্বিষ্টকে—গীতাঞ্জলি পর্বের প্রেমকরুণাঘন স্নেহসিক্ত ভগবানকে—তো চরম আনন্দেই তিনি পেয়েছিলেন একদিন। আজ কি তাঁকেও মায়া-মরীচিকা (অদ্বৈতবাদীর ভাষায় "সর্বোচ্চ মায়া") ব'লে ঠাহর হচ্ছে? সম্ভবত। তাই তো আজ জীবনের শেষ প্রহরে "হালভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে"। "পথের শেষ কোথায়" নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার অন্যতম। বস্তুতপক্ষে এমন ক্লান্ত, নৈরাশ্যঘন, বেদনাভারাতুর ভাবনার এতোখানি রসোত্তীর্ণ প্রকাশ আর-কোনো কবির লেখায় আমি পাইনি।

শেক্স্পীয়রের কথা আলাদা। ম্যাক্বেথের অন্তিম স্বগতোক্তির* সবখানি উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ-কথা বলা আবশ্যক যে নাটকীয় পরিস্থিতি-বিশেষে নায়কের তীব্র ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারিত ঐ-জীবন-ভাবনার সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ করা আদৌ অসম্ভব ছিলো না নাট্যকারের পক্ষে, কারণ এলিয়ট্ যাকে বলেছেন "mixed and muddled thinking of the renaissance" শেক্স্পীয়র ছিলেন তারই শেষ দিককার অভিব্যঞ্জক। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অতোখানি অসম্বদ্ধ তিক্ত জীবনদর্শনের সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ করা একেবারেই অসম্ভব। তাঁর পথক্লান্তি যতোই দুর্বহ, বিষাদ যতোই ঘন, নৈরাশ্য যতোই মর্মান্তিক, নাস্তিক্য যতোই বেদনার্ত হোক্ তাঁর ভাব ও অনুভব ছিলো অন্য তারে বাঁধা, তুলনায় অনেকখানি কোমল মৃদু স্বরে উচ্চারিত।

১৩৮৩

* "She should have died here after,
There would have been a time for such a word.
To-morrow and to-morrow and to-morrow.
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time :
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon this stage
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing."

নয়নে কেন আঁধি

'গীতাঞ্জলি' বিষয়ে একটি নৈর্ব্যক্তিক সমস্যা

আমার প্রথম বই 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ 'গীতাঞ্জলি' বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যার কথা তুলেছিলাম। এখানে একটি নৈর্ব্যক্তিক সমস্যা আমার আলোচ্য, সমস্যাটি মোটের উপর 'গীতাঞ্জলি'র ভক্ত 'আমি'র অর্থ বৈচিত্র্য এবং প্রেমকরুণাময় 'ভগবান'-এর অর্থ বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র ক'রে। মূল সমস্যাটি তুলবার আগে দুটি প্রারম্ভিক কথা সংক্ষেপে ব'লে নিতে চাই।

প্রথমত, গীতাঞ্জলি পর্বের ভগবান 'চিত্রা'র জীবনদেবতা (কবির ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে সুন্দর ও শ্রেয়ের দিকে এগিয়ে দেবার প্রেরণা-দায়িনী শক্তি) নন। 'গীতাঞ্জলি'তে যাঁকে পাই আমরা তিনি উপনিষদ্-কথিত জ্যোতিষান্ জ্যোতিঃ, আলোর আলো, ত্রিভুবনেশ্বর, রাজার রাজা, ইত্যাদি পদবাচ্য। জীবনদেবতাকে জীবনস্বামী, পরাণবঁধু বলা যায়, কিন্তু তিনি সংখ্যাতীত নক্ষত্র নীহারিকাকে ধেনুর মতো আকাশময় চরাচ্ছেন এমন কথা বলা যায় না। জীবনদেবতার প্রথম লক্ষণীয় অবতারণা "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য়; সেখানে তিনি কবিকে সোনার তরীতে বসিয়ে হাল ধ'রে নিয়ে চলেছেন অকূল সাগরে। বিপদ ঘনিয়ে আসছে অন্ধকারের সঙ্গে-সঙ্গে, কিন্তু ভরসা স্তিমিত হয়নি কবির মনে যে জীবনদেবতা পৌঁছিয়ে দেবেন অপর তীরে, 'গীতাঞ্জলি'র ভগবানের তীরে।

দ্বিতীয়ত, যদিও রবীন্দ্রনাথ বেশ-কিছুদিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর হ্যাম-লেটের মতো to cross or not to cross, that's the question —মনে-মনে বিতর্ক ক'রে অবশেষে সাধারণ মানুষের কচিৎ সুখ এবং

বহুল দুঃখের তীর ছেড়ে খেয়া পার হ'য়ে চ'লে গেলেন নির্জনতার তীরে, তবুও শিল্পরচনা—বিশেষত কাব্যরচনা—যাঁর স্বধর্ম, তাঁর পক্ষে একান্তে আসীন হ'য়ে ঈশ্বর-প্রেমে বিভোর হওয়া সম্ভব নয়, যেমন তা সম্ভব সুফী দরবেশ বা মুনির (মৌনব্রতীর) পক্ষে। সন্ন্যাসী সমাজ সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ ক'রে হিমালয়ের কোনো দুর্গম গুহায় ব'সে দ্বাদশ বর্ষকাল কাটিয়ে দিতে পারেন মৌন তপস্যায়। তারপরে হয়তো তিনি পৌঁছান কোনো তূরীয় অবস্থায় বা লাভ করেন ঈশ্বরসাযুজ্য; কিন্তু সেটা আমরা জানতে পারি না, জনসমাজে ফিরে এসে কাউকে জানানো তাঁর পক্ষে জরুরী নয়, বস্তুত জানাবার ভাষাই তাঁর আয়ত্ত নয়। আমরা বরাবরই শুনে আসছি mystical realisation is ineffable, রাহসিক উপলব্ধি অনির্বাচ্য।

প্রতিতুলনায়, কবি শুধু বাঙ্ময় নন, অসাধারণ বাক্‌সিদ্ধ; এবং এই সিদ্ধিই তাঁর মৌল সিদ্ধি। সুতরাং আমরা যদি-বা বলি প্রমথ বিশীর মতো যে এই দ্বাদশ বর্ষকাল ('খেয়া'র কোনো-কোনো গান ও কবিতা থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত) (রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কাব্য থেকে বনবাস, ব'লেই বুঝতে পারি যে কথাটার মধ্যে আত্মখণ্ডন নিহিত রয়েছে। কারণ তিনি তো সমানে কবিতা লিখেই চলেছেন (সুরযুক্ত হ'লেও এই রচনাগুলি নিঃসন্দেহে কবিতা)। তাদের আপেক্ষিক মূল্যায়ন বিষয়ে মতভেদ ঘটতে পারে, কিন্তু সে-কথা আলাদা। কবিতা ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম। একদিকে আছেন বক্তা বা অভিব্যক্তা, অপরদিকে গ্রহীতা বা ভোক্তা। অবশ্য ভোক্তৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নন মানুষমাত্রই কোনো বাঙালি কবি আশা করতে পারেন না যে অ-বঙ্গভাষীরাও তাঁর কবিতা ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারবেন (অ-বঙ্গভাষায় যদি-বা অনূদিত হয়, অনুবাদে অনেক-কিছু হারিয়ে যায়); সব বাঙালিও পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে জনপ্রিয় বাঙালি কবি, তার মানে বড়ো জোর হাজারে একজনের প্রিয়

কবি। সেই সব বাঙালির প্রিয় কবি যাঁরা সুশিক্ষিত, পরিশীলিত-সংবেদনা ও অনুশীলিত-রুচি। এই বর্তমান কিংবা উদীয়মান রসিক-মণ্ডলীর কথা রবীন্দ্রনাথের মনে স্থান পাবেই, তিনি সাধারণ মানুষ থেকে যতো দূরেই স'রে গিয়ে থাকুন-না কেন গীতাঞ্জলি পর্বে। সন্ন্যাসীর নির্জনতা বিশেষীকৃত (qualified) হ'তে স্বধর্মত বাধ্য।

'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি কবিতা স্বগতোক্তিরূপে উচ্চারিত। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই একটি তৃতীয় পক্ষ (রসিক পাঠকবৃন্দ বা শ্রোতৃবৃন্দ) কবির মনে খুবই উপস্থিত। লিরিক কবিতা অনেকটা stage-whisper ধর্মী : কুশলী অভিনেতা আবেগোচ্ছল মুহূর্তে যেন ফিসফিস ক'রে কথা বলছেন আপন মনে অথবা প্রিয়ার কানে-কানে। কিন্তু সে-ফিসফিসানি এমন অনুশীলিত কণ্ঠে উচ্চারিত যে প্রেক্ষাগৃহে ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে তিন তলার গ্যালারীর শেষ পঙ্‌ক্তিতে যাঁরা ব'সে আছেন তাঁরাও স্পষ্ট শুনতে পান।

লিরিক কবিতামাত্রই—কিছু ব্যতিক্রম আছে অবশ্য—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ। কিন্তু প্রকাশের প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ কবিকর্মের ফলে তার ব্যক্তিগততা অপসারিত হ'য়ে পড়ে। আলঙ্কারিকদের ভাষায় ব্যক্তিগত ভাব যখন রসরূপ গ্রহণ করে তখন তাকে আর কবির ব্যক্তিগত ভাব বলা যায় না "তা আমার, কিন্তু সম্পূর্ণ আমার নয় ; পরের কিন্তু পরেরও নয়।" এ-কথা মেনে নিতে বোধহয় কারো আপত্তি হবে না। কিন্তু বর্তমানে আমার আলোচ্য সমস্যা ভিন্ন!

'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি কবিতা স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতা-বেদনা-প্রার্থনা অনুযোগ-অভিযোগ প্রকাশ করে। যথা "হেথা যে গান গাইতে আসা আমার হয়নি সে গান গাওয়া" ; "আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার"

তোমার সভায় কত-না গান
কতই আছেন গুণী ;

গুণহীনের গানখানি আজ

বাজল তোমার প্রেমে।

আবার এমনও কতগুলি কবিতা আছে যেখানে ভাবটা আদৌ ব্যক্তিগত নয় ব'লেই মনে হয়, অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' সর্বনামগুলির অভিধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। যথা, "হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ", "তাই তোমার আনন্দ আমার পর"। এই দুটি গানের মর্মকথা তিনি আরো বিশদ ক'রে আরো জোরদার ভাষায় বলেছেন 'শ্যামলী'র "আমি" কবিতায়; "আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ"। সেখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে 'আমি'র অভিধেয় মানুষমাত্রই।

কোনো পার্থিব নাট্যস্রষ্টার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমার বক্তব্যটা আরো-একটু বোঝাতে চেষ্টা করি। যেন শেক্‌স্‌পীয়র একটি উচ্চাঙ্গ নাটক—তা 'কিং লীয়র'-এর মতো নিদারুণ ট্র্যাজিডিও হ'তে পারে—রচনা ক'রে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পরিচালনা ক'রে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করালেন তারপরে তাকিয়ে দেখেন যে প্রেক্ষাগৃহ শূন্য। 'কিং লীয়র'-এর মতো ট্র্যাজিডির মধ্যেও একটি রসরূপ ফুটে ওঠে; সেই রূপটি বড়ো সুন্দর। কেউ যদি না-বলে, "হ্যাঁ, সত্যিই বড়ো সুন্দর" তাহ'লে তাঁর সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হ'য়ে যাবে নাকি? তখন কি তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা জাগবে না "হায় আমি যদি ঈশ্বর হতাম তবে হাজার খানেক রসিক দর্শক সৃষ্টি ক'রে এই শূন্য প্রেক্ষাগৃহটি ভ'রে দিতাম।" যিনি প্রকৃতই ঈশ্বর ('ত্রিভুবনেশ্বর') তাঁর মনের অনুরূপ ইচ্ছাটি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন পূর্ব-উল্লিখিত দুটি গানে ও কবিতায়। উপরন্তু আমরা জানি যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও কর্মে কোনো ব্যবধান নেই, যেমন আছে মানবিক রূপস্রষ্টার ক্ষেত্রে।

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে

তোমার চন্দ্রসূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,

...   .

সুদূর কোন্ নদীর পারে
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার—

এইজাতীয় ভাব গীতাঞ্জলি পর্বের অনেক গানে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চান যে পৃথিবীর কয়েক শত কোটি মানুষের মধ্যে এবং কয়েক শত সমতুল্য শিল্পী জ্ঞানী হিতব্রতীর মধ্যে একমাত্র তাঁরই কাছে পরমেশ্বর সিংহাসনের আসন থেকে নেমে আসেন? অবশ্য আগেই বলেছি যে ঐ-সময়কার কবি বা গীতিকার রবীন্দ্রনাথ একাকীত্বের সাধনা করছিলেন. তবু কি তাঁর একবারও মনে সন্দেহের উদয় হয়নি যে তাঁর এমন অনন্য পদমর্যাদা থাকতে পারে না ঈশ্বরের কাছে? খুব সম্ভবত তিনি বলতে চেয়েছেন যে যাঁরা তাঁর মতো ঈশ্বরপ্রেমী, ঈশ্বর তাঁদের প্রেমের প্রতিদানে বিমুখ নন। প্রেমিক বা ভক্ত যেমন অতি দুর্গম পথে চলেছেন ঈশ্বরের অভিমুখে, ঈশ্বরও তেমনি এগিয়ে আসছেন প্রেমিক-ভক্তের দিকে। এবং যাদের মনে ঈশ্বরপ্রেম জাগেনি, জাগার মতো মন আদৌ তৈরি হয়নি, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের কথাটা রবীন্দ্রনাথ চেষ্টাপূর্বক সরিয়ে রেখেছিলেন। তাই সুরের সহায়তা নিতে হয়েছিলো।

সুর, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সুর যে-ভাবের বাহন তাকে এমন নিবিড় গভীর এবং ঘন ক'রে তোলে যে সেখানে কোনোপ্রকার বিরোধী ভাব, প্রশ্ন বা সন্দেহ প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না। গীতাঞ্জলি পর্বের ভাব (ভাবাবলিও বলা যায়) যদি তিনি সুররিক্ত কবিতায় ব্যক্ত করতেন তবে পাঠকের মনে এবং কবির নিজের মনেও অবহিতি

জাগতো যে তিনি অভিজ্ঞতার একটি বড়ো দিক, হিউম্যানিস্ট দিক, এড়িয়ে চলেছেন।

অবশ্য কাব্যিক নির্জনতার তীরে ব'সেও রবীন্দ্রনাথ জনমানবের কথা দুয়েকটি গানে বেশ স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, কিন্তু এমনভাবে বলেছেন যা অন্তত আমার মনে বেদনা জাগায়। যেমন সেই বিখ্যাত গানে :

আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো ॥
সকল আকাশ সকল ধরা আনন্দে হাসিতে ভরা,
যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো ॥

—এ-সব কথা কি বোদলেয়রের "Le Voyage"-এর উল্‌টো কথা বলবার জন্যই বলা? অবশ্য বোদলেয়র তখনো বাঙলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হননি এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। বোঝাই যাচ্ছে (গীতাঞ্জলি'র কবি নয়ন মেলে নয়, অর্ধনিমীলিত চোখেই তাকিয়েছিলেন ধরার পানে; নইলে কি তিনি কোটি-কোটি মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা বঞ্চনা অবমাননার দৃশ্য দেখতে পেতেন না? দেখতে পেতেন না ক'টি লোকের জীবন আনন্দে হাসিতে ভরা?)

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে"-জাতীয় গান-গুলিতে 'আমি'র অভিধা ব্যক্তিগত নয়, আবার পূর্বে উল্লিখিত অর্থে সর্বজনীনও নয়। আরো সঠিকভাবে বলা উচিত—সর্বজনীন হ'লেও দেশগত নয়, কালগত সর্বজনীন। 'আসছ কবে থেকে'তে যেমন অনির্দিষ্ট অতীতের কথা বলা হয়েছে তেমনি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও রয়েছে তাতে। ঈশ্বর এখনও সব মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হননি, তবে তাঁর "রথ ধাবমান"। আমার মনে হয় এইসব গানে ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ 'চিরমানব' বা 'পূর্ণমানব'-রূপে ধারণা করেছেন। মনুষ্য-জাতি উত্থান পতন-বন্ধুর বিপদসঙ্কুল পথে এগিয়ে চলেছে মানবিক প্রোৎকর্ষ বা পূর্ণতার দিকে অতি মন্থর গতিতে। এমন একদিন আসবে

যখন সব মানুষ ঈশ্বরলাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। রবীন্দ্রনাথ "শিশুতীর্থ" কবিতায় সেই নবজাতক ও চিরজীবিতের জয়গান করেছেন যিনি ঘরে-ঘরে জন্মগ্রহণ করবেন।

আমার মতে গীতাঞ্জলি পর্বের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব'লে গণ্য হবার যোগ্য সেই কবিতাগুলি যাতে 'আমি'র ব্যঞ্জনা আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি-গত মনে হয়, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে সে-ব্যঞ্জনা ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে বহুদূর প্রসারিত। উদাহরণস্বরূপ তিনটি কবিতার কথা এখানে বলি : "মেঘের পরে মেঘ জমেছে", "আরো আঘাত সইবে আমার", "মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে"।

"আরো আঘাত সইবে আমার", কিন্তু তার একটা সীমা আছে। কে যেন এই দুনিয়াকে বলেছেন 'a valley of soul-making'। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে মানুষের চরিত্র রচিত হয়, মন উন্নত হয়, পৌঁছে যায় আধ্যাত্মিকতার স্তরে। কিন্তু আঘাত—সে-আঘাত অতিশয় দারিদ্র্য ঘটিতও হ'তে পারে, অনারোগ্য ব্যাধির নিরন্তর শারীরিক যন্ত্রণাজনিতও হ'তে পারে—যদি সহ্যশক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে মানুষের মন উন্নত না-হ'য়ে অবনত হবার, বিশ্বসৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি তিক্ততায় ভ'রে উঠবার সম্ভাবনাই বেশি। একাধিক ক্ষেত্রে তা ঘটতে দেখেছি, তার কথা বইতে পড়েছি। আর-একটি সম্ভাবনাও রয়েছে অবশ্য। দুঃখ যন্ত্রণার এই উষা-দিশা-হারা অবস্থায়—য়াস্‌পার্স যাকে বলেছেন জীবনের অন্তিম পরিস্থিতি (extreme situation)—মানুষ, যে-কোনো মানুষ, বোধ করতে পারে যে সকল আপাত-অসহনীয় দুঃখ আঘাত সহ্য ক'রে তার উপরে উঠবার একপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি তার নিজেরই মনের কোনো স্তরে আছে, কিন্তু আছে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তখন সে বার-বার প্রার্থনা করতে পারে (উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত তৃতীয় গানের ভাষায়) "প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো।"

প্রথম গানটি সকলেরই পরিচিত। তবু আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করছি; কেন তা একটু পরেই বোঝা যাবে।

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে॥
তুমি যদি না দেখা দাও
কর আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে॥

"আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে"—সঠিক বোঝা যায় না প্রিয়ার দ্বারের পাশে না নিজের বাড়ির দরজার পাশে। কিন্তু পরে যখন পড়ি: "দূরের পানে মেলে আঁখি / কেবল আমি চেয়ে থাকি", তখন আর-কোনো দ্ব্যর্থ-সূচনার অবকাশ থাকে না, কবি নিজের দরজার পাশেই ব'সে আছেন। তারপরে কবিতার শেষে রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর একটি পঙক্তি "পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।"

"আজ আমি যে বসে আছি তোমারই আশ্বাসে—" 'আশ্বাস' শব্দটি 'প্রতিশ্রুতি'র মতো মজবুত নয়, কিন্তু 'আশা'র মতো সম্পূর্ণ

বিষয়ীগতও (subjective) নয় ; আশার তীব্রতাও প্রকাশ করে না। জানিয়ে দেয় যে অপর পক্ষ থেকে এমন আভাস বা ইঙ্গিত পেয়েছেন যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে না-পারলেও একটুখানি ভরসা করতে পারেন যে প্রিয়া আসবেন তাঁর কাছে। এই আধো-ভরসায় আকুল বেদনা দুরন্ত বাতাসে বাহিত হ'য়ে দূর-দূর দিগন্তে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যদি পরম প্রিয়ার জ্যোতির্ময় রূপের সামান্যতম ঝলকও দেখতে পাওয়া যায় কোথাও।

গালিবের একটি শেরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত কবিতার পরিস্থিতিগত এবং প্রারম্ভিক মিল দেখা যায়, কিন্তু উপান্তে দুই কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে: "আসবে ব'লে কথা দিয়েছো কথা রাখো ; এ কেমন রীতি তোমার / আমাকে আমারই দরজায় দারোয়ানির কাজ দিয়েছো কেন ?" (বাদহ্ আনেকা বফা কীজীয়ে ; য়েহ্ কেয়া আন্দাজ হৈ / তুম-নে কিঁউ সঁওপী হৈ মেরে ঘর কী দর্‌মানী মুঝে।) রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাব এবং অনুভবে এক বিষণ্ণ গভীরতলে নিয়ে যায় আমাদের ; গালিবের কবিতা অন্তে তুলে নিয়ে আসে একটু হাল্‌কা কিন্তু সুচতুর কৌতুক রসে। আমার মনে হয় দুই কবিতায় এই দুই মহৎ কবির মানস-চারিত্র্য এবং কাব্য রচনারীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

সন্ধ্যা ও রাত্রি

পাঠক লক্ষ করবেন যে এ-যাবৎ যে-কটি কবিতার আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি বা করবো তার প্রায় সবক'টিই বিলীয়মান সন্ধ্যা ও ঘনায়মান রাত্রির কবিতা। বস্তুতপক্ষে প্রবন্ধ রচনা যখন আরম্ভ করি তখন আমার মনে শিরোনাম ছিলো 'সন্ধ্যা ও রাত্রি' এবং উদ্দেশ্য ছিলো 'সোনার তরী' থেকে আরম্ভ ক'রে 'বৈকালী' পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যে 'সন্ধ্যা ও রাত্রি'র চিত্রকল্পে যে-বৈচিত্র্য ও বৈষম্য পাওয়া যায়

তাই দেখানো। রচনাক্রমে প্রবন্ধটি ভিন্নরূপ ধারণ করেছে কিন্তু এখনও ঐ-প্রসঙ্গটি প্রবন্ধের অঙ্গরূপে আমার আলোচ্য।

'সোনার তরী' কাব্যের নাম-কবিতাটি বেশ-একটু বিষণ্ণ এবং ঐ ঘন বিষাদের কারণ কবির উপলব্ধি যে বিশ্ব-বিধান তথা বিশ্ব-বিধাতার কাছে মানুষের কৃতকর্মেরই যৎসামান্য হ'লেও কিছু মূল্য আছে, কিন্তু তার অফুরন্ত সম্ভাবনাময় ও অভীপ্সাঋদ্ধ ব্যক্তিসত্তার কোনোই মূল্য নেই; সে জাগতিক প্রকল্পে তুচ্ছাতিতুচ্ছ, ঝরাপাতার মতোই অবহেলিত অবমানিত ধূলি-ধূসরিত।

এই কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় বিষাদ তেমন ঘন নয়, কারণ সেই কবিতাটিতেই জীবনদেবতার ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম দানা বেঁধেছে; ফলত যাত্রা সত্যি-সত্যি নিরুদ্দেশ নয়। স্বয়ং জীবনদেবতা যে-তরীর হাল ধ'রে ব'সে আছেন সে-তরী মাঝ-সমুদ্রে — সমুদ্র যতোই উত্তাল ও তিমিরাচ্ছন্ন হোক্ — ভরাডুবি হ'তে পারে না, অ-কূলেও ভিড়বে না; নিশ্চয়তা না-থাকলেও ভরসা আছে যে সেই সুদূর কূলের দিকে নিয়ে যাবেই যে-কূলে পৌঁছবার জন্য কবির মন ব্যাকুল।

'চিত্রা' কাব্যের অনেক কবিতাতেই জীবনদেবতার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু যে-কবিতাটি আমার মনকে সবচেয়ে আকর্ষণ করে ('সন্ধ্যা") তাতে লেশমাত্র আভাস নেই জীবনদেবতার। ঐ-কবিতাটিতে বিষাদ নৈরাশ্য ও হার্দিক ক্লান্তি নিরেট। অবশ্য এ-সব উত্তম পুরুষে ব্যক্ত নয়, আরোপিত হয়েছে মা বসুন্ধরার বক্ষে যিনি তাঁর কোটি-কোটি সন্তানের অসহায় যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনায় ক্লিষ্ট হ'য়ে প্রশ্ন করছেন — আরো কতো কাল প্রাকৃতিক লৌহকঠিন নিয়মে চালিত হ'য়ে চলবে এ তাৎপর্যহীন যন্ত্রণা। রবীন্দ্রনাথের মনেও কি জাগেনি এ-প্রশ্ন? তাঁর মানবিকতাবোধ ঐ-সময়ে কতোখানি জাগ্রত ছিলো এবং মানুষের দুঃখকষ্টে কতোখানি পীড়িত ছিলো তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য

অব্যবহিত পরবর্তী কবিতা "এবার ফিরাও মোরে"। কবিতা হিসাবে তার মূল্য বেশি নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানব-প্রেমের অভিজ্ঞানরূপে তা মূল্যবান।

একটু আগেই 'কল্পনা' কাব্যের "দুঃসময়" কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এইটুকু পুনরুক্তি করতে চাই যে যদিও নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়া অত্যন্ত ঘন ও পরিব্যাপ্ত, তবু রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরতলে আশার ক্ষীণাতিক্ষীণ আভাটুকু তখনও রয়েছে; নইলে তিনি নিজের কবিপুরুষকে পাখা বন্ধ না-করার জন্য বারবার মিনতি জানাবেন কেন? 'তবু বিহঙ্গ'তে 'তবু' অব্যয় পদটি অনেক-কিছু ব্যক্ত করে।

গীতাঞ্জলি পর্বে এসে আমরা দেখি 'সন্ধ্যা ও রাত্রি'র কল্পচিত্রের উল্‌টো পিঠ। সন্ধ্যা এখন কেবল দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ নয়, ভক্ত-প্রেমিকের এবং প্রেমাস্পদ-ভগবানের (সাধারণত পুরুষরূপে, ক্বচিৎ-কখনো নারীরূপে কল্পিত) মিলনক্ষণ বা মিলনের প্রত্যাশার ক্ষণ; রাত্রি, আনন্দের রাত্রি। এর প্রকাশ ঐ-পর্বের কাব্যে এতো প্রচুর এবং সকল পাঠকের এতো পরিচিত যে উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নেই।

গীতাঞ্জলি পর্বে সন্ধ্যা ও রাত্রির চিত্রকল্পটি পূর্ববর্তী পর্বের চিত্র-কল্পের প্রায় বিপরীত। বৈপরীত্য পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে 'বৈকালী' নামক রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় মুদ্রিত সদ্য-প্রকাশিত কাব্যে। 'বৈকালী'র রচনাকাল ১৯২৬।

সন্ধ্যা ঘন হচ্ছে, চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসবে এখনি, তোমার মুখ ('গীতাঞ্জলি'র পরাণসখা স্নেহকরুণাময় ভগবানের মুখ) আর দেখতে পাবো না, এই দুর্ভাবনা আতঙ্কের রূপ ধারণ করেছে 'বৈকালী'র কয়েকটি গানে। এ-আতঙ্কটি নতুন। ঈশ্বরের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বেই ("কবে আমি বাহির হলেম

তোমারি গান গেয়ে / সে তো আজকে নয়"); বিঘ্ন ছিলো তাঁর তীক্ষ্ণ মানবিকতাবোধ, মানবিক অমঙ্গলের চেতনা। অবশেষে ঈশ্বরকে পেলেন মানুষ থেকে একটু দূরে স'রে গিয়ে। 'বলাকা'তে বুঝতে পারলেন নির্জন মন্দিরে ব'সে ঈশ্বরের ধ্যান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ("তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে"), মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় দেখলেন মানবিক দুঃখ ও পাপের "অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ"। তবু আতঙ্কগ্রস্ত হলেন না, বরঞ্চ তাঁর ঈশ্বর-ভাবনাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করলেন— মানুষ আপন মহিমার দ্বারাই ঈশ্বরের মহিমাকে শুধু প্রকট নয়, যেন প্রতিষ্ঠিত করবে, বাস্তবে রূপায়িত করবে।

ঐ-সময়কার বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক আলেক্‌জ্যাণ্ডার একটি স্মরণীয় বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন: "The world is pregnant with deity." রবীন্দ্রনাথের কানেও কথাটা গিয়ে থাকবে। মানব-জগতের আপাত নিমিত্তহীন অর্থহীন দুঃখকষ্ট তো এই জাগতিক প্রসব-যন্ত্রণার প্রকাশ বিশেষ।

'বৈকালী'তে দেখি এতেও রবীন্দ্রনাথের মন প্রবোধ মানছে না। তবে আতঙ্কের স্বরূপটা কী আগে দেখা যাক্। কিন্তু তারও আগে একটি সুপরিচিত গানের কথা বলি যার ভাব অনেকটা রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ:

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে
রঙের খেলাখানি।
চেয়ো না তারে মায়ার ছায়া হতে
নিকটে নিতে টানি।

রঙ বলতে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জগতকেই বোঝাতে চেয়েছেন। তখন বোধহয় তাঁর জানা ছিলো না যে রঙও মানব-চৈতন্যেরই ব্যাপার; অনেক পরে তিনি লিখলেন, "আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো

সবুজ / চুনি উঠলো রাঙা হয়ে।” কিন্তু ‘রসের স্রোত’-এর অর্থটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। সম্ভবত ‘রস’ বলতে রসবোধই বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কার রসবোধ—ব্রহ্মের বা ভগবানের, না মানুষের? ব্রহ্ম কি আত্মসম্ভোগ করছেন? কিন্তু সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে পরমেশ্বর নিজের সৃষ্টিকে সম্ভোগ করতে চান মানুষের চোখ বা মন দিয়ে।

‘রসবোধ’ শব্দটি যদি আরো-একটু ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়—গ্রহণ বা অবহিতি অর্থে—তাহ’লে অর্থসঙ্গতি আমি খুঁজে পাই। আমার মন বা চেতনার উপর বস্তুবিশ্বের যে-ছায়াপাত ঘটে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে-খেলা চলে তাকে আমি একটু দূর থেকে নির্লোভ নির্লিপ্ত চোখে অবলোকন ক’রে বিশুদ্ধ নান্দনিক আনন্দ সম্ভোগ করতে পারি। এখানে দুই ‘মন’ বা দুই ‘আমি’র কথা বলতে চেয়েছি: প্রথমটি দিনানুদৈনিক ব্যবহারিক (empirical) মন, দ্বিতীয়টি মনের পিছনে যে-মন, ‘আমি’র পিছনে যে ‘আমি’ রয়েছে সেই স্রষ্টা বা সম্ভোক্তা ‘আমি’। উপনিষদের দুই পাখির রূপকটি স্মরণ করলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে।

প্রথম পঙক্তিটি ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তৃতীয় চতুর্থ পঙক্তির দিকে: “চেয়ো না তারে মায়ার ছায়া হতে / নিকটে নিতে টানি।” ‘মায়া’ বললেই যথেষ্ট হ’তো, ‘মায়ার ছায়া’ ব’লে তিনি জগৎ-প্রপঞ্চের বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান ক’রে তাকে অদ্বৈতবাদীদের মতো প্রাতিভাসিক (illusory) বলতে চেয়েছিলেন কেন? এটা তো তাঁর স্থায়ী মত নয়। বরঞ্চ যে-ভাবটি ইক্‌বালের একটি স্মরণীয় শের-এ প্রকাশ পেয়েছে: “ ‘আছে’ এবং ‘ছিল’-র ফুলবনের দিকে উদাসীন চোখে দেখো না,/দেখবার জিনিস এটা, বারবার চেয়ে দেখো।” এবং মাত্র কয়েকটি শব্দে প্রকাশ পাওয়ার ফলে আরও একাগ্র হ’য়ে উঠেছে, সেটাই তো রবীন্দ্রনাথের স্থায়ী ভাব। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই ছিটকে-

এসে-পড়া অদ্বৈতবাদী পদটিকে নাকচ ক'রে পরে লিখলেন: "চেয়ো না চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি।"

"কেবলি গান, কেবলি বাণী" ব'লে রবীন্দ্রনাথ আবার আমাকে সমস্যায় ফেলেছেন। একাধিকবার তিনি অথর্ববেদ থেকে যে-ঋষি-বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন, "দেবস্য পশ্য কাব্যম্" তাতে তো বলা হয়েছে যে জগৎ-প্রপঞ্চের খণ্ডের সঙ্গে খণ্ডের, অস্তের (aspect-এর) সঙ্গে অস্তের নানাপ্রকার বিরোধ ও বিবাদ সত্ত্বেও তার সমগ্র রূপে এমন এক সামঞ্জস্য ও সুষমা দেখতে পাওয়া যায় যা কাব্য বা সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনীয়; বলা হয়নি যে তা কেবলই কাব্য।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ 'কেবলি' বিশেষণ পদের দ্বারা এই সুষমার উপর একটু জোর দিতে চেয়েছিলেন, বলতে চেয়েছেন সে-সুষমা এতো পরিপূর্ণ ও প্রকট যে জগৎ-প্রপঞ্চকে কেবলই সুষমা বললে খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হয় না। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে তিনি ফুল, পাখি ও প্রিয়ার হাসির উদাহরণ পেশ ক'রে সুষমাটিকে বড়ো সহজে সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। প্রাকৃতিক ও মানবিক সৌন্দর্যে মন নিবিষ্ট করলে মনে হ'তেই পারে যে সব তো কেবল কাব্য। কিন্তু ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। জগতের মধ্যে বেশ-খানিকটা কদর্যতাও রয়েছে, চারিদিক থেকে কান্না ও হাহাকার রবও শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের আতঙ্কের মূল উৎস সেইখানে। শেষ পর্বের শেষের দিকে তিনি বলেছেন, এ-সব দেখলে বিধাতার উপর ধিক্কার জন্মায়, বলেছেন "ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।" এই হৃতবিশ্বাস, একপ্রকার ট্র্যাজিক দৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায় 'বৈকালী'র কয়েকটি কবিতায়।

৬৪-সংখ্যক কবিতায় লিখছেন:

পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়
গহন গোপন ডালে

কান পেতে কি রয়েছে ঐ
পাতার অন্তরালে।

পথে বেরিয়েছিলেন তিনি (কবি-বিহঙ্গ) কোন্ সকালে অথবা কবে কোন্ যুগে, কিন্তু দীর্ঘ-দীর্ঘ পথ আর শেষ হচ্ছে না, তাঁর কুলায় প্রহর গুনছে পান্থ পাখির নেমে-আসা পক্ষধ্বনি শুনবার জন্য ; অন্ধকার ঘন হচ্ছে, সব পাখি নেমে এসেছে নিজ-নিজ নীড়ে, তাঁরই কুলায় এখনো রিক্ত। "সুপ্তিবিহীন শূন্যতা যে / সারা প্রহর বক্ষে বাজে।" বহুকাল পূর্বে প্রথম যৌবনে এমনি অপার শূন্যতা তাঁর বুকে বেজেছিলো মৃত্যু-শোকে, প্রিয়তমা আত্মীয়া ও আবাল্য বন্ধুকে অকস্মাৎ হারিয়ে। এই আসন্ন বার্ধক্যে কি সেইরকম বা ততোধিক মুল্যবান কিছু হারিয়ে যাচ্ছে ?

'শেষ লেখা'র একটি প্রেমের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের ব্যথাভরা শূন্যতা আরোপ করেছেন বিজয়ার (যাঁর নামে 'পূরবী' কাব্য-গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত) উপহার-দেওয়া শূন্য কেদারার উপর। কাব্য-রচনার এই আঙ্গিকটি এতো সহজে ফুটে উঠেছে তাঁর একাধিক কবিতায় যে আমরা তা লক্ষই করি না। সুরুচিসম্পন্না রূপসীর অঙ্গ-সজ্জার মতো কবিতার আঙ্গিকও যখন প্রায় অলক্ষ্যে কাজ করে তখনই তার কাজ সবচেয়ে লক্ষ্যভেদী হয়। রবীন্দ্রনাথ একাধারে আধুনিক এবং শাশ্বত , মহৎ কবিমাত্রেই তাই। তখনকার মতো কবিচিত্ত-বিমোহিনী হ'লেও কাব্যরচনার যে-কায়দা বা শৈলি কুড়িতেই বুড়ি হ'য়ে যায়, কোনো-কোনো শক্তিমান আধুনিক কবিকে রুদ্ধশ্বাসে তার পিছনে ছুটতে দেখে আপশোষ হয়—শুধু কেতাদুরস্ত হবার জন্য এ পণ্ড-শ্রম কেন !

চতুর্থ কবিতার শেষে পড়ি সন্ধ্যা হবার আগে থেকেই আলো আর দেখা যাচ্ছে না :

কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে
আঁধারে আলো আবিল করে,
আঁখি যে মরে লাজে।
তোমার বীণা কখনো শুনি,
কখনো শুনি না যে।

চোখ কান দুই-ই কি বিশ্বাসঘাতকতা করছে কবিহৃদয়ের সঙ্গে? কিসের এই কুহেলি, কোথা থেকে উঠছে সেই কলরব যা সুরের কাঙাল কবিকে 'তোমার বীণা' শুনতে দিচ্ছে না? "সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা / সেই তো আঁধি সেই তো ধাঁধা" (৫৭-সংখ্যক)। কিন্তু সুর হারালো কেমন ক'রে? ভুবনে আর ভবনে আধাআধি হ'য়ে গেছে— রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ যে কতো বড়ো যন্ত্রণা তা রবীন্দ্র-প্রেমিক মাত্রেই সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন। দোষ কি অন্তরের? "ছন্দ তোমার খণ্ড হয়ে / দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে" (৫৭-সংখ্যক), কিংবা ১৯-সংখ্যক কবিতার

মনের মাঝে গান থেমেছে
সুর নাহি আর লাগে,
শ্রান্ত বাঁশি আর তো নাহি জাগে।

পড়লে তা-ই মনে হয়।

পাঁচ বছর পরে সুপরিচিত "প্রশ্ন" কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন আরও জোরালো ভাষায়: "কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীতহারা"। কিন্তু সেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে দোষ অন্তর্গত অক্ষমতা বা শ্রান্তি নয়, দোষ সম্পূর্ণত বাহ্য। এমন-কি এক জায়গায় স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে তাঁর বাঁশি সংগীতহারা হবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাম্প্রদায়িক কাপুরুষোচিত নৃশংসতা: "আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে / হেনেছে নিঃসহায়ে।"

'বৈকালী'র ৫০-সংখ্যক কবিতায় লিখছেন:

যদি গগনে জাগিল আলো
কেন নয়নে লাগিল আঁধি।

নয়নে যে-আঁধি লাগে, পৃথিবীর উপর থেকে উঠেই তা চোখকে প্রায় অন্ধ ক'রে দেয়।

ইতিপূর্বে 'পান্থ পাখি'র কথা বলেছি, রিক্ত কুলায় যার জন্য বিরহ-রজনী যাপন করছে; পাখি কিন্তু তার কুলায়, তার আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। ৬৩-সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করছেন "পথে পথে ঘোরাও যদি, মরবো তবে মিথ্যে খোঁজে।" আরো-কয়েকটি কবিতায় পথক্লান্তির কথা পাই। অথচ দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে, খেয়া পার হ'য়ে তিনি তো তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবার কথা বলেছিলেন ("আমি কেমন করিয়া জানাবো আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো······ আমি কেমন করিয়া জানাবো আমার পরাণ কী নিধি কুড়ালো।")। এইখানে তো তাঁর পথের শেষ; কবিতাটির তাৎপর্যপূর্ণ শিরোনাম "মিলন"।

রবীন্দ্রনাথকে আবার পথে বেরোতে হ'লো কিসের সন্ধানে? গীতাঞ্জলি পর্বের অনেক গানে পাওয়ার কথাই বলা হয়েছে। বিরহ-মিলনের পালা চলছে অবশ্য; কিন্তু সে-পালাবদল তো ঈশ্বর এবং ঈশ্বর-প্রেমিকের প্রেমলীলার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার।

তবে কি তিনি গীতাঞ্জলি পর্বের মধ্যেই মনের কোনো গোপন স্তরে বা কোণে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর পাওয়া সত্য হয়নি? রবীন্দ্রনাথ যাঁকে পেয়েছেন তিনি অর্ধেক সত্য অর্ধেক কল্পনা, অর্ধেক দৃষ্টি, অর্ধেক সৃষ্টি; মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁকে রচনা করেছেন মনের মতন ক'রে। পাওয়াটাকে পূর্ণ সত্য করার জন্যই কি রবীন্দ্রনাথকে আবার পথে বেরিয়ে পড়তে হ'লো?

গীতাঞ্জলি পর্বের প্রায় সমসাময়িক নাটক 'রাজা'তে সুদর্শনা রাজার প্রেমিক ও মধুর রূপ দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে ভেবেছিলো এটাই রাজার সম্পূর্ণ ও সত্য রূপ। বার-বার তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে দিনের আলোয় দেখা দেবার জন্য। অবশেষে দিনের আলোয় নয় রাজ-

ভবনের বিরাট অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে রাজার নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর রূপ দেখে সে শিউরে উঠলো, পালিয়ে গেলো। অনেক দুঃখে অপমানে অনেক পথ হেঁটে শেষে সে বুঝতে পারলো যে একদিকে রাজা যেমন অতীব মধুর ও সুন্দর, অন্যদিকে তেমনি অবিচলিত নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। রাজার এই পরিপূর্ণ সত্যরূপের চরণে প্রণত হ'য়েই তার পথ-চলা শেষ হ'লো।

'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথ নাটকের গোড়ার দিককার সুদর্শনার সঙ্গে তুলনীয়। ঐ-পর্ব শেষ না-হ'তেই আবার পথে বেরিয়ে পড়তে হ'লো। তাঁর মনে অবশ্য ভরসা অটুট ছিলো যে সুন্দর এবং মধুর ভগবানকে তিনি সত্যের আলোয় দেখতে পাবেন সর্বত্রই, মানব-সমাজেও দেখতে পাবেন। 'বৈকালী'তে সর্বপ্রথম তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে এই ভরসা তাঁকে ছাড়তেই হবে; 'গীতাঞ্জলি'র ভগবান পরিপূর্ণ সত্য নন ব'লেই তাঁকে সত্য ক'রে পাওয়া সম্ভব নয়।

বিশ্বের যাবতীয় বস্তু—বায়বীয় নেবুলা থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্ব-জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার মানবসম্ভবম্ পর্যন্ত—যদি প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তী বিবর্তনধারায় ঘ'টে থাকে, তবে উৎপ্রেক্ষার ভাষায় বলতে গেলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর রূপ মাঝে-মাঝেই দেখা দেবে, দেখা দেবেই! করজোড়ে প্রার্থনার উত্তরে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত করুণায় বিগলিত হ'য়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের গুরুতর দুঃখের স্তূপকে সামান্যতম মাত্রায় লঘু ক'রে দেবেন ভগবান —এ-মতবিশ্বাসকে ভ্রান্তিবিলাস ছাড়া আর-কিছু বলা যায় না। মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়া ভগবানকে আমরা মন থেকে যতো দূরে সরাতে পারবো ততোই আমাদের মন বলিষ্ঠ হবে, নিজেকে এবং মানব-সমাজকে গ'ড়ে তুলবার পথ আমরা খুঁজে পাবো। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়: সর্বপ্রকার ঠুলি এবং রঙিন চশমা চোখ থেকে খুলে ফেলে কঠোর সত্যের সমগ্র রূপকে উপলব্ধি করবার সাহস অর্জন করতে হবে আমাদের।

অর্জুনকেও একদিন অনুভব করতে হয়েছিলো যে সখা কৃষ্ণের যে প্রীতিপূর্ণ রূপ দেখতে তিনি অভ্যস্ত তা ছাড়াও কৃষ্ণের আরেকটা রূপ আছে, সেটা তাঁর বিশ্বরূপ। সে-বিশ্বরূপ অতিশয় ভয়াবহ; অর্জুনের মতো বীরশ্রেষ্ঠও বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে প্রথমে শিউরে উঠে-ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি প্রণত হ'য়ে প্রার্থনা করলেন, সখা যেমন সখাকে, প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা স্বামী-স্ত্রী যেমন পরস্পরকে সহ্য ক'রে নেয় তেমনিভাবে তুমি আমাকে সহ্য করো। এই প্রার্থনার মধ্যে আরেকটি অনুক্ত উপমা (আমি যেমন ক'রে তোমার দংষ্ট্রাকরাল বিশ্বরূপকে সহ্য করেছি) উহ্য নয় কি? ভগবান ভক্তকে সহ্য করবেন ভক্তও ভগবানকে সহ্য করতে শিখবে, তা না-হ'লে ভক্তি ক্ষণভঙ্গুর হ'য়ে থাকবে, নবজ্ঞাত বা অবহেলিত সত্যের সামান্য আঘাতে ভেঙে পড়তে পারে।

গান্ধিজী লিখেছিলেন ভগবানকে সত্য না-ব'লে বলা উচিত সত্যই ভগবান (Truth is God)। এই বাক্যের ঠিক কী অর্থ তাঁর মনে ছিলো, আমার পক্ষে অনুমান করা খুব সহজ নয়; গান্ধিজী নিরতিশয় ভক্ত-মানুষ, ধর্মপ্রাণ মানুষ, তদপরি কর্মযোগী-শ্রেষ্ঠ; তাঁকে জ্ঞানযোগী ঠিক বলা যায় না। তবু তাঁর এই উক্তিটি স্পিনোজা-দর্শনের সার কথা ব'লে আমার মনে হয়। স্পিনোজার কাছে ঈশ্বরের করুণা অর্থহীন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা অনর্থক। "He who truly loves God cannot wish that he should love him in return." তবে সত্যের সামগ্রিক মহিমা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সত্যকে সাবলাইম্ ব'লে জানতেন ও ভালোবাসতেন। স্পিনোজা আমার প্রিয়তম ও শ্রদ্ধেয়তম দার্শনিক; অবশ্য তাঁর সব কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; সে-প্রশ্নই ওঠে না; মূল কথা নিয়েই কথা।

'বৈকালী'তে ফেরা যাক্। ৩৪-সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন: "এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি।" ঈশ্বর-সন্ধানী কবির

মনে ভয় জাগে পাছে অন্ধকারে ঘুরে-ঘুরে যতোই তিনি ভাবছেন বুঝি-বা লক্ষ্যের কাছে এসে পৌঁছেছেন, ততোই হয়তো আরো দূরে স'রে যাচ্ছেন। তাই আকুল কণ্ঠে ডাকছেন : "সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।" কিন্তু কে দেবে সাড়া? সেই আতঙ্কের সুর শুনতে পাই ৬২-সংখ্যক কবিতায় :

পথ এখনো শেষ হল না,
মিলিয়ে এলো দিনের ভাতি
তোমার আমার মাঝখানে হায়
আসবে কখন আঁধার রাতি।

অন্যান্য কয়েকটি কবিতায় দেখেছি সারা দিন ঘোরার নিরতিশয় পথ-ক্লান্তিই বা শারীরিক জীর্ণতাই তাঁকে এমন অক্ষম ক'রে দিয়েছে যে তিনি ঈশ্বরের মুখ আর দেখতে পাচ্ছেন না, অথবা আন্তরিক বধিরতাই তাঁকে ঈশ্বরের সুর আর শুনতে দিচ্ছে না। কিন্তু এই কবিতায় আরো খাঁটি কথা বলছেন, কার্যকারণযোগ ঠিক বিপরীত-মুখিন। যে-কারণেই হোক্ (আমরা একটু পরে তার অনুসন্ধান করবো) ঈশ্বরের মুখ ক্ষীণায়মান আলোকে আর দেখতে পাচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ। তাই অর্থাৎ তারই পরিণামে ক্লান্ত ও অবশ বোধ করছেন।

ভালো করে মুখ যে তোমার
যায় না দেখা সুন্দর হে।
দীর্ঘ পথের দারুণ গ্লানি
তাই তো আমায় জড়িয়ে রহে।

যদি বৃষ্টিপাত ছাড়াই কোনো শুকনো জায়গায় চারিদিক থেকে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া দেয়, তবে মাটির উপর থেকে প্রচুর পরিমাণে যে ধূলি ওড়ে তাকেই আঁধি বলে। এই আঁধি অন্ধকার রাত্রির মতনই মানুষের চোখকে প্রায় অন্ধ ক'রে দেয়, কিন্তু রাত্রির

অন্ধকারের চেয়ে চোখের পক্ষে অনেক বেশি কষ্টকর। বর্তমান প্রসঙ্গে 'আঁধি' শব্দের প্রয়োগ অবশ্য উৎপ্রেক্ষাগত।

প্রথম মহাযুদ্ধে বিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল পশ্চিম য়োরোপের কয়েকটি দেশ জুড়ে যে বিস্তৃত হত্যাকাণ্ড এবং নগরগ্রাম ধ্বংস-করা সৈন্যবাহিনীর জয়যাত্রা বা পশ্চাদপসরণ চলেছিলো, যার পটভূমিকায় দুঃখের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ দেখে গীতাঞ্জলি পর্বের অবসান ঘটেছিলো (অবসান মানে বিলোপ নয়, কোনো কবি তাঁর অতীত কবি-মানসকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে উঠতে পারেন না), এবং রবীন্দ্রনাথকে নোঙর তুলে নতুন সাগরে পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবতে হয়েছিলো নতুন কূলের সন্ধানে তার স্মৃতি আঘাতরূপে মনে জেগে উঠে প্রেমকল্যাণময় করুণানিধি ভগবানের মুখচ্ছবি কবির চোখে ঝাপ্‌সা ক'রে দেবেই।

১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ রোমে কয়েকটি দিন কাটান। মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তিনি ঐ আদি ফ্যাশিস্ট নেতাকে দেশের মহান নেতা ও আশা-ভরসা ব'লে অভিনন্দিত করেছিলেন কারণ ফ্যাশিস্ট ইতালির প্রকৃত রূপ তাঁর চোখে ঠিকমতো উদ্‌ঘাটিত হয়নি তখন। সরকারীভাবে যা দেখানো হয়েছিলো তিনি শুধু তাই দেখেছিলেন। পরে সুইৎজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে এসে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলেন মুসোলিনীর শাসন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সমস্ত বিরোধী পক্ষকে তিনি বীভৎসভাবে নিঃশেষ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। এই অত্যন্ত নিকট-অতীতের স্মৃতিও রবীন্দ্রনাথের মনকে খুবই বিচলিত ক'রে রেখেছিলো।

কিন্তু ১৯২৬ সালে কলকাতা শহরেই যে-হত্যাকাণ্ড ঘটে তা আকারে ছোটো হ'লেও নৃশংসতায় বীভৎসতায় ও ঘৃণ্যতায় আরও প্রচণ্ড। তদুপরি এই হত্যাকাণ্ডের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র ছিলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পাশেই। বছর কয়েক আগে অন্নদাশঙ্কর

রায় বড়ো সুন্দর বলেছিলেন, "বন্যায় খরায় দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে, সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মনুষ্যত্ব মরে।" প্রথম মৃত্যু শোকাবহ, দ্বিতীয় মৃত্যু লজ্জাকর, ধিক্কারযোগ্য।

১৯২৫-২৬ সালে দাঙ্গার আগুন সাধারণত শহরে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়তো দুটি স্ফুলিঙ্গ থেকে : (১) কোনো শোভাযাত্রা, বরযাত্রা বা ভাসানযাত্রা কোথাও মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ না-করলে ; (২) কোনো মুসলমান বাড়ির প্রাঙ্গণে এমন জায়গায় বকরীদ-উপলক্ষ্যে গরু কোরবানি করলে যা রাস্তা থেকে দেখা যায় বা আশেপাশের কোনো হিন্দু বাড়ির জানলা থেকে। আর্য-সমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলন তাতে নতুন ইন্ধন জোগালো।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, "কবি কলিকাতায় আছেন ; জানিতে পারিলেন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অকস্মাৎ কলিকাতায় আরম্ভ হইয়াছে (১৯২৬ মার্চ)। কবি স্বচক্ষে দেখিতেছেন ভীতত্রস্ত লোক প্রাণভয়ে জোড়াসাঁকোর বাটীতে আশ্রয়ের জন্য আসিতেছে। কলিকাতায় অ-বাঙালী আর্য-সমাজীরা এই সময়ে একটি ধর্মীয় মিছিল বাহির করে এবং তাহারা মসজিদের সম্মুখে আসিয়া বাদ্যাদি বন্ধ করে নাই—ইহাই হইল দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণ। হিন্দু-মুসলমানদের এই দাঙ্গায় উভয় ধর্মের ভক্তবৃন্দ মানুষকে মারিয়া বা জখম করিয়া ধর্ম-বোধের যে দৃষ্টান্ত দেখাইল তাহাতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হন।

"শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি (২৩ চৈত্র) ৫ এপ্রিল প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিসের সমাধান হয় না। যে-রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ধর্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই।'

"কয়েকদিন পরে মন্দিরে ভাষণদানকালে বলিয়াছিলেন, 'আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি' তাই তো আজ দেখছি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ

জুড়ে বসেছে। বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মতো মারছে। এই কি হলো ধর্মের চেহারা? এই মোহমুগ্ধ ধর্ম-বিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ দেখা যায়। আজ মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম খাঁটি আস্তিকতা পায় তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে। নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্মবিকারকে দাহ করা ছাড়া একেবারে নূতন করে আরম্ভ করা ছাড়া আর কী পথ আছে বুঝতে তো পাচ্ছিনে।"*

"যদি গগনে জাগিল আলো / কেন নয়নে লাগিল আঁধি"—এতোক্ষণ রূপকের ভাষায় ব্যক্ত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম। হতাশ্বাস প্রশ্ন বলবো না, তবে দীর্ঘশ্বাসযুক্ত তো বটেই। সব শাস্ত্রমানা ঐতিহ্য-পরম্পরায় বাহিত বুদ্ধিবিচারহীন বিবর্তনহারা ধর্মবিশ্বাসকে পুড়িয়ে ফেলে নাস্তিকতা বরণ করবার কথা বলছেন সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁকে অধিকাংশ বঙ্গভাষী এবং প্রায় সব অ-বঙ্গভাষী পাঠক প্রধানত ও মূলত 'গীতাঞ্জলি'র কবি ব'লেই জানে। অংশতই ভুল জানে; রবীন্দ্রনাথ তো সত্যই এক দশকেরও বেশি কাটিয়েছিলেন ঈশ্বর-ভক্তি ও ঈশ্বর-প্রেমের ভাবাবেশে নিমজ্জিত হ'য়ে। তাঁর পক্ষে নাস্তিক হ'য়ে যাওয়া, বলতে গেলে নাস্তিক হ'তে বাধ্য হওয়া যে কতোখানি মর্মান্তিক ব্যাপার তা রবীন্দ্র-প্রেমিক মাত্রই অনুভব করবেন।

হতাশ্বাস প্রশ্ন বলিনি এইজন্য যে আমরা জানি রাত্রি ভোর হবে আবার আলো দেখতে পাবেন তিনি। কিন্তু "আলোয় আলোকময় করে হে / এলে আলোর আলো।" সেই আলো আর ফিরে আসবে না। এমনি কোনো বেদনার্ত মুহূর্তে লিখে থাকবেন: "অশ্রুভরা

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃ ২৪০।

বেদনা দিকে দিকে জাগে।" যে রাত্রির অন্ধকারের কথা তিনি বলেছেন 'বৈকালী'র ৬২-সংখ্যক গানে ("তোমার আমার মাঝখানে হায় / আসবে কখন আঁধার রাতি") সে-অন্ধকার ছিলো দিগন্তব্যাপী। কিন্তু দিগন্তের পরেও নবদিগন্ত আছে। "আমারে তুমি অশেষ করেছ।"

আমি মোটের উপর ডায়লেক্‌টিকে বিশ্বাসী। জড়জগতে এবং প্রাণী-জগতেও ডায়লেক্‌টিক্ গতির চেহারা স্পষ্ট নয়। কিন্তু মন—বিশেষত আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—এগোয় ডায়লেক্‌টিকের নিয়ম মেনেই। পূর্ব-স্থিতি থেকে স'রে যেতে বাধ্য হয় বিপরীত স্থিতিতে; আবার সেখান থেকে প্রত্যাবৃত হয় বৃত্তরেখা অনুসরণ ক'রে ঠিক পূর্বস্থিতিতে নয়, স্পাইরাল রেখা অনুসরণ ক'রে পূর্বস্থিতির সমুন্নত কোনো পর্যায়ে।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল ধ'রে বহু যত্নে লালিত সরল মধুর আস্তিকতা থেকে স'রে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন পৃথিবীর বুকের উপর থেকে উড়ে-আসা আঁধির কর্কশ আঘাতে। আবার তিনি ফিরে আসবেন আস্তিক্যে আপন মনের স্বভাবধর্মেই; কিন্তু সে-আস্তিক্য হবে অনেক বেশি জটিল ও উদার, বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য সহনক্ষম; গীতাঞ্জলি পর্বের আস্তিক্যের মতো কল্পনা-নির্ভর ও ভঙ্গুর নয়। এই নতুন বলিষ্ঠ আস্তিক্য শেষ পর্বের নতুন ঈশ্বর-ভাবনার মধ্যে খুঁজে পাবেন রবীন্দ্রনাথ; খুঁজে পাবো আমরাও।

সে নতুন ঈশ্বর-ভাবনার নির্যাস রয়েছে 'শেষ লেখা'র একটি সুপরিচিত কবিতায়:

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে

বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।*

না, বঞ্চনা করে না, কিন্তু করুণাও করে না কাউকে। এ কঠিন সত্য ব্যক্তিমানুষের আশা-ভরসা সুখদুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, নির্মম। সত্য যেমন কঠিন, সত্যকে ভালোবাসাও তেমনি কঠিন, বরঞ্চ কঠিনতর; 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বর-প্রেম কতো সহজসাধ্য ছিলো! হাফিজও সেই কথা বলেছেন তাঁর কাব্য-সঙ্কলনের প্রথম গজলের প্রথম দু'টি সুবিখ্যাত পঙক্তিতে: "হে দরদী সাকী, আমার হাতে সুরাপাত্র ভ'রে দাও বার-বার, / প্রেম বড়ো সহজ ঠেকছিলো গোড়াতে, পরে কঠিন থেকে কঠিনতর হ'য়ে উঠলো।"

এই প্রথম গজলেরই পরবর্তী একটি শের, আমার অত্যন্ত প্রিয় শের, এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়: "রাত্রি অন্ধকার, তরঙ্গ উত্তাল, আমার চারিদিকে ঘূর্ণাবর্ত; যাঁরা শুকনো ডাঙার উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা কেমন ক'রে বুঝবেন আমার অবস্থাটা।" কথাগুলি কি শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি পর্বের গীতিকারকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন হাফিজের ভাষায়? বলতে পারতেন অনায়াসে। না, খুব অনায়াসে নয় বোধকরি। কারণ পূর্ব-উদ্ধৃত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কঠিন সত্যকে গ্রহণ করেছেন মোটের উপর প্রশান্ত চিত্তে; প্রতিতুলনায় হাফিজের বয়েৎ-এ অশান্তির ভাবটাই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

* তুলনীয়: "The truth is cruel, but it can be loved, and it makes free those who have loved it." Santayana's Introduction to Spinoza's *Ethics* (Everyman's Library, 1911, p xix).

আমার আত্ম-সংশোধনকে আবার সংশোধিত করতে হ'লো। এ-কথাটি ঠিক যে 'শেষ লেখা'র কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মন আগাগোড়া প্রশান্তই। কিন্তু শেষ পর্বের অনেক কবিতায় ও গানে রবীন্দ্রনাথ সত্যের কাঠিন্যকে প্রশান্ত চিত্তে মেনে নিতে পারেননি। পারলে কি তিনি লিখতেন :

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস.
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস –
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

অথবা লিখতেন 'রোগশয্যায়'-এর ২৮-সংখ্যক কবিতা ("ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ / আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা…")। অথবা "প্রশ্ন" শিরোনামধারী দুটি অসাধারণ রসোত্তীর্ণ কবিতা ('পরিশেষ' এবং 'নবজাতক' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত)। কিংবা গাইতে পারতেন অন্তিম হতাশায় :

আজ ভাবি মনে মনে মরীচিকা অন্বেষণে হায়
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই মনে ভয় লাগে সেই –
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে ॥

ভাবের ঐশ্বর্যে এবং প্রকাশের বৈচিত্র্যে আমার জানা অন্য-কোনো কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নন। সত্যই তিনি গীতিকবিদের রাজা। প্রথম দ্রষ্টা তাঁকে বলবো না – র‍্যাবো যেমন বোদলেয়রকে বলেছিলেন। সম্যক্ দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য; এবং সমদৃষ্টির প্রয়াস।

নাকি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তা-ই যা তিনি 'গীতবিতানে'র "পূজা"

পর্যায়ের প্রথম এবং অপূর্ব গানে অবিস্মরণীয় সুরমাধুর্যে ব্যক্ত করেছেন :

কান্না হাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—
... ...
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে,
অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা—
এই কি তোমার খুশি···

যে-কবি ষাট বছরের অধিক কাল বিবিধ ধারায় বিচিত্র মাধ্যমে রস-সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রসসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে কাব্য-সমালোচক একটু দিশাহারা বোধ করতেই পারেন। চলিত অর্থে আমি কাব্য-সমালোচক নই, রবীন্দ্র-প্রেমিক ব'লেই নিজের পরিচয় দিতে চাই। প্রেমিক কি প্রেমাস্পদের রূপের বা গুণের সীমা দেখতে পান? দেখলে তো তাঁর প্রেম সীমিত ঠেকবে তাঁর নিজের কাছেই। প্রেমাস্পদের দোষত্রুটি দেখতে না-পাওয়ার কোনো কারণ নেই; কিন্তু তার দ্বারা সীমানা-নির্দ্ধারণ হয় না। বিশ্বজগতের দোষত্রুটি অপূর্ণতা কি দেখতে পাই না আমরা? তবু তা অসীম রহস্যাবৃত এক চিরবিস্ময়—দর্শনের উৎস যেখানে, কবিতারও উৎস সেখানে। "মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে।" দ্বারে এসে পৌঁছেছি অবশেষে; দ্বার খুলে গেছে; বহু-দীর্ঘকালের অক্লান্ত সাধনার ফলে প্রবেশের অধিকারও পেয়েছি। কিন্তু সামনে রয়েছে ছোটো-বড়ো মহলের পর মহল; আর অন্তঃপুরের গোপন কথার, নীরব ইশারা-ইঙ্গিতের কি কোনো অন্ত আছে? অন্তবান কবি আছেন, তাঁদের সার্থক সৃষ্টি সশ্রদ্ধ হৃদয়ে স্বীকার করি আমি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই অত্যল্প সংখ্যক অন্তবিহীন কবিদের

একজন যাঁদের কাব্যরচনার গূঢ় ব্যঞ্জনা ভূতল ছাপিয়ে দিগ্‌দিগন্ত পেরিয়ে কোন্ পারিজাত-সুরভিত লোকে নিয়ে যায় রসিক হৃদয়কে তা নীরস গদ্যের বিশ্লেষণী ভাষায় বলা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির কবি-মানসকে কোনো একটি বা দুটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টা বৃথা।

সং যো জ ন

TENDENCIES IN MODERN BENGALI POETRY

If someone were to sit down with any anthology of Bengali verse and read through a hundred pages of it, he would be left with a feeling that something essential was lacking in it. It is of course very sweet and moving – what could be sweeter than the Vaishnava songs of love and desire, and what could be more moving than the superb lyrics of Tagore? Nor is profundity altogether wanting; a certain amount of grandeur too was brought to it by Madhusudan Datta. And yet – well, what is wrong with it is that it tends to be a little too sweet and too moving. One looks in vain for a tough core underneath. To call it spineless would be overstating the point, but its muscles are still under-developed. This should not surprise anybody who knows that, although Bengali poetry goes back to the fifteenth century, Bengali prose is barely a hundred years old. Eliot has said somewhere that some of the essential qualities of good verse are the essential qualities of good prose too. Of these essential qualities, some find a favourable atmosphere for growth in verse and then pass on to prose, while others germinate in the soil of prose and are later transplanted to verse. Bengali poetry has not had the benefit of having a first class prose literature by its side. There has not been one great prose-writer during the last hundred years except Tagore himself. And Tagore's prose is great, as it often is, not because of any greatness in its intrinsically prose quality, but because he brought his magnificent gifts as a poet to his prose. Pramatha Chowdhury and after him Annadashankar Ray have written more essential prose and have written with great charm. But in spite of them one feels that Bengali prose has yet to find

itself, has yet to learn to be precise without being pedantic, subtle without being elusive, simple without being inane, and, what is most important of all, it has still to acquire the strength to carry without strain the weight of the new ideas, in all their complexity, that are rushing in from the four corners of the world. This lack of discipline in the exacting school of a virile and sinuous prose is one of the chief handicaps from which Bengali verse suffers. It is no answer to say that Shakespeare wrote the greatest poetry in the English language at a time when English prose was in its cradle, for Shakespeare's genius does not abide by any rules of criticism.

Modern Bengali poetry could be dismissed in a line by saying that it is a cross between Tagore and the Anglo-American poetry of the twenties and early thirties. That would of course be a hasty generalisation and an unfair judgment, for the recent poetry of Bengal is not quite as dead or characterless as all that ; though naturally, and I should think quite rightly too, Tagore has been the focal point of all our poets who came after him. In a far more literal sense they could say of Tagore what Eliot said about Pound : "I am never sure that I can call my verse my own, just when I am most pleased with myself, I find that I have caught up some echo from a verse of Pound's." It is also undeniable that many of our young poets have learnt much from Hopkins and Eliot and Lawrence, from Auden, Spender and Day Lewis. Yet such a generalisation would not be true, for it is only a half-truth the other half of the truth being that modern Bengali poetry is quite as much a revolt against Tagore as it is a tribute to his genius, and secondly, that in spite of its having been deeply influenced by recent English poetry, there is a conscious attempt in it to find its bearings in the tradition of its own soil. I shall have something to say about the first point a little later.

As regards the second point, it is curious to note that although one source of inspiration for this attempt to tradi-

tionalise was naturally the heightened sense of nationalism coming from the two recent mass movements in the country, the other source was Eliot, the critic rather than the poet, Eliot. Eliot's emphasis on the importance of tradition in literature has made some of our very modernised poets conscious that they have to find a place in the continuous tradition of Bengali poetry, that they have to write with their whole past literature in their bones. But this Eliotesque co-ordination of 'tradition and the individual talent' has not been so far very easy or quite successful for our younger poets. For one thing, all through their school and college years English literature far more than Bengali literature has conditioned them and fashioned their taste and outlook. But a more important reason is that all the past poetry of Bengal does not form one living whole in the way in which the poetry of England does. It is neither so much alive nor quite so integrated. Before the middle of the nineteenth century, that is to say before the impact of English poetry on ours took place, there had not been a poet with a personality and sense of history deep enough to bring together its loose currents – its Mangalkavya based upon the folk legends of Bengal, which had been refined and ornamented by Bharatchandra until it was almost suffocated by the weight of its own jewellery, and its fast-decaying literature which had become traditional in the bad sense of the term. In the middle of the last century came Madhusudan Datta with colossal abilities and a large canvas. But instead of looking back at the past of Bengal, his eyes were turned far away towards the tradition of English poetry and its heritage. So that when his powerful catalytic agency came to work, the chemical ingredients were the *Iliad* and the *Odyssey*, the *Aeneid* and the *Divine Comedy* and the *Paradise Lost*, with *Ramayana* and *Mahabharata* of course thrown in, and even a sprinkling of Kalidasa, but hardly anything of his Bengali predecessors. The result was admirable, and more than admirable, considering the total unfitness for such a task of the Bengali metre and diction

that Madhusudan inherited, but one could hardly fail to see the synthetic nature of the product. There followed many imitators, but they were all swept away by Rabindranath Tagore, our greatest poet, though again purely lyrical poet—inevitably perhaps, for the genius of the Bengali language remains lyrical in spite of Madhusudan's efforts to give it an epic mould. That is to say Rabindranath could not take up where Madhusudan had left off, he had to go back to the *Vaishnava* singers, and wed their passion and poignancy to the mature mind of the English romantics. His poetry of course was no mere synthetic stuff, it was at once traditional and original, assimilative and creative. But the new way of feeling and expression standardised by Tagore is not yet a tradition. It is still very largely a matter of homage to, and domination by, a single individual, though Tagore's uninterrupted literary outflow for over half a century has entered through so many diverse channels into the very marrow of Bengal's cultural and artistic body, that I would not know how to contradict any one who maintained that this single individual is a whole tradition by himself.

One of the chief problems of our contemporary poets, here as elsewhere, is how to get out of the hopelessly narrow conclave into which they have got themselves. Caudwell had given an admirable analysis in orthodox Marxist terms of the economic and social forces which have brought about this sorry state of affairs, culminating in the transformation of art into 'craft-fetishism'. It will not quite fit in with the situation in an almost pre-industrial and semi-medieval country like Bengal, but the thought of Bengal is indissolubly linked up with the thought of England, and therefore of Europe, as never before, and art and literature to-day are as global as peace and war. And so Caudwell's objective analysis of the literary situation in England could be applied to our literature with slight modifications. Leaving this to others better versed in Marxism and the economic forces of contemporary Bengal, I want to look at the question from the other side,

the subjective side. What are our poets trying to achieve at the moment and, in their attempt to achieve it, are making the Chinese wall between them and their readers thicker and higher ?

Poetry in a sense, can be considered to be the emotional transmutation of a thought or, rather, of an experience in its totality. This transmutation is carried to varying degrees by different poets especially by poets of different ages. The nineteenth century in Europe exalted the passions at the expense of the intellect, so we find the transmutation carried to its furthest emotional limits. Thus we have Wordsworth defining poetry as 'emotion recollected in tranquillity'. The total psychosis, of which emotion can only be an element or a character, does not interest him as a poet. The seventeenth century, on the other hand, left the transmutation at a much earlier stage. Consequently we get a much bigger slice of its thought and experience in its poetry. As Eliot points out : "Racine or Donne looked into a good deal more than the heart. One must look into the cerebral cortex, the nervous system and the digestive tracts." The twentieth century is a reaction against the nineteenth century and its values, and has moved further back in the process of de-emotionalisation than the seventeenth century metaphysicals. Modern poetry is not only intellectual, it is cogitative. And the degree of educated intelligence demanded by Valéry, Pound or Eliot from their readers is not far short of what Einstein and Dirac want from their students. Quite apart from this over-sophistication of our intellectualist poetry, there is a further obvious reason why such poetry should find difficulties of communication which a purely emotional poetry need not. There is far greater community of emotion between man and man than there is of thought. Finer shades of difference will be there of course, but, broadly speaking, my loves and hopes and fears will be much like yours, whereas there is no limit to the possible eccentricity of my thoughts. For all these reasons our modern poets, who are not content with

expressing an emotion but want to convey an entire experience in all its depth, extensity and complexity, have become difficult, and some of them incomprehensible. Bengali readers, accustomed to the pellucidity of their poetry from Chandidas to Rabindranath, are bewildered by Sudhindra Datta, Amiya Chakravarti, Bishnu Dey and their disciples.

The charge of unintelligibility against Sudhindra Datta seems to me almost wholly misplaced. His fondness for archaisms and new coinages is probably its sole basis. So far as that is a mannerism, it is to be condemned, but I don't think it is mainly a question of mannerism with him. It arises out of a genuine need, rhythmic need sometimes, but more often coming from the pressure of new and elusive ways of thought and feeling which refuse to be covered by the existing vocabulary. We should not lose sight of the fact that in spite of the vast contributions of Tagore, the Bengali language has still far too few words, and what is more, its rate of growth is deplorably lagging behind the rate of growth of our ideas. Once we get across this barbed wire of unfamiliar words which are of course freely scattered over Datta's poems, there is little that is difficult in him. Personally I have nothing but admiration for the amount of intelligibility which he can impart to his poems in spite of the complexity of ideas and subtlety of attitudes that they are made to carry. His is the maturest mind amongst the new generation of poets, and amazingly well-ordained for a poet. The balance between passion and logic that he has achieved is unequalled in Bengali poetry, and is his greatest contribution to it. Much more to the point would be the criticism that Sudhindra Datta's diction is too chaste and too rigid. He is ransacking the archives of the language—and sometimes going beyond them to Sanskrit—so far as its vocabulary is concerned, but he is not making full use of its idiomatic wealth. As a result there is a kind of classic datachment about his poetry. I have no wish to under-rate

the classics, but a contemporary classic sounds rather contradictory.

There had been several poets in the Bengali language who had utilised its rich idioms for the lighter kinds of verse, for parody, for children's doggerel, or at best satire. More serious use of spoken idioms is comparatively recent. I believe Tagore again was the fore-runner with his story-poems in *The Fugitive*. A man's most intimate and significant experiences are bound up with his speech idioms, and in the evolution of poetry towards greater intimacy with the daily life of man lies its only hope of survival. There is a general realisation of this fact among the younger poets of Bengal, and most of all in Amiya Chakravarti, who has brought in the idiom and rhythm of spoken language with consummate skill. He is not only trying to use all the superficial resources of the Bengali language, but is making daring experiments to go underneath the surface and bring to light its hidden potentialities. He has not hesitated to adopt novel constructions of word and clause reminiscent of Hopkins. I am not aware that he has had recourse to telescoped words like Joyce, but telescoped clauses and sentences are not rare in his poems All this is of course to attain a degree of concentration and depth in expression not always obtainable with normal linguistic usage. Besides, the angularity of his expression is occasionally due to the fact that he is trying to look at things from a very new angle. And finally, Amiya Chakravarti is an imppressionist among poets. Sometimes he wants to give us the emotional shock of a perceptual field of view in all its bewildering variety and richness. Much as the impressionist painters were trying to produce the effect of brilliant pulsating hues of nature by juxtaposing daubs of diverse pure pigments, Chakravarti sometimes uses a juxtaposition of clauses, half clauses and single words—which can merge effectively only if the mind of the reader is quick enough to take them as a whole. Modern poetry is becoming more and more a co-operative

business, a joint product of the writer's craft and the reader's sensitive intelligence. I have to admit of course that sometimes Amiya Chakravarti's craftsmanship, consummate as it is, fails because he pitches his ambition too high perhaps beyond not only his own powers, but beyond the potentialities of linguistic expression as such. It still remains to be seen how far the compresence of impressions, that is possible in a picture, can be realised in a poem.

Bishnu Dey is the other important poet about whose unintelligibility there is wide complaint. One source of difficulty he shares with Amiya Chakravarti, namely his determination to produce the maximum of effect with the minimum of words. But his technique is different. His occamite razor operates not so much in the construction of sentence as in the construction of the poem as a whole. As a matter of fact his poems are often not whole poems so much as collections of brilliant lines or couplets, and some of his longer poems ("Cressida", for instance) are a number of exquisite little shorter pieces juxtaposed with dotted lines in between. I don't deny that they form wholes, sometimes extraordinarily effective wholes, but a certain amount of padding is needed to make the continuity evident. This padding is left to the ingenuity of the reader. If he can do it – and he has to do it without effort, almost sub-consciously, so as not to distract his attention from the lines which he is reading – the poems (when Dey is at his best) have a magically haunting effect. Otherwise they look rather like a new form of cross-word puzzle. There is, however, another and a more important source of difficulty in Bishnu Dey – his predilection for what may be called the musical theory of poetry.

A word usually has two kinds of meaning : (1) objective, in which it refers to a particular object or its quality, or a universal, or a relation, and (2) subjective, in so far as it carries an emotional ambience around it through its many associations, visual and auditory. In science and philosophy the former meaning alone is taken account of ; in poetry

the latter meaning is pre-eminent. There are poets like Mallarmé and Eliot who not only consider that the objective meaning is of secondary importance in poetry—according to Eliot it only helps to keep the reader quiet while the emotional content of the poem does its work upon him, much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house-dog—but they go much further and, becoming impatient of the objective meaning, "perceived possibilities of intensity through its elimination". Bishnu Dey evidently belongs to this musical school; as one might expect, not a few of his poems have an unforgettable lilt about them. But the elimination of objective meaning from a poem is bound to baffle the normal reader, whose every habit and predisposition lead him to expect it as a matter of course. It may be that if he is trained up from childhood in this new school of poetry, his discomfiture would gradually disappear. Though personally I do not think that this burglar's meat can be so cavalierly dispensed with. The emotional content of a poem is so closely bound up with its objective meaning, that elimination of the latter will loosen and scatter the emotions too. The poem will of course still arouse some emotions, for the lilt of its word-music and the image-associations of the words will remain even when the objective content is lost. But it is not unlikely that different emotions will be called forth in different readers, and the same reader may find himself oscillating from emotion to emotion.

Twenty years ago Bengali poets were completely dominated by Rabindranath Tagore. They were thinking his thoughts, writing his language, using his rhythms. About this time came Nazrul Islam, raising his powerful if rather primitive (and completely un-Westernised) voice in protest. He took everyone by storm with his poem *The Rebel*, which was a sort of rhapsody on the nascent spirit of revolution. Nazrul Islam did not come so much as he was thrown up by the upheaval of the Bengali mind resulting

from the huge political awakening of the non-co-operation movement and its aftermath, the second phase of terrorism in Bengal. His success was immediate and unparalleled, in fact he was the poet of the nationalist revolution. In spite of his parochial mind and native sensibilities, Nazrul Islam, the most instinctive of the Bengali poets, stirred up a new and virile individualism. A little later Buddhadeva Bose, still in his teens then, came out with his own literary rebellion, impelled partly by Nazrul Islam but much more by the cynicism of Aldous Huxley and the iconoclasm of D. H. Lawrence. As an adolescent he resented the over-shadowing influence of Tagore, but his present maturer poetry shows no trace of that resentment. He sees, as every one must see, that a Bengali poet can only develop his originality on the basis of an active though critical acceptance of Tagore. Tagore is not merely an influence, he is the intellectual and artistic soil of Bengal. Of all the moderns, Buddhadeva Bose's poetry comes nearest to Milton's formula 'simple, sensuous and passionate'. He was amongst the first to have become poetically aware of the lack of sensuous element in the love poems of Tagore – magnificently beautiful though they are, but with a beauty that is more angelic than human. Bose is an extremely fine writer of prose too, a phenomenon rare among the Bengali poets (Tagore of course being the great exception). During the last fifteen years his mind and medium have developed steadily, unaffected by the 'movements' about him ; and now he writes with a delightful ease and an unperturbed grace that must be the envy of his problem-ridden compeers.

Starting from Nazrul Islam up to the present year a distinct curve can be noticed in the movement of Bengali poetry, a curve that rises (or falls, I don't know) from extraversion to introversion, and comes back again to extraversion. Nazrul Islam and some of his immediate successors – among whom Premendra Mitra was the most

important—sang of the revolutionary martyrs and of oppressed humanity, and tried to reach out from their poet's corner to 'the dirt and the dross' of the common people. After this there was a phase of withdrawal and secluded introspection and cynisism, and naturally of a movement from emotion towards intellect. Perhaps this phase is connected with the ennui of defeatism that had set in the national mind after the failure of the second mass movement of 1930-31. This phase was at its height in the middle thirties, and its most significant poets were Sudhindra Datta, Bishnu Dey and, towards its close, Amiya Chakravarti. It was the phase of meticulous craftsmanship and bold experiments in technique, of free verse and prose rhythm—in which last again Tagore was the great pioneer. Virtuosity became the key-note of poetic creation and our poets became more interested in ways of saying things than in the things they had to say. But just as new sensibilities compel a writer to forge new forms of expression, so it seemed that the technical novelties that were being earnestly experimented with would develop new sensibilities in conformity with them : for the pressure of form on content is as great as of content on form. And something like this did happen. Bishnu Dey, whose clever but piecemeal creativity had astonished us in his *Shifting Sand*, now came out with finished masterpieces in *Foreword*, and Amiya Chakravarti wrote his *Token of Spring*, a far richer aud deeper book than his previous publications. Sudhindranath Datta was never an experimentalist in technique. The balance between his emotion and intellect has been parallaled by a parity of development in his form and content.

The third phase of modern Bengali poetry, beginning with the forties is the phase of Communism and near-Communism. Marxists would of course characterise the development of these three phases as a dialectical movement ; and even a non-Marxist will have to admit that the present return to extraversion is extraversion at a higher and more

self-conscious level than the proletarian rhapsodies of its first phase. Bengali poetry has learnt a good deal during the intervening period of introspective analysis and pre-occupation with technique. It is true, though, that leftism has become the literary fashion of the day and, the less competent a writer is, the more anxious he is to be meticulously *á la mode*. Amongst the genuine poets of the left Samar Sen writes with charm and intelligence and a refreshing freedom from ideological regimentation. It is a pity that Subhash Mukherjee, very young but amazingly gifted, has chosen to desert the Muses (how old-fashioned the word sounds !) at the call of active politics. One hopes that the dialectic spiral will negate his life of pure action, and bring him back to poetry—at a higher level. An event of no little importance to the contemporary poetry of Bengal is the recent emergence of Bishnu Dey as a Communist poet. The application of a finished technique to a cause, that can inspire as nothing else can inspire in the world of to-day, can well be expected to produce great poetry.

A doubt remains. Can a contemporary poet with all the sophistication and scepticism that is not only in his brain but has gone deep into his blood, adopt a detailed, all-embracing—far too all-embracing system of thought like Marxism, and make great poetry out of it, as Dante did out of Thomist philosophy ? The ability to submit unquestioningly in the whole field of our thought that existed in Dante's time has left us, I think, for ever. It may be my *petit bourgeois* perversity, but it appears to me that complete conformism to-day, when not hypocritical or unintelligent, can only be a *tour de force* .Such a thing may work well on the platform and on the field of battle, but great literature is not produced by forced make-shifts. A writer may identify himself with the cause of Communism attracted by its noble ideals, or by its many acceptable ideas. But when he is regimented under its entire ideology, when he is made to stuff his mind with all its Hegelian jargons which read to-day

like an undecipherable language of pre-history, his creative writing is bound to suffer. A creative writer, who goes about all the time feeling mentally straight-jacketed, would be more useful as a pamphleteer. Perhaps the writer's problem would be solved when the imposed ideology would cease to be distant and abstract and jargonic, when from a thought it would become a way of thinking and, still more, of feeling. That, to be sure, can hardly be expected until the new order has been established. Using the words 'orthodoxy' and 'tradition' in the sense in which they have been used by Eliot (in a very different context, of course), it may be said that Communist literature will be real only when Communism has passed out of the stage of orthodoxy and has become a tradition.

1943

SUDHINDRANATH DATTA

(*30th October* 1901 – *25th June* 1906)

Consistency, says the proverb, is the hobgoblin of little minds, implying – if proverbs can be supposed to imply anything – that inconsistency is the privilege of great minds. I should be the last person to hazard or accept such loose generalisations, nonetheless I feel convinced that Sudhindranath Datta's many inconsistencies contributed not a little to the richness of his mind and personality. Contradictions, according to the *advaitins*, are a mark of the unreal. Perhaps it would be better to take them as a challenge to thought – as Whitehead did. At any rate, there was nothing unreal about Sudhin. Through his contradictions he made himself felt as a very real person, very much alive in every limb, thought and mood. He could not help being conspicuously present wherever he was, physically and spiritually conspicuous, a figure drawn in firm, bold lines. Unfailingly polite but never meek or shrinking, he provoked controversy and loved it; he had mastered the art of asserting himself without offending anybody. He usually spoke in a loud voice but never obtrusively; he expressed very strong opinions but was always ready to add qualifying clauses; his likes and dislikes were pronounced, but so was his tolerance – except toward 'the cheering streets dictators tread'. Above all, he was a genuine person. As for being a challenge to thought, I am sure that in the years to come when Sudhindranath's poetry will be studied more closely and more competently than it has been so far, it is not so much the astonishing perfection of its form, nor the daring nihilism of its content, but the contradictions at the root of

this poet's spiritual being which would present a challenge to the critic and to the student of letters in Bengal.

I know of no Bengali poet (Tagore always excepted) whose life was so full of the gifts of fortune, the fruits of endeavour and the love of friends. Sudhin's father was an eminent scholar and a successful man of the world – a rare combination. As a result, he began his life with the best possible opportunities of self-cultivation; from his childhood he could associate with the finest minds and talents of Bengal. And he made – he had the ability to make – the best use of these opportunities. He even lived up to the saying 'whom the gods love die young', for he was young, very young and good looking at 59. Even his conversation retained to the last the sprightliness of youth, though his writing seldom showed that quality. And in his death too Sudhin was enviable. Till a few hours before he breathed his last he lived a healthy, active and productive life with his friends, his books and his pen. As a young man he saw much of the three continents of Asia, America and Europe, particularly of the last. He went abroad many times, and only last September he returned from a two-year trip of the United States of America and the countries of western Europe. He had many friends from many countries, many communities and both sexes, most of whom loved and admired him. His students adored him. His love-life, though not uneventful, was supremely blessed. His completely devoted wife, his widow now alas, has many talents and rare charm.

In the midst of all this Sudhin sang of the insignificance of life as no Bengali poet has sung, at least in recent times. Jibanananda Das, who in spite of his striking originality became the only popular modern poet of Bengal shortly before his death in 1954, wrote of his more accomplished but less acclaimed contemporary as 'the poet whose consciousness is most illumined by the rays of despair'. The *leit motif* of Sudhindranath's verse is not the fullness and

beauty of life or its rich possibilities, but its emptiness and drabness ; not the eternal verities, but their utter hollowness. He never wrote a tragedy, but most of his lyrics seem to be condensed tragedies. Praising Buddhadeva Bose's recent poetry, he said in a speech the other day that he would not have taken much interest in that if it had continued to be as full of 'the joy of life' as Buddhadeva's earlier verse had been. In fact, Sudhin found the phrase rather 'silly'. I asked him later if he did not think the other phrase, 'the horror and boredom of life', equally silly. A friend butted into the conversation and prevented him from making his reply–which would have been worth recording. One is tempted to remark that Sudhin tasted the joy of life so much that he did not feel like singing about it. Had he tasted too much of it and reached the state of satiety when joys begin to pall ? But his poetry was full of the feeling of vacuity and disillusionment right from the beginning, and did not become so at the end.

One of the favourite songs of Mrs. Sudhin Datta–she is an extremely accomplished singer of Tagore songs–is :

> Not a thing has come to pass : all remains the same.
> All remains the same : the anguished heart, the streaming tears, the sighs and lamentaion,
> Never a moment of rest for my heart : not a thing I desire is mine.
> I love and am loved, and I love even now , and yet there's something missing
>
> (*Translated by* Buddhadeva Bose.)

Did it correctly express Sudhin's state of mind and heart ? I knew him well personally, but not well enough to answer this question. For though he was eager to express his opinion on almost everything under the sun and beyond it, from the expansion of the universe to the teething of babies, he was reticent about his emotions, in private conversation no less than in his published verse.

But all this is not really a contradiction–at least, no more a contradiction than was Siddhartha's realisation in the midst

of his princely splendour and joy that suffering was co-extensive with life and 'momentariness' the essence of everything. Realising this, the young Siddhartha gave up his royal pleasures, retired into a lonely forest and meditated for seven years on life's ills and the way beyond, on the fact of 'momentariness' and the abiding truth above it – the *sunyata* or the non-characterisable, as it came to be called later. Sudhin was the last person ever to think of such retirement from his princely life even in his fifty-ninth year – however much he might have declared his admiration for the teachings of the Buddha. I ask in all seriousness : Were the hours given to the making of verse his hours of retirement and meditation, was his life of poetry his *vanaprastha* ? And was the illumination that came to this outward prince but inward anchorite caught in the words of his poetry ?

Sudhindranath the critic professed to be a disciple of Mallarmé and to believe that poetry is written with words, not with ideas. In the preface to *Samvarta* he wrote in 1953 : 'These compositions should be judged as experiments in the use of words. ...And since words and metrical patterns are parasitic, the present writer's thoughts and emotions have found their way into these compositions as their background. This is how the critic wrote – here and elsewhere. The poet Sudhindranath wrote in a very different vein. His poetry is heavily charged with meaning, as no other modern Bengali poet's is. And by 'meaning' I do not mean only emotive meaning ; I mean truth, philosophical truth, social truth. Sudhindranath's poetry is characterised by an unrivalled potency to express the deepest truths – emotionalised and made oblique no doubt, as the best poetry always is. Words do not constitute the substance of his poetry ; they are, as they should be, the medium of his poetical realisations. Sudhindranath wrote poetry with ideas (in a broad sense), not with words – which does not mean that he was not a master of words. But the words were the servant of his intuitions. Perhaps his other favourite quotation, 'art is the

unity of intuition and expression', better indicated his poetic practice. My point is that intuition was never absent from Sudhindranath's poetry and was always profound. Therefore, to say that his poetry was the vehicle, the *yana* (great or small, *maha* or *hina*) of the noble truths that came to this theoretical disciple of Mallarmé but practical renegade from his professed master's teaching, to this man who loved a full and rich life but loved no less the nothingness of all – is not to make a too paradoxical statement.

Another contradiction which gives strength to Sudhindranath's poetry lies in the peculiarity of its form. On the one hand, Sudhin observed the rules of prosody more meticulously and made a more daring use of traditional poetic diction than any other recognised Bengali poet of the 1930s and after. His verse was meant to be declaimed, and Sudhin's declamatory recital of his verse was a treat for the ear. On the other hand, his poetry is full of extremely complex, almost intricate, sentences, composed and arranged like the sentences of prose – not of imaginative or narrative prose but of abstract, discursive and logical prose. This is a contradiction of formal element that is difficult to miss in his poetry. Yet this poet's success in conveying the sound and feel of discursive prose in metres of classic purity is felt as a triumph of technique, not as a *tour de force*. I think this success can be explained by the fact that Sudhin, widely read as he was in philosophy, history, politics, current affairs and popular science, was nonetheless every inch a poet. He composed his thoughts poetically, that is, imaginatively and emotively. They were lyrical rather than logical On the other hand, his feelings were extraordinarily intellectual. Neither an intellectual nor an aesthete *pur sang*, he was an intellectual of passions and an aesthete of intellection.

What I am suggesting is that the contradiction that we notice in Sudhindranath's style is but a reflection of the contradiction that was present in his mind. Form and content were in perfect accord ; the discord lay *in* the form and

in the content. But such discord, far from resulting in any loss of value, was a source of beauty that was not facile, not caught at first sight, but once caught was not easily lost sight of. I think it a prejudice to regard harmony as essential to beauty, unless by harmony we mean something more than, something other than just the concord of elements, something not incompatible with unresolved conflict.

Even the prose of Sudhindranath (I am referring primarily to his Bengali prose), which is sometimes mistaken for the prose of abstract thought and logical argument, is the prose of imagination and emotion. The liberal use he makes of logical connectives like 'because', 'therefore', 'notwithstanding', 'nevertheless', etc., in his prose as well as in his verse, serves more a poetical than a logical purpose in both. His paragraphs, like his stanzas, usually achieve a poetical synthesis though they seldom constitute a logical whole. The premises are not premises properly speaking, for the conclusions which appear to follow from them hardly follow in strict logic. Yet they are not irrelevant, and the togetherness of only apparently logical clauses is significant. Something deep is conveyed which logic could not have conveyed. But the semblance of logic is an essential part of the technique of Sudhin's self-expression. This technique he uses indifferently in prose and poetry. In his prose it often confuses the reader, in his poetry it seldom fails to illumine. For the reader of prose is (rightly) expecting to be argued into conviction, and this expectation leads him astray. The reader of poetry has no such expectations, and therefore inspite of its logical form is not misled by Sudhindranath's poetry. He finds in it a source of the deepest emotions at their highest level. Sudhin's prose was no less an experiment in the use of words than was his verse, though in neither was it just that. But for the success of the experiment one has to go to his verse. I, at any rate, must confess to being rather bewildered and dissatisfied by his prose, but his poetry more than satisfies me – it uplifts me. (How Sudhin would have loved to make fun of

my use of the word 'uplift' in this context! 'My dear Ayyub, you are an incorrigibly adolescent romantic', and so forth.)

The deepest conflict in Sudhindranath was between his philosophic belief and his poetic sensibility. Philosophically he professed to be a materialist of the deepest dye, an out-and-out behaviourist of the Watson brand. He has recorded these beliefs in his distinctive logical-cum-poetical prose, not once or twice, but in a score of essays—sometimes at length, sometimes in brief, sometimes in a line. It appeared to me from the way he spoke and wrote about them that he was more anxious to retain and strengthen his own materialistic convictions than to carry them to other people; he was afraid of losing his faith in materialism as many religious people are of losing their faith in God. Perhaps it would be more correct to say that Sudhin loved to be a materialist rather than that he was a materialist—like another superbly gifted poet of Bengal, Bishnu Dey, who loves to be a Marxist though it is doubtful if he is or ever will be a full-blooded one. Bishnu is far too sophisticated—bourgeois to the roots of his being—to be a poet of the proletariat But that is his *sadhana* So it was with Sudhin. Deep inside he was an idealist, almost a *bhakta*. But it was his *sadhana* to become a *jaḍa-vadi*, a *dehatmavadi*. What hard-boiled materialist would be shocked and pained by the thought that

> For all that, when you spoke of victory, you did not want
> The present state of things which cancels profit out by loss,
> Reducing them to utter nullity, and what we flaunt
> As peace is but exhaustion of the will, our special cross.
> Was it for this that we endured two global wars, rejoiced
> In countless insurrections, piled up millions of dead
> To rot in shallow graves? And has the time now come to hoist
> Triumphal flags along the cheering streets dictators tread?
> The heavens are extinct; and darkness has regained its sway,
> You too are lost for ever in the emptiness of space,
> Who then will answer if the desolation of today
> Is cumulative punishment for Adam's fall from grace?

(From the poem '1945', *written in* 1945 *and translated by the poet.)*

or that

Such dreams and resolutions are in vain,
And even vainer is the fear of sure
Senescence whence I seek concealment in
Fragmental recollections conjured out
Of isolating rain by mock revolt.
But history abounds in periods
Of hibernation, when the earth, a lost
Somnambulist, is separated from
The brotherhood of transcendental stars,
And man, imprisoned in the dark night of
The soul, can only chew the poisoned cud
And contemplate the blighted future, like
An augur reading in the innocence
Of birth a sentence of unransomed death.
The certitude of faith deserts him then ;
And blind belief informs his panic prayers
To old, indifferent and feeble gods
For congruence and continuity,
As once, unasked, the patriarchs received.
Yet all the while his desolation grows
And, stranded in an island universe,
He breathes his proper exhalations which
No atmosphere absorbs or animates ;
And though the level heat of entropy –
Incapable of further progress – burns
Him, his impurities are not consumed,
Nor does it warm the introspecting self
Infected with the ague of a world
Extinct. Departed is the inner guide
Today, the outer ghosts have also fled,
Their after-image being all I see :
Old Lenin's mummy wrapt in mysteries
Of Muscovy, undaunted Trotsky felled
By hammer-blows : triumphant Stalin turned
To Hitler's friend, the corpse of Spain , Cathay
Approaching dissolution, headless France
Exhibiting reflexive agony.
Alas, I have no means of finding out
If she is still alive or bombed to dust.

(*From the poem* 'Cyclone' *written in* 1940 *and translated by the poet.*)

Those are only the cogitations of a materialist, the emotions expressed through them—let us not forget that in poetry the emotions matter far more than the thoughts—are the emotions of an idealist. A piece of matter hurled by material forces can hurt us physically, not mentally. Only spirit hurts spirit. But Sudhin is hurt by the material world, by the fact that it is material, that the statistical laws of quantum physics and the tensor equations of field physics reign supreme in the universe. The most striking note in his poetry is the feeling of deep mental hurt at the cosmos understood in terms of his materialistic philosophy. There is no doubt that the poet and the philosopher were at strife in Sudhindranath Datta, nor that the poet gained enormously in stature by the strife.

It is true that Sudhin could never have written lines such as :

> I falter where I firmly trod,
> And falling with my weight of cares
> Upon the great world's altar-stairs
> That slope thro' darkness up to God.

Sudhin's poetry, at least on the surface, slopes through darkness to deeper darkness. 'The curtain of infinite darkness falls around me on all sides. In the midst of universal horror you too are horrid.' Although we cannot say that Sudhin like Tennyson (I am not sure at what point exactly he held Tennyson in the ups-a-daisy that modern criticism has been playing with the Victorian poet's status) ever firmly trod the ground of faith, he never quite succeeded in firmly treading the ground of denial either. Nor can we say that his poetry was true to the kindred points of both. It was a tight rope on which he walked, and all the time felt the thrill of falling headlong into either his professed materialism or his repressed idealism. It is this tautness of muscle and tension of belief which, I feel, give so much more depth to Sudhin's verse than did the elder poet's faultering faith to his. There is

nothing faltering in Sudhin, every footstep is firm: only he chooses to walk on the razor's edge.

This conflict between thought and emotion, philosophy and art, was not peculiar to Sudhindranath. The anti-moderns might characterise it as a disease of the modern mind, I discern in it a sign of its vitality, honesty and courage. Koestler, for instance, finds the salvation of the modern age, particularly of modern literature, in the rediscovery of what he calls the 'cosmic emotion', the 'oceanic feeling'—which was the grand passion of the ancient East. Cut away from this perennial fountain-head, our art and literature have turned into mere mannerism and virtuosity. To that fountain we must return in order to revitalise our art, literature and life (vide his *Insight and Outlook*). But when I asked Koestler in Calcutta last year if he found anything in the character of the Cosmos which deserves our spontaneous regard or love, he jumped up in excitement and almost shouted: 'It is a lousy, beastly universe.' Now there is nothing particularly lousy in the world described by physics, nor in electrochemical forces producing and destroying life according to their own pervasive laws. The laws of physics and the world governed by them alone are not proper objects of our righteous indignation. No physicist to my knowledge is indignant at the universe he studies or uses swear words at it; on the contrary, the structure and behaviour of the material world, its dialectical development and thermodynamic death—the entire panorama fascinates him. The universe would have been lousy indeed if it were under the governance of an omniscient and omnipotent Deity who permitted the great floods, droughts and plagues of history, the cold-blooded murder of several million jews and kulaks, the communal riots of Indo-Pakistan, two global wars and the diabolical friendship of Stalin and Hitler. A materialistic philosophy gives no support to the feelings of hurt, horror, disgust and indignation with which our literary materialists react against the world. More appropriate would have been a

feeling of embarrassment for having rather naively expected physico-chemical laws to have produced a morally perfect universe. Note also the contradiction involved in insisting at one and the same time that the universe is lousy and that we should make it the object of our deepest feelings of love and devotion ('oceanic feeling'). One could multiply instances of such deep-rooted contradictions – Sartre and Camus are most tempting – but Koestler will suffice.

I must not be understood as suggesting that Arthur Koestler and Sudhindranath Datta exhibit the same sort of contradiction in their outlook. Their contradictions are, however, comparable. Koestler's basic contradiction is between his conviction that the modern man can save his soul or at any rate his sanity only by expanding his positive emotions so as to embrace the whole universe, and his equally firm conviction that the universe is, by and large, utterly repulsive. Datta oscillates between his intellctual certitude about the ultimate truth of the latest pronouncements of mathematical physics (not of the physicists in their non-professional writings, most of which show a deep tint of religious mysticism) and his emotional horror at the total disregard of human values by a purely material world, that is, at the inability of physical forces to do what only an omnipotent spiritual power can do. More often, there is the feeling of pain (the Indian word *abhiman* is more appropriate) at the absence of such a power. Now we can be hurt by the relative absence of a person (who is absent here and now but present somewhere somewhen), but isn't it rather odd to be hurt by the absolute non-being of a personal God ? The death of the Gods is a not infrequent theme of modern poets, including Sudhin (in the stanza quoted above we have the lines 'the heavens are extinct .....Who then will answer', etc. ; in 'Resurrection' he speaks of the walking of the ghost of the slaughtered god'). Surely our poets are not mourning literally the death of the Gods, but only the death of man's (or of their own) belief in God. My point is that the belief ('the

certitude of faith') whose death causes such agony is not quite dead yet, it has only become difficult to hold. The certitude is gone, but the faith lingers. That the difference between the death of a cherished belief and the death of a loved person.

I do not share either of these contradictions, nonetheless I find certain radical contradictions unavoidable in any world-view. This is not the place to go into the basic dichotomy which my own philosophical outlook bears. I can only mention in passing that there are various ways of looking at the world each of which can be made consistent within itself, but there is no reconciliation of one with the other. Perhaps these could be reduced ultimately to two, which we might call the materialistic and the idealistic standpoints—the chasm between which cannot be bridged. It is necessary, it is honest to embrace both alternatives, at least to recognise the need for both. Without either, our vision remains incomplete and our personality one-sided. Synthesis is an enormously difficult task and seems remote yet. All facile attempts at synthesis ultimately arising out of a one-eyed *weltanschauung* (which literally means 'looking at the world')—such as those of the theological, the Hegelian and the Samkarite or of the Watsonian and Marxist materialists—should be eschewed. Perhaps they cannot be altogether eschewed, at any rate, they must be recognised as premature and still-born in this infancy of man's mental development.

In his philosophically less assertive moments Sudhin called himself an *anekantavadi*, a believer in the many-faced nature of truth and reality. He saw one face in his discursive writing and another in his creative, or perhaps I should say that he saw one side with his intellect and another with his feelings. It is easy to be caught and enmeshed by either of these great truths. But Sudhin loved the difficult, loved more uncompromisingly as a poet than as an essayist. It needs courage and honesty to face conflict ; these qualities were Sudhin's strong points. Recognising the impossibility of

synthesis, he allowed himself to bear the cross of conflicting attitudes running athwart each other. I must say he bore it extremely well, both in life and in art. His personality was balanced and whole though not unified. Contradictions indeed were the source of his vitality, his potency, and his charm. As a towering literary figure in Bengal after Tagore and as the most powerful exponent of the 'new poetry' and the 'new criticism' (through his distinguished quarterly *Parichay*, 1931-40, which had few readers but is now generally recognised as a landmark in the development of Bengali literature), Sudhin had his full measure of abuse from the traditional writers and critics in the thirties and from the Marxists in the forties. But all of us who had the privilege of knowing him personally were captivated, yes captivated, by this singulary fresh, vital and genuine person. His remarkable talents were there of course, but no one is loved for his talents.